কীর্তির্যস্য

ভবতোষ দত্ত

রবীন্দ্র অধ্যাপক, বিশ্বভারতী



অণিমা প্রকাশনী

১৪১ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট,

কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ : শুভ অক্ষয়তৃতীয়া, ১৫ বৈশাখ ১৩৬৭

প্রকাশক
শ্রীদ্বিজদাস কর
অণিমা প্রকাশনী
১৪১ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০০৯

মুদ্রক
শ্রীশিশিরকুমার সরকার
শ্যামা প্রেস
২০বি ভুবন সরকার লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৭

প্রচ্ছদ শিল্পী : শ্রীজয়ন্ত চক্রবর্তী

শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী সেন

শ্রদ্ধাস্পদেষু

ভূমিকা

বিভিন্ন উপলক্ষে রচিত এই প্রবন্ধগুলিতে আধুনিক বাঙালি মনীষীদের চিন্তাবৈশিষ্ট্য, তাদের জীবনধারণা, তত্ত্বজিজ্ঞাসা, ইতিহাস-সন্ধিৎসা, দেশসাধনা, রসচর্চা ও চিন্তাচর্চার কিছু পরিচয় পাওয়া যাবে। প্রধানত সাহিত্যসংলগ্ন মনীষীদের আলোচনাই এতে আছে, সে-আলোচনাও সর্বাঙ্গীন নয়। তাছাড়া সখারাম গণেশ দেউস্কর বাঙালি ছিলেন না, সেই অর্থে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীও নন। কিন্তু এঁরা বাংলা ভাষাতেই লিখেছেন— বাঙালির সংস্কৃতির সঙ্গে এঁদের ভাবপ্রেরণা অচ্ছেদ্য হয়ে আছে। আবার রামেন্দ্রসুন্দর যেমন শুধু 'জিজ্ঞাসা'ই লেখেন নি, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও তেমনি শুধু বাংলার ইতিহাস সন্ধান করেই ক্ষান্ত থাকেন নি। এগুলি তাঁদের ব্যাপক ভাবনাক্ষেত্রের এক-একটা দিক মাত্র। তাঁদের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এক-একটা দিকের আলোচনার দ্বারা আমাদের মনের ভাণ্ডারে তাঁদের স্থায়ী দানের কিঞ্চিৎ পরিমাপ করার চেষ্টামাত্র এই গ্রন্থে করা হয়েছে। আলোচিত বাঙালি মনীষীদের ভাবনাসম্পদ আমাদের জাতীয় মানসকে কতখানি সচল সমৃদ্ধ ও প্রাগসর করেছে তারই একটা আভাস দেওয়া আমার অভিপ্রায়— ঘটনা সাজিয়ে জীবনীরচনা নয়। তত্ত্বচিন্তায় ও রসকল্পনায় ভাবজীবী বাঙালী চরিত্রের যে রূপটি ফুটে ওঠে তার লক্ষণ হচ্ছে জীবনাভিমুখিতা ও পরিবেশসচেতনতা। পশ্চিমী সভ্যতার অভিঘাতের পূর্বে বাঙালির প্রায় হাজার বছরের ইতিহাসে এই বৈশিষ্ট্যের সাক্ষাৎ মেলে নি। এই ব্যক্তিচিন্তার সাহায্য নিয়ে আধুনিক সংস্কৃতিকে বোঝা যায়। আধুনিক বাঙালি সংস্কৃতি যে ব্যক্তিনির্ভর একথা বলেছিলেন নির্মলকুমার বসু প্রায় তেতাল্লিশ বৎসর আগে—

'বাঙালীর গড়া নামকরা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আজ কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয় এবং কংগ্রেসী করপোরেশন ও বোলপুরের শান্তিনিকেতন ধরা যাইতে পারে। ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলে এ তিনটির মধ্যে ব্যক্তিত্ববাদী অসামাজিক বাঙালীর হাতের পরিচয় পাওয়া যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ই হউক আর করপোরেশনই হউক তাহা মোটামুটি এক-একজন মহাশক্তিশালী বাঙালীর কীর্তি। আশুতোষ, চিত্তরঞ্জন অথবা রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সকলেই চরম ব্যক্তিত্ববাদের উপাসক। তাঁহারা যে সকল প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছেন তাহা অসংখ্য লোকের বহুমুখী ব্যক্তিত্বের সম্মিলিত প্রকাশ নয়। অর্থাৎ তাহা কোনও সমাজের দ্বারা গড়া জিনিষ নয়।'

—'বাঙালীর চরিত্র', প্রবাসী ১৩৪২ আষাঢ়

হয়তো এজন্যই প্রাচীন বাংলায় ব্যক্তির সাক্ষাৎ যত দুর্লভ আধুনিক বাংলায় ততই অবিরল। আমাদের মধ্যে যেমন রামমোহন বিবেকানন্দের মতো মহাশক্তিশালী ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেছে তেমনি মননজীবী ছোট-বড়ো নানা ব্যক্তির আবির্ভাবও ঘটেছে। বিভিন্ন প্রয়োজনে ও উপলক্ষে লেখা বলে তাঁদের সবাইকে বর্তমান গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হল না।

এই প্রবন্ধগুলি লেখার প্রবর্তনা এসেছে নানাভাবে। 'রাজা রাধাকান্ত দেব' লেখা হয়েছিল রামমোহন দ্বিশতবার্ষিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে। ক্যালকাটা হিসটরিক্যাল সোসাইটি-আয়োজিত সভায় অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠীর সভাপতিত্বে এশিয়াটিক সোসাইটি কক্ষে পঠিত প্রবন্ধটির জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক বন্ধুবর ডক্টর অরুণ দাশগুপ্তের আগ্রহ ও উৎসাহ বিশেষ ভাবে স্মরণ করি। 'ইতিহাস-সাহিত্যিক রজনীকান্ত গুপ্ত' লেখার সময় রজনীকান্তের দৌহিত্র স্বনামধন্য কবি কিরণশংকর সেনগুপ্ত আমাকে কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য বই ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন। আমার কল্যাণ-ভাজন ছাত্র ডক্টর সত্যজিৎ চৌধুরীর আগ্রহে 'হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও বাংলার ইতিহাস' লেখা হয়েছিল। পণ্ডিত বিমানবিহারী মজুমদার-সম্পর্কিত তথ্য আমাকে আনিয়ে দিয়েছিলেন 'জিজ্ঞাসা'র সত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত শ্রীশকুমার কুণ্ড। এ ছাড়া নানাভাবে সাহায্য পেয়েছি শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী সেন শ্রীযুক্ত সুশীল রায় এবং অধ্যাপক মোহনলাল মিত্রের কাছে। রবীন্দ্রভবনের ডক্টর সাধনা মজুমদার কপি প্রস্তুত করার কাজে সাহায্য করেছেন।

এই বইয়ের প্রচ্ছদ এঁকে দিয়েছেন বিশ্বভারতীর কলাভবনের শিল্পাধ্যাপক আমার বিশেষ প্রীতিভাজন ডক্টর জয়ন্ত চক্রবর্তী। যে-খ্যাতি তিনি ইতিমধ্যেই অর্জন করেছেন, তা আরও বহুগুণে বর্ধিত হোক এই আমার আকাঙ্ক্ষা।

এই মুদ্রণ-সঙ্কটের দিনে প্রকাশক শ্রীদ্বিজদাস করের আগ্রহ ও উৎসাহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য বলে মনে করি।

ভবতোষ দত্ত

সূচী

স জীবতি মনো যস্য মননেন হি জীবতি।

রাজা রাধাকান্ত দেব

উনিশ শতকের প্রথম অর্ধে কলকাতায় যে সামাজিক আন্দোলন ক্রমেই বেগবান হয়ে উঠেছিল তার প্রধান নেতা ছিলেন রাজা রামমোহন রায় এবং তার পরে নব্যবঙ্গের মনস্বী যুবকেরা। আধুনিক বাংলার প্রগতির ইতিহাস মূলত এঁদেরই কর্মকীর্তির সঙ্গে জড়িত। হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা (১৮১৭) একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। এই কলেজের শিক্ষাপদ্ধতির ফল স্বরূপ আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির উন্মেষ ঘটে। এই কলেজ থেকে উত্তীর্ণ ছাত্ররাই রামমোহনের আদর্শকে তুলে নেন এবং নানা আলাপ-আলোচনা সভা-সমিতির মাধ্যমে সেই আদর্শকে জীবন্ত রেখে উনিশ শতকের উত্তরার্ধে পৌছে দেন।

এই বিষয়টাকে আমরা একটি সহজ সূত্রেই দেখতে অভ্যস্ত। রামমোহন ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় স্থায়িভাবে চলে আসার পর যেসব সংস্কারমূলক আন্দোলন গড়ে তুললেন, তার দ্বারাই জড়প্রায় বাঙালি জীবনে নূতন প্রাণের সঞ্চার হয়েছে। এক দিকে তিনি ভারতবর্ষের বিশুদ্ধ ধর্মসংস্কৃতির প্রাচীন বাণীকে উদ্ধার করলেন, অপর দিকে বৃহত্তর বিশ্বের চিন্তা ও চেতনার সঙ্গে বাঙালির মনকে যুক্ত করে দিলেন। তাঁর এই প্রধান দুটি কাজের দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়াল বেদান্ত গ্রন্থ-সম্পাদন, সতীদাহ বিরোধী আন্দোলন, শিক্ষা সম্বন্ধীয় প্রতিবেদন। এই সমস্ত কাজের মহত্ত্বে অবশ্যই আজ আর কোনো সংশয় নেই; রামমোহন এইসব কাজের মধ্যে দিয়ে মহিমান্বিত হয়ে আছেন। সেকালে এই কাজের যাঁরাই বিরোধিতা করেছিলেন তাঁরা আমাদের কাছে রক্ষণশীল ও প্রাচীনপন্থী বলে পরিচিত হয়ে আছেন। রক্ষণশীল এবং প্রগতিশীল এই দুটি ভাগে বিভক্ত করে উনিশ শতকের সমাজকে আমরা বিচার করে দেখি। সেই সময়ের একজন শক্তিশালী সমাজনেতা রাজা রাধাকান্ত দেব রক্ষণশীল-চূড়ামণিরূপে আজ আমাদের কাছে পরিচিত। রাধাকান্ত দেবের দুটি কাজ বিশেষ করে আমাদের সমালোচনার উদ্রেক করে; দুটিই হিন্দু সমাজের সংস্কার সম্বন্ধে। একটি সতীদাহ-নিবারণের বিরুদ্ধে তাঁর প্রয়াস এবং অন্যটি বিধবা-বিবাহ প্রচলনে তাঁর বিরোধিতা। রাধাকান্ত দেব কর্মী পুরুষ ছিলেন। বহু বিচিত্র কর্মগৌরবে তাঁর জীবন অলংকৃত। কিন্তু তাঁর এই দুটি কাজকে

বিশেষভাবে প্রগতিবিরোধী বলে মনে করা হয়। তাঁর এই বিরোধিতা তাঁর জীবনের অন্যান্য কীর্তিকে যেন ম্লান করে দিয়েছে। রাধাকান্ত দেবকে সমালোচনা করে তীক্ষ্ণ ভাষায় মন্তব্য করেছিলেন অন্যতম বিশিষ্ট নব্যবঙ্গ কিশোরীচাঁদ মিত্র। তিনি রাধাকান্তকে পিতা রাজা গোপীমোহন এবং খুল্লতাত রাজা রাজকৃষ্ণ অপেক্ষাও গোঁড়া বলে বর্ণনা করেছেন—

"The superstitious element which had been mild in his father, Rajah Gopeemohun and torpid in his uncle Rajah Rajkissen, assumed in him an aggressive development. It is, therefore, not to be wondered at, that his attachment to the antiquated customs and usages of his country, was as devoted as his advocacy of educational measures was zealous. In him the argument had a strong hold that what has lasted a long time, must be right and was intended to last. The reverences for existing usages which is strong in human nature was stronger in Radhakanta Deb. His belief in the wisdom of his ancestors was unlimited. Thus impressed he proved during the latter end of his life an anachronism. He witnessed the beginning of a new age. More than half a century had passed, since he was the pet of his grandfather Maharaja Nabakrisna. A new world had come into being."[১]

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে রাধাকান্তের মৃত্যু উপলক্ষে আহূত শোকসভাতেও কিশোরীচাঁদ কঠোর ভাষায় তাঁর প্রগতিবিরোধী মনোভাবের সমালোচনা করতে দ্বিধা করেন নি। তাতে তিনি বলেন রাধাকান্তের রাজনীতি বিষয়েও কোনো দৃঢ় মত ছিল না ফলে he led a party which he did not strictly represent. রাধাকান্ত সম্বন্ধে কিশোরীচাঁদের এই সুস্পষ্ট ধারণা পরবর্তী কালের মতামত গঠনের ভিত্তি হয়েছে বলে মনে হয়। অথচ আর-একজন নব্যবঙ্গ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সেই সভাতেই বলেছিলেন it is

১ *Calcutta Review* (1867) Life of Raja Radhakanta Deb, pp 7-8

unfair to compare him with persons who were his juniors by more than half a century. কৃষ্ণমোহন নাকি ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে কোনো একটি বইতে রাধাকান্তকে 'গাধাকান্ত' বলে অভিহিত করেছিলেন।[২]

কিশোরীচাঁদের বক্তব্যের মধ্যে সারবত্তা নেই, সেকথা বলব না। রাধাকান্ত তাঁর সম্মুখে জাতীয় জীবনের ক্ষেত্রে প্রবল পরিবর্তন দেখেছিলেন, সে পরিবর্তনকে ভারতবর্ষের এতদিনকার ইতিহাসেই দ্বিতীয়রহিত বলা যেতে পারে। এই পরিবর্তনের গভীরতা বোঝা সহজসাধ্য নয়। ইংরেজি শিক্ষা স্ত্রীশিক্ষা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারে তাঁর সহযোগিতা শুধু নয়, তাঁর নেতৃত্ব ছিল। কিন্তু ধর্ম ও সমাজের ক্ষেত্রে তিনি অনুরূপ উৎসাহে অনুকূলতা করেন নি। এ বিষয়ে রাধাকান্ত এমন একটি মনোভাবের অধিকারী ছিলেন যাকে শুধু রক্ষণশীল বলে নির্দিষ্ট করে দিলেই হয় না— বহু বৎসরের ভারতীয় দৃষ্টিবৈশিষ্ট্য বলাই বোধহয় ঠিক হয়। এই দৃষ্টিতে রাজনৈতিক পরিবর্তনকে কখনোই তত গুরুতর বলে ভাবা হয় নি, যতখানি গুরুতর বলে গণ্য হয়েছে ধর্ম- ও সমাজ-বোধ। আমাদের দেশে সমাজকে রক্ষা করাই ছিল প্রধান। সমাজকে রক্ষা করতে পারলে— তার বিধিনিষেধ ও নিজস্ব প্রকৃতিকে অক্ষুণ্ণ করে রাখতে পারলে জীবনের অন্যান্য পরিবর্তনগুলিকে মেনে নিতে কখনো আপত্তি হয় নি। রাজ্যশাসনের প্রতি অসন্তোষ সেভাবে কখনো গড়ে ওঠে নি, সমাজবন্ধনের প্রতি আনুগত্য যতটা দেখা গেছে।

রাধাকান্ত উচ্চ ধনবান কায়স্থ বৈষ্ণব বংশের সন্তান। রামমোহনের দশ বৎসর পরে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতৃপিতামহের সঙ্গে ইংরেজ শাসকের ঘনিষ্ঠতা ছিল। ইংরেজরাও দেশের ধর্ম বা সমাজে কখনও হস্তক্ষেপ করে নি ফলে তাদের সম্বন্ধে কখনো কোনো অভিযোগ ছিল না। সমাজ যেমন ছিল তেমনিই চলছিল। মুসলমান রাজার আমলেও হিন্দুরা নিজস্ব সমাজ-বন্ধনে বাস করেছে। নদীয়ার রাজা সমাজনেতারূপে গণ্য ছিলেন। রাজা রাজবল্লভের বিধবা কন্যার পুনর্বিবাহ দেওয়ার উদ্যোগ নিয়ে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে বিরোধিতা হয়। শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণচন্দ্রের অসম্মতিতেই এ বিবাহ ঘটতে পারে নি। নবদ্বীপে হিন্দু সমাজের নেতা যেমন ছিলেন নদীয়ার রাজবংশ, নতুন রাজধানী কলকাতার হিন্দু সমাজের নেতা হয়ে উঠেছিলেন

[২] শিবনাথ শাস্ত্রী, 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ', ৩য় সং, পৃ ১১৭।

তেমনি শোভাবাজারের দেবগণ। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের যথার্থ অর্থ খুঁজতে গেলে হিন্দু সমাজের এই বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতিকে মনে রাখা দরকার।

রামমোহন যখন পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে অভিযান চালালেন অথবা সহমরণের বিরুদ্ধে আন্দোলন তৈরি করে তুললেন তখন হিন্দু সমাজে যে অসন্তোষ দেখা দিল তার কারণ তিনি সমাজের চেহারাকে বদলে দিতে চেয়েছেন। আচার অনুষ্ঠানের দ্বারাই সমাজ চিহ্নিত হয়ে থাকে। সুতরাং রামমোহন যে সর্বমানবিক অনুভূতির প্রবর্তনায় সংস্কারে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, সে অনুভূতি বিশিষ্ট সামাজিক অনুভূতির চেয়ে স্বতন্ত্র। এ জন্য রামমোহনের বিরুদ্ধে উদ্যত হয়েছে যে-সমাজ, সংস্কারের জন্য সে-সমাজ বাইরের হস্তক্ষেপ সহ্য করে নি। হিন্দু সমাজেও সংস্কার হয়েছে। রঘুনন্দনের কথা আমরা জানি। তিনি সমাজে থেকেই এ কাজ করেছিলেন। বস্তুত রাধাকান্ত সহমরণপ্রথাকে উৎকৃষ্ট সামাজিক আচার বলে মনে করতেন কিনা বলা শক্ত, কারণ তাঁর নিজের পরিবারে সত্য সত্যই সহমরণ কখনো হয় নি ; কিংবা এটা কোনো অবশ্য অনুষ্ঠেয় কর্তব্য হিসাবেও প্রচলিত ছিল না। এমন কি এ তথ্যও আজ অবিদিত নেই যে রামমোহন সহমরণ বিষয়ে গ্রন্থ রচনার পূর্বেই মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার এই প্রথার অশাস্ত্রীয়তা প্রতিপন্ন করেছিলেন। এতে এটাই প্রমাণ হয় যে সহমরণ রীতি সম্বন্ধে পূর্বে থেকেই ঐকমত্য ছিল না। রাধাকান্ত দেবও প্রথমেই রামমোহনের বিরোধিতা করেন নি। কেন না কোনো শাস্ত্রীয় আচার অনুষ্ঠানের যৌক্তিকতা আলোচনার অধিকার চিরকালই স্বীকার্য। তাঁর ব্যক্তিগত বিশ্বাস যাই থাক, রামমোহনের সহমরণ বিষয়ক বাদ বিতর্কে তিনি কোনো প্রতিবাদ করেছিলেন বলে জানি না। তাঁর প্রতিবাদ তখনই উচ্চারিত হল যখন ইংরেজ শাসক এ বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে এগিয়ে এল। কেন না তাঁর মনে হল সমাজের অধিকারকে শাসক হরণ করে নিচ্ছে। সমাজের স্বতন্ত্রতাকে বিসর্জন দিতে তিনি সম্মত ছিলেন না। রাধাকান্তকে এ স্থলে আমরা দেখি একটি ঐতিহাসিক অধ্যায়ন্তরের যুগে একটি বিশিষ্ট সমাজ মানসের শেষ প্রতীক হিসাবে, সে মানস বস্তুতই বিলীয়মান। সমাজের সেই অনন্যপরতন্ত্রতা আর থাকছে না, ব্যক্তি মানুষের উদ্ভেদ ঘটছে, গোষ্ঠীমুক্ত স্বাধীন চিন্তার সৃষ্টি হচ্ছে। নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র যে ভূমিকা একদা গ্রহণ করেছিলেন, রাধাকান্ত দেব বুঝতে পারেন নি—এখন আর সে ভূমিকা

পালনের যুগ নেই। ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁর 'সামাজিক প্রবন্ধে' মন্তব্য করেছিলেন—

"ইউরোপে ধর্মশাসনের গৌরব ন্যূন। শুদ্ধ ধর্মশাসনের গৌরব ন্যূন এমত নহে, ইউরোপে ধর্মোপদেষ্টৃগণকে রাজ্যপালের অধীন হইয়াই চলিতে হইয়াছে। ...ভারতবর্ষে ওরূপ হইতে পারে নাই। এখানে রাজ্যশাসন ও ধর্মশাসন উভয় শক্তিই আর্যপুরুষদিগের আয়ত্ত হইয়াছিল। এখানে ধর্মশাসন রাজ্যশাসন অপেক্ষা অল্প গৌরবের বিষয় বলিয়া মনে হয় নাই।...এখানে ধর্মশাসন রাজ্যশাসনের অধীন হইয়া পড়া দূরে থাকুক, উহাই প্রবলতর এবং রাজশক্তির অযথা বৃদ্ধির নিবারণে সক্ষম হইয়াছিল।"[৩]

ইংরেজরা আসার পর রাজশাসন এবং সমাজশাসন আলাদা হয়ে গেল। যতদিন ইংরেজ সমাজের বিধি নিয়মে হস্তক্ষেপ করে নি ততদিন এ-প্রশ্ন ওঠে নি। কিন্তু সমাজের ইচ্ছার বিরোধিতা হওয়াতেই রাজা এবং সমাজের ভেদ সম্পূর্ণ প্রকট হয়ে পড়ল। এখন এমন একটা যুগে আমরা উত্তীর্ণ হয়েছি যখন এ ভেদ বেড়েই চলবে। রাজনৈতিক অথবা অর্থ নৈতিক বিধানে প্রজা চালিত হবে। সামাজিক বিধি নিয়মগুলির সর্বময়তা ক্রমেই অর্থহীন হয়ে পড়বে। অনেক দিন পর্যন্ত শাসক ধর্মশাসনের নিরঙ্কুশত্বে হস্তক্ষেপ করে নি। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ২৮-এ ডিসেম্বর হেস্টিংসের বিদায় গ্রহণ উপলক্ষে যে মানপত্র প্রস্তুত হয়েছিল, তাতে ধর্মবিষয়ে রাজ্যশাসনের নিরপেক্ষতার বিশেষ সপ্রশংস উল্লেখ করা হয়েছিল।[৪] কিন্তু বেণ্টিঙ্কের সময়ে এবং পরে হিন্দু কলেজে অহিন্দু ভর্তি করায় এবং বিধবা বিবাহ আইনসিদ্ধ করায় রাধাকান্ত দেখলেন রাজ্যশাসন ধর্মশাসনের চেয়ে বড়ো হয়ে উঠছে। রাজা এবং সমাজের মধ্যে সম্পর্কের চরিত্রই বদলে যাচ্ছে।

এই পটভূমিতেই রাজা রাধাকান্ত দেবের ব্যক্তিত্ব নির্ণয় করে নেওয়া উচিত।

---

৩ ভূদেব মুখোপাধ্যায়, সামাজিক প্রবন্ধ, 'পাশ্চাত্য ভাব— রাজার সমাজ প্রতিভূত্ব'।

৪ 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' ১ম খণ্ড, পৃ ২৩৩-৩৪। সভাতে কেউ কেউ প্রস্তাব করেছিলেন সতীদাহনিবারণে হেস্টিংসের হস্তক্ষেপ না করার জন্য প্রশংসা করে বাক্য সন্নিবেশিত হোক। কিন্তু রসময় দত্ত এবং রামকমল সেন বলেন 'এই ক্রিয়া আমাদের দেশের নিন্দনীয়। অতএব সে কথা ইহাতে বিন্যাস করা কর্তব্য নহে—' এজন্য সতীদাহের কোন উল্লেখ হয় নি। এই সভার উদ্যোক্তাদের অন্যতম ছিলেন রাধাকান্ত দেব এবং রামকমল সেন। পরে উভয়েই ধর্মসভার কর্মকর্তা হয়েছিলেন।

বিগত দিনের আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাকে সাধারণভাবে রক্ষণশীলতা বলা হয় বটে, কিন্তু এ রকম নিষ্ঠামাত্রকেই রক্ষণশীলতা বলা উচিত নয়। এই নিষ্ঠার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে দেখা উচিত। ব্যক্তিরূপে কেউ কেউ ভিন্নতর পথ অবলম্বন করতে পারেন অবশ্যই, কিন্তু সমগ্র সমাজের বৃহত্তম অংশের চিন্তাধারার প্রতিনিধিরূপে রাধাকান্ত ভেবেছিলেন সেই ন্যায়ান্যায়-বোধের মূল্যমান বুঝি অব্যাহতই থাকবে। ইতিহাসে তথাকথিত প্রাচীন এবং নবীনের কোনো নির্দিষ্ট কালভাগ নেই। এ কথাটা সব সময়ে মনে রাখি না বলে আমরা 'স্ববিরোধিতা তত্ত্বে'র আশ্রয় নিই। রামমোহন-নব্যবঙ্গের সংস্কার-আন্দোলনের কয়েক দশক পরেও এই প্রাচীনের চিহ্ন মুছে যায় নি। আমরা তাই উনিশ শতকের শেষেও স্ববিরোধিতা তত্ত্বের সূত্র প্রয়োগ করি; এমন কি স্ববিরোধিতা একালেও প্রবল।

রাজা রাধাকান্ত দেবের জীবনী পর্যালোচনা করলেও এ বস্তুটির সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে। রাধাকান্ত সতীদাহ নিবারণের বিরুদ্ধে ধর্মসভা গঠন করেছিলেন আবার ইনিই হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠার দ্বিতীয় বৎসরে ডিরেক্টর সভার সভ্যরূপে ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারে উদ্যোগী হয়েছিলেন। হিন্দু কলেজের নিয়মাবলী তিনিই রচনা করেছিলেন। রাধাকান্ত তৎকাল-প্রচলিত প্রথানুযায়ী আরবি এবং ফারসি শিখেছিলেন; সংস্কৃতও তিনি উত্তমরূপেই শিখেছিলেন। কিন্তু প্রথমেই কাজে লাগালেন ইংরেজি শিক্ষাকেই। কানিংহ্যাম সাহেবের ক্যালকাটা একাডেমীতে ইংরেজির সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়; সে পরিচয় হিন্দু কলেজে ইংরেজি বিদ্যাবিতরণের পরিকল্পনায় রূপান্তরিত হয়। এখানে আধুনিক পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানই শিক্ষা দেওয়া হত। ধর্মশিক্ষা দেওয়ার কোনো কথাই এতে ছিল না।[৫] এর নিয়মাবলীর প্রথম সূত্রেই ছিল The tuition of the sons of respectable Hindoos in the English and Indian language and in the literature and science of Europe and Asia. রাধাকান্ত দেব শিক্ষা-পরিকল্পনায় সমাজ-সংরক্ষণের কথা চিন্তা করেন নি, যদিও রামমোহন উপনিষৎ গ্রন্থাবলী প্রচারের দ্বারা ধর্মসংস্কারের আয়োজন

৫ বস্তুত একথা সুবিদিত যে রামমোহন ধর্মশিক্ষা দেওয়ার জন্যই শিক্ষালয় স্থাপন করতে চেয়েছিলেন; কিন্তু সে পরিকল্পনা মেনে না নিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থার জন্যই হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়েছিল। দ্রষ্টব্য **Peary Chand Mitra,** ***Biographical Sketch of David Hare*****, 1877.**

করেছেন। রাধাকান্ত এতে কিছুমাত্র ত্রস্ত না হয়ে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিতরণের উপরেই ঝোঁক দিয়েছিলেন। একজন সাম্প্রতিক ঐতিহাসিক এই ঘটনাটির বিশদ পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত করেছেন—

"The Orientalist belief that Western education should serve not as an end in itself but as the stimulus for changing the indigeneous culture from within explains why Bengalis accepted the experiment without a recorded murmur of dissent "[৬]

এ সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত মনে হয়। রাধাকান্ত সমাজের ও সংস্কৃতির পরিবর্তন চান নি— এ কথা সত্য নয়। তিনি পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রভাবে বাঙালি সংস্কৃতির মধ্যে ধীর এবং স্বাভাবিক পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন। সে পরিবর্তন সমাজের প্রতি শ্রদ্ধা রক্ষা করেই আনতে হবে— অশ্রদ্ধা করে নয়।

ডিরোজিও-অপসারণের ঘটনাটা পর্যালোচনা করে দেখা যাক। ডিরোজিও হিন্দু কলেজে শিক্ষক হিসাবে যোগ দেন ১ মে ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে। ডিরোজিও আমলে কলেজে শিক্ষাদীক্ষা যে ভালোভাবেই অগ্রসর হচ্ছিল ১৮২৮-এর ১৪ই ফেব্রুয়ারির ক্যালকাটা গেজেটের বিবরণেও তার প্রমাণ আছে। তখনও পর্যন্ত ছাত্রদের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতার কোনো সংবাদ নেই।[৭] অতঃপর ১৮২৮-এ ডিরোজিওর নেতৃত্বে তাঁরই বাড়িতে একাডেমিক এসোসিয়েশন স্থাপিত হল। হিন্দু কলেজের অনেক ছাত্র এই সভায় উপস্থিত থেকে আলোচনায় যোগ দিত। বস্তুত এই সভা থেকেই বৈপ্লবিক চিন্তাধারা ছাত্রদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। এই সভার অনুকরণে কলকাতাতে কলকাতা স্কুল সোসাইটির স্কুলগুলির উদ্যোগে আরও সাতটি সভা স্থাপিত হয়েছিল।[৮] এইসব সভাতেও ডিরোজিও উপস্থিত থাকতেন। এই সমস্ত আলোচনার দ্বারাই নবশিক্ষিতদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিল। নব্যবঙ্গের আন্দোলন হিন্দু কলেজের শিক্ষাপদ্ধতির প্রত্যক্ষ

---

৬ David Kopf, *British Orientalism and Bengal Revaissance*, 1958, p 181.

৭ *The Days of John Company*, Ed. Anil Chandra Dasgupta, 1959, p 288.

৮ Alexander's East India Magazine, London, June, 1831. A. F. Salahuddin Ahmed, *Social Ideas and Social Change in Bengal*, Leiden p 41-এ উদ্ধৃত।

ফল ছিল না। এ ছিল একাডেমিক এসোসিয়েশন ও ডিরোজিওর অনুপ্রেরণার ফল। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮২৯-এর নভেম্বর মাসে হিন্দু কলেজের শিক্ষা সমাপ্ত করে পটলডাঙ্গা স্কুলে শিক্ষকতা গ্রহণ করেন। ডিরোজিওর প্রভাব তখন তাঁর উপর পূর্ণমাত্রায়। ১৮৩১-এ রাধাকান্ত সার এডওয়ার্ড রায়ানকে লিখেছিলেন কৃষ্ণমোহনকে শিক্ষকপদ থেকে বরখাস্ত করতে।[৯] রাধাকান্ত তখন স্কুল সোসাইটির সম্পাদক। দেখা যাচ্ছে, ডিরোজিওর প্রত্যক্ষ প্রভাবেই নব্যবঙ্গের প্রথাবিরোধী আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। ১৮৩০-এর আগে পত্র-পত্রিকায় এই আন্দোলনের কোনো সংবাদ নেই। এই বছরের জানুয়ারি মাসে সতীদাহনিবারণের আইন প্রণয়ন হয়েছিল। ডিরোজিও এই উপলক্ষে একটি সনেট রচনা করেছিলেন।

রাধাকান্তকে তখন দুই দিক দিয়েই সতর্ক থাকতে হচ্ছিল— ধর্মসভা স্থাপন ও বেন্টিঙ্কের নিকট আবেদন প্রেরণ, আর-এক দিকে তাঁর স্থাপিত হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণের উপায় বের করা। নব্যবঙ্গের অননু-মোদনীয় আচরণ চরমে উঠেছিল ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল থেকে জুন মাসের মধ্যে। এপ্রিল মাসেই ডিরোজিওকে কর্মচ্যুত করা হয়। জুন মাসে ঘটে কৃষ্ণমোহনের বাড়িতে নিষিদ্ধ মাংসাহারের ঘটনা। ডিরোজিওকে অপসারণের ব্যাপারে রাধাকান্ত দেব এবং রামকমল সেন দুইজনেই বিশেষ সক্রিয় হয়েছিলেন। কলেজের অভ্যন্তরে ডিরোজিওর শিক্ষাদান নৈপুণ্য সম্বন্ধে কারো সন্দেহ ছিল না, তথাপি যেহেতু ছাত্রদের বাইরের সভাসমিতিতে যোগদান নিষিদ্ধ করার ক্ষমতা পরিচালক সভার নেই, কলেজ ছাত্রদের ভবিষ্যৎ কল্যাণের কথা ভেবে ডিরোজিওকেই ছাত্রদের পক্ষে অবাঞ্ছিত বলা ছাড়া গত্যন্তর রইল না। রাধাকান্ত এ ব্যাপারে আইনের সূক্ষ্ম প্রয়োগের ছলে তাঁর চিন্তিত সমাজের কল্যাণকে এড়িয়ে যেতে চান নি। ডিরোজিও দক্ষ শিক্ষক— এবং কলেজের বাইরে একাডেমিক এসোসিয়েশনের ফল তাঁদের বিচার্য নয়— এই যুক্তিতে ডিরোজিওকে কলেজে রেখে দিলে সমাজের প্রতি তাঁর কর্তব্যে অবহেলা ঘটত। বিশেষ করে অনেক ছাত্রই কলেজে যোগদানে বিরত থাকছিল; তাতে হিন্দু কলেজের অস্তিত্বের মূলেই অনিশ্চয়তা দেখা দেবার উপক্রম হয়েছিল। ফলে যে উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁরা কলেজ স্থাপন করেছিলেন, সেই উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবার

৯ **A. F. Salahuddin Ahmed** বেন্টিঙ্কের কাগজ-পত্র থেকে এই তথ্য জানিয়েছেন।

আশঙ্কা। রাধাকান্ত ডিরোজিওর বৈদগ্ধ্যে বা পাণ্ডিত্যে কোনো সংশয় প্রকাশ করেন নি। উইলসনকে লেখা ডিরোজিওর চিঠি সম্পর্কে রাধাকান্ত লেখেন—

"As to the excuses contained in Mr. Derozio's resignation, they are of no use and shall not be attended to when he was dismissed on the public feeling."

এক্ষেত্রেও রাধাকান্তকে দেখি সমাজনেতারূপে। সমাজে যেভাবে প্রাণ সঞ্চার করতে চেয়েছেন তাতে বাধা ঘটে সবটাই চোরাবালিতে হারিয়ে যেত। ডিরোজিওকেও না সরিয়ে উপায় ছিল না।

আধুনিক কালের উপযোগী শিক্ষা প্রসারে রাধাকান্তের অক্লান্ত প্রয়াস ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবার যোগ্য। পুরনো যুগের শিক্ষানীতি অচল হয়ে নতুন শিক্ষানীতির প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে— এ উপলব্ধি রামমোহনের মতো রাধাকান্তের মনেও এসেছিল। কিন্তু রামমোহন ধর্মসংস্কারেই প্রধানত ব্যাপৃত ছিলেন। শিক্ষার ব্যাপারে বেশি মন দিতে পারেন নি। নানা কারণে রামমোহন হিন্দু কলেজের সঙ্গে যোগ রক্ষা করতে পারেন নি। রামমোহনের যোগদানে কলেজ প্রতিষ্ঠাতেই বাধা ঘটতে পারত। তথাপি তিনি ছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষার পক্ষপাতী। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে লর্ড আমহার্স্টকে তিনি লিখেছিলেন তাঁর বিখ্যাত পত্র। রামমোহন ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দেই অ্যাংলো হিন্দু স্কুল নামে একটি ইংরেজি স্কুল স্থাপন করেছিলেন। শিক্ষার প্রসারে রামমোহন এর চেয়ে বেশি কিছু করতে পারেন নি।

রাধাকান্ত কিন্তু আজীবন শিক্ষাব্রতী ছিলেন। এ যুগের উপযোগী পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারে তিনি হিন্দু কলেজের পরিচালনা-কার্যকে যেমন অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গেই গ্রহণ করেছিলেন তেমনি নতুন শিক্ষার উপযোগী গ্রন্থ প্রণয়নে স্কুল বুক সোসাইটি এবং স্কুল সোসাইটির দায়িত্বও তিনি ততোধিক গুরুত্বের সঙ্গেই পালন করেছিলেন। আবার সংস্কৃত শিক্ষার জন্যও তাঁর সতর্ক চেষ্টা ছিল। গোড়ার দিকে সংস্কৃত কলেজের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না, তখন তিনি স্কুল সোসাইটি এবং হিন্দু কলেজ নিয়েই ব্যস্ত। তিনি নিজে সংস্কৃত বিদ্যার চর্চা করতেন। তাঁর সম্পাদিত বিরাট 'শব্দকল্পদ্রুম' তার সাক্ষ্য। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে এর প্রথম খণ্ড বেরিয়েছে। ১৮৫১-তে এর সপ্তম খণ্ড প্রকাশিত হলে তিনি ম্যাক্সমূলারকে লিখেছিলেন—

"When I ventured to assume the character of a Lexicographer my most ambitious wish was but to revive the study of Sanscrit in my own country where it has been on the decline. But I should not dissemble that love of fame stimulated my exertions through worldly tribulations where patience must have failed and perseverence wearied."[১০]

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা আবিষ্কার এবং তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব চর্চার ফলে গত শতাব্দীতে ইউরোপে সংস্কৃত অনুশীলন আরম্ভ হয়। তখন রাধাকান্ত দেবের শব্দকল্পদ্রুম সংস্কৃতচর্চার একটি প্রধান অবলম্বন হয়ে দাঁড়ায়। সেই সূত্রে রাধাকান্তের সঙ্গে য়ুরোপীয় প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্‌দের পত্রযোগে আলাপ হয়। এটা একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা তাতে সন্দেহ নেই। ভারতীয় সংস্কৃতির বাণীবাহকের কাজ বলতে গেলে শব্দকল্পদ্রুমই করেছিল। আজকের দিনে যাকে 'মানবিকী বিদ্যা' বলে রাধাকান্তের সংস্কৃত বিদ্যা সেকালে ছিল তাই। কেননা স্কুল বুক সোসাইটি বা হিন্দু কলেজ মোটের উপর প্রয়োজনীয় জ্ঞানের (useful science) শিক্ষাক্ষেত্র রূপেই স্বীকৃত হয়েছিল। তাকে সম্পূর্ণরূপে ধর্মনিরপেক্ষ করে রাখবারই চেষ্টা হয়েছে। রাধাকান্ত যেন বুঝতে পেরেছিলেন শুধু ব্যাবহারিক বিদ্যা দিয়ে মানুষ সম্পূর্ণ হয় না। সাংস্কৃতিক শিক্ষা বা মানবিক বিদ্যার চর্চা একই সঙ্গে হওয়া দরকার। সংস্কৃত শিক্ষার ব্যাপারে সরকারী ঔদাসীন্য দেখে তিনি নিজেই শোভাবাজারে একটি সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন (১৮৫৭)। রাধাকান্ত ১৮৩৬ থেকে ১৮৩৭ পর্যন্ত কিছুকাল সরকারী সংস্কৃত কলেজের সম্পাদকও ছিলেন।

তবু আধুনিক শিক্ষা বিস্তারেই তাঁর চিন্তা পরিকল্পনা সমভাবে কার্যকরী হয়েছিল। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার ছয় মাসের মধ্যে পাঠ্যপুস্তক রচনার জন্য কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি গঠিত হয়। এর প্রতিষ্ঠা থেকেই রাধাকান্ত দেব এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হলেন।[১১] সোসাইটির বেশ কয়েকটি বই তিনি

---

১০ সাহিত্যসাধকচরিতে 'রাধাকান্ত দেব', পৃ ৩৪-৩৫।

১১ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় *Proceedings of the Indian Historical Records Commission*, 9th session Lucknow 1926-এ **Raja Radhakanta Deb's Service to the Country** নামে একটি প্রবন্ধ পড়েন। তাতে রাধাকান্ত দেব-সম্পর্কিত একটি মূল্যবান চিঠি আছে। তার অংশ যোগেশচন্দ্র বাগল 'রাধাকান্ত দেব' (সা-সা-চ) বইতে উদ্ধৃত করেন।

সংকলন, অনুবাদ এবং পরিমার্জনা করে দিয়েছেন। তারিণীচরণ মিত্র এবং রামকমল সেনের সহযোগে রাধাকান্ত রচনা করেছিলেন 'নীতিকথা' (১৮১৮)। তাঁর 'বাঙ্গালা শিক্ষাগ্রন্থ' (১৮২১) ২৮৮ পৃষ্ঠার একটি কোষগ্রন্থ। এতে ভূগোল, ইতিহাস, ব্যাকরণ প্রভৃতি বিষয় ছিল। রাধাকান্ত বিজ্ঞানেরও প্রয়োজনীয়তা বুঝেছিলেন। তিনি জ্যোতির্বিদ্যার একখানি অনুবাদগ্রন্থও স্কুল বুক সোসাইটির পক্ষে পরিমার্জনা করে দিয়েছিলেন।

এই বইটি পাদরি য়েটস্-রচিত এবং এর কিয়দংশ রাধাকান্তের লেখা বলে ডেভিড কফ অনুমান করেন।[১২] যোগেশ বাগল অবশ্য 'পাণ্ডুলিপি সংশোধন' রাধাকান্ত-কৃত বলেছেন। স্কুল বুক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত আর-একটি বইয়ের বিশেষ উল্লেখ প্রয়োজন। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে গৌরমোহন বিদ্যালংকার 'স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক' নামে বইটি লেখেন।[১৩] তখন মিশনারীদের চেষ্টায় বালিকা বিদ্যালয়গুলি স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু বাঙালিদের মধ্যে স্বভাবতই নানা সংস্কারের ফলে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে নানা সংকোচ ছিল। এই সংকোচ দূর করবার জন্যই রাধাকান্ত এই বইটি লেখানোর প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছিলেন। যদিও বইটি প্রত্যক্ষত রাধাকান্ত নিজে লেখেন নি বই লেখার প্রেরণা ও নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি। এ বইয়ের উপকরণ বিশেষত পৌরাণিক স্ত্রীশিক্ষার কাহিনী এবং বিবরণ রাধাকান্তই সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন। আধুনিক দৃষ্টান্তেরও অনেকগুলি তাঁর সংগ্রহ। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে বেথুনকে লিখিত একটি চিঠিতে তিনি লেখেন—

"To this extent I have a share in the execution of the work and no further. I can not therefore conscientiously take upon myself the credit of an author."[১৪]

নারী জাতির প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ কর্তব্য পালন দ্বারাই রামমোহন যে আধুনিক

---

১২ David Kopf, *British Orientalism and Bengal Renaissance* 1969, পৃ ১৯৫ পাদটীকা। কফ স্কুল বুক সোসাইটি থেকে ১৮৩০-এ প্রকাশিত 'প্রাচীন ইতিহাস সমুচ্চয়' বইটিও রাধাকান্তের লেখা বলে মনে করেন।

১৩ 'সমাচার দর্পণে' (৬ এবং ১৩ এপ্রিল ১৮২২) এই বইয়ের বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল। সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম, পৃ ১৩-১৪।

১৪ বেথুনকে লেখা চিঠির অংশবিশেষ 'গৌরমোহন বিদ্যালংকার' (সা-সা-চ) বইতে এবং বিস্তৃততর অনুবাদ দেওয়া আছে 'রাধাকান্ত দেব' (সা-সা-চ) বইতে।

মনোভাবের সূচনা করেছিলেন, রাধাকান্ত সেই মনোভাব নিয়েই স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে উদ্যোগী হয়েছিলেন। এ বিষয়ে মিশনারীদের সহযোগিতা করতে তাঁর দ্বিধা ছিল না। রাধাকান্ত স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ে সাহসিক যুক্তিও দিয়েছিলেন। লেখাপড়া শিখলে স্ত্রীলোককে বৈধব্য বরণ করতে হয় এই কুসংস্কারের উপযুক্ত প্রতিকূল শাস্ত্রীয় দৃষ্টান্ত রাধাকান্ত দিয়েছেন গৌরমোহনের বইতে। গৌরমোহনের ওই বই বের হবার আগেই রাধাকান্ত ১৮২১-এ 'ব্রিটিশ এণ্ড ফরেন স্কুল সোসাইটি'র উদ্যোগকে সমর্থন করেন। অবশ্য তিনি মেয়েদের বাড়িতে পড়াবারই পক্ষপাতী ছিলেন। দরিদ্র ছাত্রীদের জন্য সদ্য প্রতিষ্ঠিত মিশনারী স্কুলগুলির প্রচেষ্টায় তাঁর পূর্ণ সম্মতিও ছিল। রাধাকান্ত এই মত প্রকাশ করেছেন এমন সময়ে যখন কলকাতায় হিন্দু নারীদের বিদ্যাশিক্ষার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। ১৮২১-এর ২রা জুনের কলকাতা স্কুল সোসাইটির দ্বিতীয় বার্ষিক সভায় সার এডওয়ার্ড হাইড ঈস্ট এ বিষয়ে দেশীয় ব্যক্তিদের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। তিনি অবশ্য সাধারণের জন্য স্ত্রীবিদ্যালয়ের প্রয়োজনের কথাই বলেছিলেন। কিন্তু তার পূর্ব থেকেই বাড়িতে মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর রীতি, গৃহশিক্ষক রেখেও, সম্ভ্রান্ত পরিবারে প্রচলিত ছিল। বেথুন যখন তার বিখ্যাত স্কুল প্রতিষ্ঠার কাজে এগিয়ে এলেন, তার পূর্বে রাজা রাধাকান্ত দেবের সতীদাহ সমর্থন আন্দোলনে এবং হিন্দু কলেজ থেকে সম্পর্কচ্ছেদ ইত্যাদি ব্যাপারে কারো কারো ধারণা হয়েছিল তিনি নারীশিক্ষার মত প্রগতিমূলক আন্দোলনের বিরোধী। সে জন্যই রাধাকান্ত বেথুনকে খুব স্পষ্ট ভাষাতেই এ বিষয়ে তাঁর অভিমত লিখে পাঠান। তিনি লেখেন—

"আপনি যে মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে এতটা প্রয়াসী হইয়াছেন সে সম্বন্ধে আমার অভিমত সম্পর্কে বিপরীত ধারণা দূর করিবার জন্য আমি এই সুযোগে বলিয়া রাখি যে আমি নিজে এত কাল উপদেশ ও কর্মের দ্বারা দেখাইয়াছি যে আমি স্ত্রীশিক্ষার একজন প্রধান উদ্যোক্তা। জাতির নৈতিক চরিত্র ও সামাজিক সুখ বৃদ্ধির পক্ষে স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা যে কত অধিক, তাহা এখন আর ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে হইবে না।"

কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটির সঙ্গে রাধাকান্তের যোগ দীর্ঘকালের। স্কুল বুক সোসাইটি (১৮১৭) প্রতিষ্ঠিত হবার পরের বৎসরেই এই সভার সভ্যদের আগ্রহে ও উদ্যোগে কলিকাতা স্কুল সোসাইটি গঠিত হল। এই

শিক্ষাসমাজ ছিল দেশের আকাঙ্ক্ষিত ইংরেজি ও আধুনিক শিক্ষাকে সংহত রূপ দেবার প্রথম চেষ্টা— কলকাতায় যেসব বিদ্যালয় ব্যক্তিগত আয়োজনে চলছিল সেগুলির সাহায্য ও উন্নয়ন এবং প্রয়োজন হলে নতুন বিদ্যালয় স্থাপন। এই সমাজকেই বলা যায় সরকারী জেনারেল কমিটি ফর পাবলিক ইনস্ট্রাকশনের পূর্বাভাস। দেশে নতুন শিক্ষার জন্য যে আকাঙ্ক্ষা দেখা দিয়েছে, তা মেটাবার জন্য দেশীয় ব্যক্তিদের উদ্যোগেই হিন্দু কলেজ এবং স্কুল সোসাইটি স্থাপিত হয়। স্কুল সোসাইটির সম্পাদক ছিলেন রাধাকান্ত দেব। সেই সঙ্গে তিনি ছিলেন হিন্দু কলেজের পরিচালকসভার সদস্য, আবার স্কুল বুক সোসাইটিরও তিনি ছিলেন সভ্য। এই তিনটি ক্ষেত্রেই রাধাকান্তের অপ্রতিহত কর্মোদ্যম ও প্রভাব সুদূরপ্রসারী হয়েছে। ইংরেজি শিক্ষার ব্যাপারে সরকার অপেক্ষাকৃত উদাসীন ছিলেন। কমিটি অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন সংস্কৃত কলেজ ও মাদ্রাসা স্থাপন করেছিল। তা ছাড়া সংস্কৃত আরবি এবং ফারসি গ্রন্থ প্রকাশে অজস্র অর্থব্যয় করেছে। আর রাধাকান্ত দেবের সক্রিয়তায় কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি বাঙ্‌লা ভাষায় আধুনিক প্রয়োজনীয় বিদ্যার বই এবং ইংরেজি বইও প্রকাশ করে চলেছে। ট্রেভেলিয়ন দেখেছিলেন, দুই বছরে স্কুল বুক সোসাইটি ৩১০০০ ইংরেজি বই বিক্রয় করেছিল, সেই তুলনায় তিন বছরে কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশনের বই ছাপার খরচও ওঠে নি।

সরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারী উদ্যোগ সার্থক হয়ে উঠছিল। কলকাতার প্রাথমিক স্কুল ও পাঠশালাগুলিকে তিনি স্কুল সোসাইটির নিয়মশৃঙ্খলাধীনে নিয়ে এলেন। তিনি কলকাতাকে চারিটি অঞ্চলে ভাগ করে চার জন পরিদর্শক নিযুক্ত করলেন। ১৬৬টি পাঠশালার মধ্যে ৮৫টিই ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সোসাইটির অধীনে এসেছে। এসব স্কুলে স্কুল বুক সোসাইটির বই বিতরণ করা হত। শোভাবাজার অঞ্চলের কার্যক্রম তাঁর বাড়ি থেকেই পরিচালিত হত। তিনি নিজেই ছিলেন এর তত্ত্বাবধায়ক।[১৫] সোসাইটির অধীনে প্রথম আসতে কোনো কোনো পাঠশালার আপত্তি হয়েছিল। কিন্তু রাধাকান্ত বই এবং শিক্ষাপ্রণালীকে সম্পূর্ণরূপে ধর্ম বিষয়ে মুক্ত রাখতে সচেষ্ট হওয়াতে ভয় কেটে গিয়েছিল। বলা বাহুল্য খ্রীষ্টধর্ম সংক্রান্ত কথা থাকবে— এই ছিল তাদের আশঙ্কা। রাধাকান্ত কোনো রকম ধর্ম বিষয়ই বইতে রাখতে দেন নি।

১৫ যোগেশচন্দ্র বাগল, 'বাংলার জনশিক্ষা' (বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ), পৃ ১৬।

ব্যক্তিগত ভাবে, বলা বাহুল্য, তিনি হিন্দু ধর্মে উৎসাহী ছিলেন কিন্তু খ্রীষ্টধর্মের অনুপ্রবেশ রোধ করবার জন্য হিন্দু ধর্মের বিষয় সন্নিবেশের অধিকারও তিনি ত্যাগ করেছেন। মোটের উপর রাধাকান্ত শিক্ষানীতিতে যে ধর্মনিরপেক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন সেটা আজকের দিনে বিশেষ ভাবেই দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত। তিনি এ বিষয়ে শক্তিশালী সহযোগী পেয়েছিলেন ডেভিড হেয়ারকে। রাধাকান্তের মত প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি ধর্ম বিষয়ে গোঁড়ামির পরিচয় দিতে চাইলে অবশ্যই দিতে পারতেন। হয়তো সেরূপ ক্ষেত্রে হেয়ারের সঙ্গে মতামতের পার্থক্য ঘটত এবং তার কী পরিণাম হতে পারতো বলা যায় না। কিন্তু তার কিছুরই কারণ ঘটল না। রাধাকান্ত এবং ডেভিড হেয়ার দুজনেই একটি শিক্ষিত মানবতন্ত্রী সমাজের কল্পনাই করেছেন এবং এদিক দিয়ে আধুনিক জাগরণে তাঁদের বিশিষ্ট ভূমিকাটিকে কোনো দিক দিয়েই তুচ্ছ করা চলে না। রাধাকান্তের শিক্ষানীতির আর-একটি বৈশিষ্ট্যও আমাদের চোখ এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়। তাঁর সংস্কৃত শিক্ষার উৎসাহের কথা জানি, হিন্দু কলেজে প্রবর্তিত ইংরেজি শিক্ষায় তাঁর গভীর আগ্রহের কথাও জানি। আবার ইংরেজি ও সংস্কৃত কোনো শিক্ষার সর্বাত্মকতার দ্বারাই জনসাধারণকে জাগ্রত করে তোলা সম্ভব নয়। খ্রীষ্টান মিশনারীরা বাংলা ভাষার চর্চা শুরু করেছিল তাদের সংকীর্ণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দেই জশুয়া মারশম্যান Hint Relative to Native Schools নামে একটি বই প্রকাশ করে বাংলা ভাষার সাহায্যে শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। এ ধরনের প্রস্তাবের দরকার এই জন্যেই ছিল যে, আগে উচ্চ শিক্ষা চলত সংস্কৃতের সাহায্যে। এ কালে যখন ইংরেজি শিক্ষা এল তখন ইংরেজির মাধ্যমেই শিক্ষার প্রবর্তন স্বাভাবিক ভাবেই হতে পারত। রাধাকান্ত ইংরেজি শিক্ষার জন্য পূর্ণ সমর্থন করেও দেশী পাঠশালার মাধ্যমে বাংলা ভাষার মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে চেয়েছিলেন। সোসাইটির ইংরেজি স্কুল থেকে হিন্দু কলেজের জন্য ছাত্র তৈরি করা হত। বাংলা পাঠশালা তুলে দেওয়ার জন্য হেয়ার ১৮৩৩-এ যে প্রস্তাব করেন, রাধাকান্ত তার বিরোধিতা করেছিলেন। 'সোসাইটির পাঠশালা বিভাগের উন্নতিপক্ষে রাধাকান্ত দেবের কৃতিত্ব সর্বাধিক।' বাংলা ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করে কারিগরি শিক্ষাদানকে কার্যকরী করে তোলা দরকার— এমন অভিমত রাধাকান্ত দেব প্রকাশ করেছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবার পর। ভাষা-মাধ্যমের দ্বারা জ্ঞান-বিজ্ঞানকে সহজ এবং স্বাভাবিক করে তোলার পক্ষে

আমাদের দেশের মনীষী ব্যক্তিরা আজও বলে আসছেন। রাধাকান্তের অভিমতটি আজও বিশেষ প্রণিধান যোগ্য—

"As soon as the people will begin to reap the fruits of a solid Vernacular education agricultural and industrial schools may be established in order to qualify the enlightened masses to become useful members of society. Nothing should be guarded against more carefully than the insensible introduction of a system whereby, with a smattering knowledge of English, youths are weaned from the plough, the axe and the loom, to render them ambitious only for the clerkships for which hosts would beseige the Government and Mercantile offices."[১৬]

শিক্ষানীতির প্রসঙ্গে রাধাকান্ত দেবকে প্রগতিশীল মত ও কার্যক্রম পোষণ করতে দেখলেও সমাজ ও ধর্মের ক্ষেত্রে তাঁকে রক্ষণশীল বলে অনেকে মনে করেন। সতীদাহনিবারক আইন প্রণয়ন নিয়ে রাধাকান্ত দেবের এই ভূমিকা আমাদের কাছে অস্বস্তির সৃষ্টি করে। বস্তুত এ দুয়ে কোনো বিরোধ আছে কিনা ভেবে দেখা দরকার। তিনি ধর্মবিষয়ে বিদেশী শাসকের হস্তক্ষেপ চান নি। তাই বলে সহমরণ প্রথাটাই সমর্থনযোগ্য এমন নাও হতে পারে। বিধবা বিবাহ আন্দোলনের সময়েও আইন করে বিধবা বিবাহের প্রচলন তিনি চান নি। এসব বিষয়ে তিনি সমাজের আপন অধিকার রক্ষা করতেই চেয়েছেন। পরিবর্তন কিছু করবার দরকার অনুভব করলে সমাজের ভিতর থেকেই তার তাগিদ আসবে এবং যথাযোগ্য ব্যবস্থা হবে। এজন্য অবশ্য কুপ্রথা অনির্দিষ্ট-কালের জন্য সহ্য করে যেতে হয়। রামমোহন বা বিদ্যাসাগর অবশ্যই তা করতে প্রস্তুত ছিলেন না। আবার সহমরণে যে অনেক সময় নারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে অথবা স্বার্থসন্ধী আত্মীয়স্বজনের বলপূর্বক প্রবর্তনা থাকে, সেসব অন্যায় কার্যের জন্য তাঁদের কঠিন প্রতিবাদ ছিল এই প্রথার বিরুদ্ধে। রাধাকান্ত দেব সম্ভবত ভেবেছিলেন এই অন্যায় দূর করতে হলে হিন্দু সমাজই

---

১৬ *Reports on the State of Education in Bengal* by William Adam, (University of Calcutta, 1941) p 495.

সামাজিক পদ্ধতিতে এগিয়ে আসবে। বেন্টিঙ্কের কাছে দেওয়া আবেদনে তিনি লিখেছিলেন—

"That the Hindoo Religion is founded, like all religions, on usage as well as precept and one when immemorial is held equally sacred with the other. Under the sanction of immemorial usage as well as precept, Hindoo Widows perform, of their own accord and pleasure, and for the benefit of their Husband's souls and for their own, the sacrifice of self-immolation called Sutte— which is not merely a sacred duty but a high privilege to her who sincerely believes in the doctrines of her religion."[১৭]

এখানে তিনি হিন্দু রমণীর আত্মত্যাগ এবং গৌরবের উল্লেখ করেছেন। আত্মত্যাগ বস্তুটার মধ্যেই মহত্ত্ব আছে। তবে বিচার্য এই যে স্বামীর মৃত্যুতে এ ভাবে মৃত্যু বরণ করে এভাবে আত্মত্যাগের সত্যই প্রয়োজন আছে কি না। রবীন্দ্রনাথও একটি লেখাতে সহমরণে আত্মার যে নির্ভীকতা প্রকাশ পায় তার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। কিন্তু এ আত্মত্যাগের দ্বারা দেশ সমাজ বা জাতির কী উপকার সাধিত হয়? রাধাকান্ত এখানে দেশাচার এবং শাস্ত্রের উল্লেখ করেছেন আর বলেছেন স্বামীর আত্মার কল্যাণের কথা। এ বিশ্বাস অবশ্যই প্রথাগত।

প্রথা অনুসরণ করা যুক্তিসঙ্গত কি না, প্রথার ভালোমন্দ বিচার শিক্ষা এবং বিবেচনা-সাপেক্ষ। রামমোহনের মত শিক্ষিত চেতনায় এ বিষয়ে সংশয় দেখা দিতে পারে, তারপর আস্তে আস্তে সে সংশয় সমগ্র সমাজে ব্যাপ্ত হয়ে পড়তে পারে। রাধাকান্ত দেব সমাজের এ অধিকার মানতেন, কিন্তু যে রাজা এই সমাজের নয়, তার অধিকারকে মানতেন না। রাধাকান্ত শিক্ষার পথ রুদ্ধ করে সমাজকে ভ্রান্ত পথে চালিত করতে চান নি। বেদপাঠ এবং সংস্কৃত শিক্ষা শুধু ব্রাহ্মণদেরই একমাত্র অধিকার রাধাকান্ত দেব সে মতে বিশ্বাস করতেন না।

---

১৭ এই আবেদনটি ১৮৩০-এর জানুয়ারির ক্যালকাটা গেজেটে বেন্টিঙ্কের উত্তরসহ মুদ্রিত হয়। দ্রষ্টব্য *The Days of John Company*, **1824-1832 Ed. Anil Chandra Dasgupta, 1959, pp 466-471.**

শিক্ষার দিকেই তাঁর বিশেষ ঝোঁক ছিল। শিক্ষা ও শাস্ত্রালোচনার দ্বার তিনি উন্মুক্ত রাখতেই চেয়েছেন। ১৮১৫-তে রামমোহন রায় আত্মীয়সভা স্থাপন করলেন। সে সভায় 'বেদের উপনিষদ হইতে আপনাদের মতানুযায়ি বাক্য পড়া গেল ও তাহার অর্থ করা গেল ও তাঁহারা বেদান্তের মতানুসারে গীত গাইলেন।' ১৮২৩-এর ১৬ ফেব্রুয়ারি রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারিণীচরণ মিত্র প্রভৃতি ব্যক্তিগণ''গৌড়ীয় সমাজ' স্থাপন করিলেন।[১৮] এতে রামমোহনকে দেখতে পাই না বটে, কিন্তু রক্ষণশীল এবং উদারপন্থী সবাই এতে সম্মিলিত হয়েছেন দেখতে পাই। আত্মীয়সভা ছিল বিশেষভাবেই ধর্মালোচনার সভা, কিন্তু গৌড়ীয় সমাজের কর্মসূচী ছিল ব্যাপকতর। এর উদ্দেশ্য ছিল 'জ্ঞানের উন্নতি ও প্রসার, বাংলা ভাষায় গ্রন্থাদির প্রচার নীতি ও শাস্ত্রবিগর্হিত কার্য দমন, গ্রন্থাগার গঠন, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ।' রাধাকান্ত দেবের আজীবন অনুসৃত কার্যক্রমের সঙ্গে গৌড়ীয় সমাজের কার্যক্রম সম্পূর্ণ ই মিলে যায়। সম্ভবত এই সভার উদ্যোগেই রাধাকান্ত দেব বেদের আলোচনা এবং অনুবাদের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন।

গৌড়ীয় সমাজ সম্ভবত রামমোহনের আত্মীয়সভার প্রভাবেই গঠিত হয়ে থাকবে। এই সমাজ যদিও মাত্র দু-বছরই চলেছিল, কিন্তু একে ১৮৩০-এ প্রতিষ্ঠিত ধর্মসভার বীজ বলা যেতে পারে। আত্মীয়সভাতে সহমরণের শাস্ত্রীয়তা আলোচনা হত। গৌড়ীয় সমাজে শাস্ত্রবিগর্হিত কার্য দমনের চেষ্টা হয়েছে। ধর্মসভা মুখ্যত সহমরণ আইনরোধ করবার জন্যই স্থাপিত হয়েছে। ফলে প্রসন্নকুমার ঠাকুর এবং দ্বারকানাথ ঠাকুর আর ধর্মসভায় ছিলেন না। দেশে দেশাচার-বিরোধী যে আবহাওয়া রামমোহন তৈরি করে তুলেছিলেন গৌড়ীয় সমাজের উদ্দেশ্য ছিল সে সম্বন্ধে যথার্থ শিক্ষা ও আলোচনার সুযোগ তৈরি করা। রাধাকান্ত রামমোহনকে সমর্থন করতেন না, এ কথা বলাই বাহুল্য। তথাপি শাস্ত্রানুসন্ধানের প্রয়োজনকে অস্বীকার করেন নি আবার শুধু ধর্মালোচনাতেই সমাজের লক্ষ্যকে সীমিত করে রাখেন নি।

১৮ শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন "রামমোহনের বিপ্লবী ধর্মীয় ও সামাজিক মত প্রতিহত করবার জন্য বর্ণহিন্দুরা 'গৌড়ীয় সমাজ' গঠন করেছিলেন'' (৮ মার্চ ১৮৭২)। দ্রষ্টব্য 'রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য', ১৯২০, পৃ ৩০৮।

ধর্মসভার লক্ষ্য ছিল মূলে একটিই— আইনের রোধ। বেন্টিঙ্ক হিন্দু নাগরিকদের আবেদন প্রত্যাখ্যান করলে বিলাতে আপীল করার যে পরিকল্পনা হয়, তার ব্যবস্থাদি করার ভারও পড়ে ধর্মসভার উপর। বিলাতে প্রেরিত আবেদনটি রচনা করেছিলেন রাধাকান্ত দেব। কিন্তু সে আপীল অগ্রাহ্য হয়। তার পরেই ধর্মসভায় ভাঙন দেখা দেয়। এই সূত্রেও রাধাকান্ত দেবের ভূমিকাটি লক্ষণীয়। ধর্মসভার মুখ্য কাজ যখন বিফল হল তখন কেউ কেউ এ সভা ত্যাগ করে সতীদ্বেষীদের সঙ্গে মেলামেশা আরম্ভ করে। ফলে নানা বাদ-বিতর্ক দোষারোপ ইত্যাদি করে ধর্মসভা বিভক্ত হয়ে যায়। ধর্মসভা তখন বেঁচে থাকতে চাইলে শুধু আচার-বিচার অনুশাসন ইত্যাদি দিয়ে। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে রামকমল সেন সভার হাস্যকর কলহ-বিবাদ দেখে প্রস্তাব করেছিলেন এসব বিবরণ প্রকাশ না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তিনি অন্য কর্মসূচী গ্রহণের প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাতে সম্মত হন নি। এই সব বাদ-বিতর্কের মধ্যে রাজা রাধাকান্ত দেবের নাম আর দেখি না। 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'য় ধর্মসভা সম্পর্কিত সংবাদগুলিতে রাধাকান্তের নাম উল্লিখিত হয় নি।

রাধাকান্তের ব্যক্তিত্ব ছিল উচ্চতর। সংকীর্ণ কলহ-বিবাদ এবং দলাদলিতে থেকে এই সব ক্ষুদ্র উদ্দেশ্য নিয়ে ধর্মকে রক্ষা করা যায় না। সতী আইন প্রতিরোধের ব্যর্থতায় তিনি নিরাশ হয়েছিলেন। ধর্ম কি সে সম্বন্ধে তাঁর জিজ্ঞাসার কথা আমরা জানি না। তাঁর বিশেষ চিন্তার বিষয় ছিল আমাদের সমাজ-শাসনে অন্যের হস্তক্ষেপ। তিনি হিন্দু কলেজের পরিচালনা সভা থেকে পদত্যাগ করেছিলেন— তারও মূল কারণ ছিল এটাই। হিন্দু কলেজে মুসলমান ছাত্র ভর্তি করতে দেওয়ায় তিনি দেখলেন হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার মৌলিক সর্তের লঙ্ঘন। তাঁর ধর্মনিরপেক্ষতার নীতির সঙ্গে এই আচরণ মেলে না বলেই মনে হয়। রাধাকান্ত দেব এই পরিবর্তনকে মেনে নিলেই ভালো হত— কিন্তু মনে হয় তাঁর আসল আপত্তি এই নিয়ে তত ছিল না। উইলসনকে লেখা চিঠিতে তিনি বলেছেন—

"On one occasion a serious difference arose between these two bodies on a subject involving the violation of certain fundamental rules of the' College which terminated in the retirement of Baboo Prosunnocumar Thakoor the Governor

of the College from his post. On a similar subject, after an interchange of many angry minutes between myself and the late President my feelings were so exasperated that I was obliged to dissolve my connection with the institution."[১৯]

সমাজনেতারূপে রাধাকান্ত দেবকে আর-একবার দেখি খ্রীষ্টীয় ধর্মান্তরণের বিরুদ্ধে। হিন্দু কলেজের শিক্ষক কৈলাসচন্দ্র বসু খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হলে হিন্দু সমাজে চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের আর-একটি ঘটনার কথা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন।[২০] সে বছর উমেশ-চন্দ্র সরকার তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে ডাফ সাহেবের কাছে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা নেয়। এই সংবাদে উত্তেজিত হয়ে দেবেন্দ্রনাথ অক্ষয়কুমার দত্তকে দিয়ে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখালেন। রাধাকান্ত দেব, রাজা সত্যচরণ ঘোষাল, রাম-গোপাল ঘোষ প্রভৃতি হিন্দু সমাজের নেতার সঙ্গে নব্যবঙ্গের নেতা একত্র মিলিত হয়ে ব্রাহ্ম নেতা দেবেন্দ্রনাথকে সাহায্য করলেন। দলাদলি দূর হল। স্থাপিত হল হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয়। রাধাকান্ত হলেন তার সভাপতি, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং হরিমোহন সেন হলেন তার সম্পাদক। রাধাকান্ত যে ধর্মসভাপন্থীদের ক্ষুদ্রতার উর্ধ্বে ছিলেন তাঁর ধর্মের ও সমাজের আদর্শ যে ভিন্নতর ছিল এটা তারই প্রমাণ। রাধাকান্ত দেবের কর্ম ও কীর্তি সেকালের সকলেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে। তাঁর উদ্দেশ্য সততা নিষ্ঠা সম্বন্ধে কারো সন্দেহ নেই, শুধু তিনি একটি ভুল করেছিলেন। যে-সমাজের অধিকার এবং শক্তির উপর তার অবিচল আস্থা ছিল সে-সমাজ এখন রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কারণে পরিবর্তিত। এখন আর পুরানো যুগের সমাজনেতারও কার্যকারিতা নেই। ধর্মকে রক্ষা করে সমাজকে যদি বাঁচাতে হয়, তবে বোধ হয় সর্বমত সহিষ্ণু দেশাচারের শাসনবর্জিত শিথিলগঠন মানবসমাজকেই অবলম্বন করতে হবে। উনবিংশ শতাব্দীর উত্তরার্ধে সে-সমাজের আভাস ফুটে উঠতে আরম্ভ করেছে।

ইতিহাস (নবপর্যায়, কার্তিক-পৌষ, ১৩৭৯)
ক্যালকাটা হিস্টরিক্যাল সোসাইটি-প্রকাশিত।

---

১৯ সাহিত্যসাধকচরিতে 'রাধাকান্ত দেব', পৃ ১৭।

২০ এ সম্পর্কে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী, ১৩ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

ইতিহাস-সাহিত্যিক রজনীকান্ত গুপ্ত

রজনীকান্ত গুপ্ত (১৮৪৯-১৯০০) ছিলেন বঙ্কিমযুগের লেখক। বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মের ছয় বছর পর তাঁর জন্ম, মৃত্যু হয়েছিল বঙ্কিমের মৃত্যুর পাঁচ বছর পর। বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হয়েছে ১৮৭২-এ। রজনীকান্ত তখন নবীন এবং তরুণ লেখক। তাঁর প্রথম বই জয়দেবচরিতের (১৮৭৩) সমালোচনা বঙ্গদর্শনে বেরিয়েছে।[১] রজনীকান্ত বঙ্কিম-সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে লেখেন নি। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে যখন তাঁর বিখ্যাত বই 'সিপাহিযুদ্ধের ইতিহাসে'র প্রথম ভাগ প্রকাশিত হল তখন তাঁর ক্ষমতা ও নৈপুণ্য স্বতঃপ্রমাণিত। বঙ্গদর্শন, নবজীবন, এডুকেশন গেজেট, বঙ্গবাসী প্রভৃতি পত্রিকায় রজনীকান্তের ঐতিহাসিক ও অন্যান্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে থাকে। নবস্থাপিত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকাতে রজনীকান্তের শেষ জীবনের কয়েকটি প্রবন্ধ বেরিয়েছিল। তার মধ্যে 'সাঁওতাল পরগণার ছড়া'[২] তাঁর বিভিন্নমুখী অনুসন্ধিৎসার দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখযোগ্য।

নবজীবনে রজনীকান্ত ধারাবাহিক কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন ভারতবর্ষে ইংরেজ অধিকার সম্বন্ধে। রজনীকান্ত তখন একজন সর্বজনস্বীকৃত প্রবন্ধকার। তার প্রমাণ পাই ম্যাক্সমুলারের হিবার্ট বক্তৃতা— 'ধর্মের উৎপত্তি ও উন্নতি'র অনুবাদ-কার্যে। বোম্বাইয়ের বেহরামজী মালাবারী (১৮৫৩-১৯১২)[৩] নিজে গুজরাটী ভাষায় এই বইয়ের অনুবাদ করেন। এ বইটায় তাঁর এত আগ্রহ জন্মেছিল যে ভারতের বিভিন্ন ভাষায় এর অনুবাদ করানোর জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি খুঁজছিলেন। ১৮৮২-র মার্চ মাসে তিনি কলকাতায় এসে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সঙ্গে দেখা করেন। খুব সম্ভবত রাজেন্দ্রলালই বাংলায় অনুবাদের জন্য রজনীকান্তের নাম প্রস্তাব করেন। রজনীকান্ত দু-বছরের মধ্যে এই বৃহৎ গ্রন্থটির অনুবাদ শেষ করেন। ১৮৮৪-তে

---

১ বঙ্গদর্শন, ১২৮০ কার্তিক।

২ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ পত্রিকা, ২য় বর্ষ, ১৩০২।

৩ বেহরামজী মালাবারী ছিলেন সমাজসংস্কারক ও সংবাদপত্রসেবী। জাতিভেদ বাল্যবিবাহ এবং বৈধব্যপালনের বিরুদ্ধে তিনি সংগ্রাম করেন। এজন্য তিনি বিলেতেও ভ্রমণ করেন। নারীজাতির উন্নতি বিধানে তাঁর অক্লান্ত প্রয়াস স্মরণীয়। দাদাভাই নওরজীর Voice of India পত্রিকার তিনি ছিলেন সম্পাদক। মালাবারী কবি ছিলেন।

এ বই মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। এই বইয়ের ছোট ইংরেজি বিজ্ঞাপনে মালাবারী লিখেছেন—

"I am much obliged to Babu Rajanikanta Gupta for his patience and diligence in the preparation of this Bengali translation. My best thanks are also due to Dr. Rajendralal Mitra for revision of proofs often in the midst of other engagements and even when indisposed."

'সিপাহিযুদ্ধের ইতিহাস' রজনীকান্তের সবচেয়ে বড়ো বই। পাঁচ খণ্ডে এটি বেরিয়েছিল। পঞ্চম ও সর্বশেষ খণ্ড সমাপ্ত করার পরেই তাঁর লোকান্তর ঘটে। ঐতিহাসিকের কাছে এ বইয়ের কী মূল্য পণ্ডিতেরাই তা বলতে পারবেন। সিপাহিযুদ্ধের বাইশ বৎসরের মধ্যেই বাংলা ভাষায় এই বিরাট তথ্যমূলক গ্রন্থরচনা হয়ে গিয়েছিল— এটা শুধু লেখকের অদম্য উৎসাহ ও নিষ্ঠার প্রমাণ নয়, বাংলা ভাষার শক্তি ও সামর্থ্যেরও প্রমাণ। এর ভূমিকায় তিনি বলেন—

"প্রসিদ্ধ পুস্তক রাজকীয় শাসনপত্র, লৌকিক বার্তা প্রভৃতি হইতে ইতিহাসের বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে। কোন কোন বৈদেশিকের হস্তে ভারতীয় ঐতিহাসিকচিত্র স্থলবিশেষে অতিরঞ্জিত বা অরঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। বর্তমান গ্রন্থে তাদৃশ বৈষম্য পরিহার করিতে যথাশক্তি যত্ন করিয়াছি। গ্রন্থে যে যে বিষয়ের প্রবর্তনা করা গিয়াছে তৎসমুদয় ন্যায় সত্য ও উদারতার সম্মান রক্ষা করিয়াই রচনা করা হইয়াছে।"

বাংলা ভাষায় ঐতিহাসিক গবেষণা হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্রের পূর্বেই এর রচনা আরম্ভ হয়। বিভিন্ন খণ্ডে ১৬১০ পৃষ্ঠার এই বইটি লেখকের একুশ বৎসরের অনির্বাপিত উৎসাহ ও প্রেরণার ফলে সম্পূর্ণ হয়। এই বই রচনার মূলে সে-যুগের বিশেষ ভাবের প্রবর্তনা ছিল। শুধু এই বইটি নয় রজনীকান্তের অন্যান্য প্রবন্ধসংকলনগুলিও এই বিশেষ ভাবপ্রবর্তনার ফল। অন্যান্য রচনাগুলি তেমন মৌলিক না হলেও বাংলা সাহিত্যে তাঁর উপস্থিতির একটা বিশেষ তাৎপর্য ও মূল্য আছে। সেদিক থেকে রজনীকান্ত আমাদের কাছে স্মরণীয় হয়েই থাকবেন।

ইতিহাস-চর্চায় তাঁর অনুরাগ কবে কেমন করে অঙ্কুরিত হয়েছিল বলা যায় না। স্কুল কলেজের পাঠ তিনি শারীরিক কারণে শেষ করতে পারেন নি। কিন্তু তিনি সংস্কৃতের চর্চা করেছিলেন তাঁর সংকলিত সংস্কৃত গ্রন্থ এণ্ট্রান্স

পরীক্ষায় পাঠ্য নির্বাচিত হয়েছিল। তাঁর প্রথম বই 'জয়দেব-চরিত' পড়লেও বোঝা যায় রজনীকান্ত তখনই সংস্কৃতে কতখানি ব্যুৎপন্ন হয়েছিলেন। ১৮৭৫-এ প্রকাশিত 'পাণিনি' থেকেও বোঝা যায় প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণাতেই তাঁর প্রবণতা। রাজেন্দ্রলালের সঙ্গে সম্ভবত এই সূত্রেই তাঁর পরিচয় হয়েছিল। কিন্তু পরে প্রত্নতত্ত্ব থেকে আধুনিক ইতিহাসে তিনি চলে এলেন। তাঁর প্রথম সাহিত্য-কর্মের সময়েই তিনি অসুস্থ, ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও হতাশ। এর উল্লেখ করেছেন বঙ্গদর্শনের সমালোচক—

"চরিতলেখক ভূমিকায় পাঠকের স্থানে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার মনোরথ পূর্ণ হইল না, অকালে কাল তাঁহারে গ্রাস করিতে আসিতেছে বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন। আমরা জানি গ্রন্থকার একজন অল্পবয়স্ক ছাত্র ও সুলেখক। তাঁহাকে আমরা এ বয়সে হারাইলে বিশেষ দুঃখিত হইতাম। পাঠককে বলিতেছি নূতন গ্রন্থকার অনেক আরোগ্য লাভ করিয়াছেন এবং আমরা ভরসা করি পাঠক তাঁহার দেখা মধ্যে মধ্যে প্রাপ্ত হইবেন।"

'জয়দেব-চরিত' লেখার একটু ইতিহাস আছে। হিন্দুমেলার কোনো এক সভায় রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর জয়দেবের একটি উৎকৃষ্ট জীবনচরিতের জন্য পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেন। সে-পুরস্কার রজনীকান্তই পান। রজনীকান্ত প্রথমে বইটি আলাদা ছাপেন নি। সঙ্গীতশাস্ত্রী ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী গীতগোবিন্দ গীতাবলির স্বরলিপির সঙ্গে এটি ছেপে দেন। কিন্তু ছাপবার সময়ে মূল বইয়ের কিছু পরিবর্তন করেন। ব্যাপারটা রজনীকান্তের মনঃপূত হয় নি। তিনি বইটি আলাদা প্রকাশ করেন। এ রচনায় যে অপরিণত গবেষণাবুদ্ধির পরিচয় ছিল বঙ্গদর্শনের সমালোচক তার উল্লেখ করেছিলেন।[৪] জয়দেবের রচনাগুণ সম্পর্কে তাঁর মতও আহৃত। বঙ্গদর্শনের ১২৭৯ আশ্বিন সংখ্যায় 'বাঙলা ভাষা' নামে যে দীর্ঘ ধারাবাহিক প্রবন্ধ বেরিয়েছিল রজনীকান্তের বক্তব্য সেখান থেকেই নেওয়া। রজনীকান্ত লিখেছেন —

"জয়দেবের রচনা সংস্কৃত ও বাঙলার মধ্যবর্তিনী। জয়দেব স্বীয় গীতিকাব্যে

---

৪ এই সকল প্রমাণ সংকলন ও প্রদর্শন করিয়াও নূতন গ্রন্থকার বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন ইহা সামান্য দুঃখের বিষয় নহে।...খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জয়দেবের আবির্ভাব অসম্ভাবিত নহে। এগুলি নিতান্ত অসার হেতুবাদ অনেকেই অনুমোদন করিবেন না। গ্রন্থের এই ভাগটী সর্বাপেক্ষা ভ্রমপরিপূর্ণ।

যে-সকল ছন্দের অবতারণা করিয়াছেন তাহা প্রাচীনকালীন কোনও সংস্কৃতগ্রন্থে দৃষ্ট হয় না। বোধহয় জয়দেব-প্রবর্তিতচ্ছন্দের অনুকরণই বাঙলা ভাষার ত্রিপদীর উৎপত্তি হইয়াছে। বস্তুতঃ গীতগোবিন্দগীতাবলির যেরূপ বঙ্গীয় কামিনীজনের কমনীয় কণ্ঠবিনিঃসৃত দ্রুতবিনোদন বাক্যে গ্রথিত হইয়াছে তাহাতে প্রতীয়মান হয় জয়দেবের সমকালে বাঙলা ভাষা একরূপ প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছিল। 'চল সখি কুঞ্জং' প্রভৃতি বাক্য এ বিষয়ের প্রধান দৃষ্টান্তস্থল। এই বাক্যের অন্তস্থিত অনুস্বারের লোপ করিলে উহা বাঙলা ভাষার সহিত অভেদ হইয়া যাইবে।"[৫]

'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধটিতেও এই অভিমতই এই ভাষাতেই ব্যক্ত হয়েছে।

বলা বাহুল্য তখনকার দিনে বঙ্গদর্শন ছিল একটি অতি উচ্চাঙ্গের পত্রিকা। বঙ্গদর্শনে রামদাস সেন, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, লালমোহন বিদ্যানিধি প্রভৃতির প্রাচীন সংস্কৃতি সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হত। রজনীকান্ত তাঁর নিজের স্বাভাবিক অনুসন্ধিৎসা ও বিদ্যাচর্চার প্রেরণায় বঙ্গদর্শনের অভিপ্রায় ও দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু আজ একথা সকলেই জানেন বঙ্গদর্শন শুধু উদ্দেশ্যহীন বিদ্যাচর্চা করে নি। এতে প্রকাশিত ইতিহাস ও সমাজতত্ত্ববিষয়ক প্রবন্ধগুলিতে একটি অভিপ্রায় প্রচ্ছন্ন থাকত— দেশ ও জাতিকে আত্মপ্রবুদ্ধ করা ও আত্মগঠনমূলক কর্মে নিযুক্ত করা। এর প্রাচীন আর্যজাতি সম্বন্ধে লেখাগুলি আমাদের জাতীয় আত্মমর্যাদাবোধ জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করেছিল আর আধুনিক ইতিহাস ও সমাজ সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ কর্তব্যপথ নির্ণয়ে সহায়তা করেছে।

রজনীকান্ত প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণাকর্মে বেশিদিন ব্যাপৃত থাকেন নি। 'জয়দেব-চরিত' রচনার পর গোল্ডষ্টুকরের 'পাণিনি' নিয়ে গবেষণার সমালোচনা করেছিলেন তিনি।[৬] কিন্তু তারপরে তিনি লক্ষ্য পরিবর্তন করলেন। 'সিপাহিযুদ্ধের ইতিহাস' লিখতে আরম্ভ করলেন, সেই সঙ্গে ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা এবং বৈশিষ্ট্য নিয়েও তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে লাগল। এ সময় থেকে তাঁর লেখাগুলির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ করি।

---

৫ জয়দেব-চরিত, ৩য় সং (১৩২৬), পৃ ২০-২১ থেকে উদ্‌ধৃত।

৬ বঙ্গদর্শনে ১২৭৯ আশ্বিনে পৃ ২৬৮ গোল্‌ডষ্টুকরের 'পাণিনি'র আলোচনা সম্বন্ধে প্রবন্ধ ইতিমধ্যেই বেরিয়েছিল। এ লেখাটি কার বলতে পারি না।

ভারত-ইতিহাসের বিভিন্ন যুগের অসাধারণ বীর ও ব্যক্তিদের নিয়ে তাঁর বহু প্রবন্ধ বিভিন্ন গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। তাঁর এ রকম বইয়ের সংখ্যা অন্তত পাঁচটি, প্রবন্ধকুসুম (১৮৮০), নবচরিত (১৮৮০), আর্যকীর্তি (পাঁচ খণ্ডে ১৮৮৩-১৮৮৫), বীরমহিমা (১৮৮৬), প্রতিভা (১৮৯৬)। এ ছাড়া ভ.মচরিত (১৮৯১) এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮৯৩) পুস্তিকা দুটিরও এই প্রসঙ্গে নাম করা যায়। এদের মধ্যে অশোক, নানক, দুর্গাবতী, মীরাবাঈ, হটী বিদ্যালংকার, জগন্নাথ তর্কালংকার, রামকমল সেন, ডেভিড হেয়ার এবং বহু ঐতিহাসিক ব্যক্তির কীর্তির সশ্রদ্ধ আলোচনা তিনি করেছেন। 'আর্যকীর্তি'র বিজ্ঞাপনে তিনি যা বলেছেন, সেটি তাঁর এই সময়ের মনোভাব যথার্থ প্রতিফলিত করেছে—

"বৈদেশিক সভ্যতার প্রভাবে আমাদের সমাজে অনেক বৈদেশিক ভাব ও বৈদেশিক রীতিনীতি প্রবিষ্ট হইয়াছে। পাঠশালার বালকেরা এখন বিদেশের কথা ও বিদেশী লোকের জীবনচরিত পড়িয়াই নীতি শিক্ষা করে। ইহাতে তাহাদের কোমল হৃদয়ে স্বদেশহিতৈষণী বা স্বজাতিপ্রেমের আবির্ভাব হয় না। বাল্যকাল হইতে বিদেশের কথা পড়িতে পড়িতে পাঠকের হৃদয় এমন বিকৃত হইয়া যায় যে স্বদেশের বিষয় একবারও তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করে না। আপনাদের দেশে যে অনেক মহৎ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের আত্মত্যাগ, তাঁহাদের পরোপকার, তাঁহাদের হিতৈষিতা যে চিরকাল জনগণকে উপদেশ দিতেছে ইহা তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় না। বিদেশীয় ভাব, বিদেশের কথা তাঁহাকে সর্বাংশে বৈদেশিক করিয়া তুলে। স্বদেশের দুঃখে স্বদেশের বেদনায় তাঁহার মনে দুঃখ বা বেদনার সঞ্চার হয় না। সমাজের এই শোচনীয় অবস্থার মধ্যে 'আর্যকীর্তি' প্রকাশিত হইল।"

রজনীকান্তের এই বইটি এককালে খুবই প্রসিদ্ধ ছিল। এর পাঁচটি খণ্ড একত্র মুদ্রিত হয়ে একখণ্ডে চতুর্থ সংস্করণ রূপে প্রকাশিত হয়। তখন থেকে একখণ্ডেই এটি প্রচলিত ছিল। এতে মোট ছিল একচল্লিশটি প্রবন্ধ। মধ্য-যুগের ইতিহাস থেকেই এর চরিত্রগুলি সংগৃহীত হয়েছে। শিখ মারাঠা এবং রাজপুতদের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে বর্ণাঢ্য ভাষায়। সিপাহিযুদ্ধের কয়েকজন বীর লক্ষ্মীবাঈ কুমারসিংহের উদ্দেশ্যেও তাঁর শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পিত হয়েছে; তেমনি হয়েছে দুর্গাবতী কুম্ভ প্রতাপসিংহ সীতারাম রায় রাজসিংহ সংযুক্তার উদ্দেশ্যে। এই বইয়ের কয়েকটি অধ্যায়ের নাম এই রকম: ভারতে ভারতীর অপূর্ব পূজা, বীরযুবকের দেশভক্তি, স্বাধীনতার প্রকৃত সম্মান, বীরবালার আত্মবিসর্জন,

মহারাষ্ট্রের মহাশক্তি, শিবাজীর মহানুভবতা ইত্যাদি। এই শিরোনামগুলি থেকেই দৃষ্টিভঙ্গি ও উদ্দেশ্য সুবোধ্য। রজনীকান্তের আর-একটি সুপ্রচলিত বই 'প্রতিভা'তে উনবিংশ শতাব্দীর কয়েকজন মনীষীর কীর্তিকথা বর্ণিত হয়েছে। এঁদের প্রায় সবাইকেই তিনি দেখেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতা ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অক্ষয়কুমার দত্ত এবং ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সম্ভবত তাঁর পরিচয় ছিল। মাইকেল মধুসূদনের মৃত্যু হয় ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁকেও সম্ভবত তিনি দেখে থাকবেন।[৭] উনবিংশ শতাব্দীর যাঁদের চরিত-কথা তিনি লিখেছেন তাঁরা নতুন যুগের পটভূমিতে নতুন ভাবে দেখা দিয়েছেন। রজনীকান্তের উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার্থীর শিক্ষাদর্শকে মহাপুরুষের আদর্শ দ্বারা পরিপূর্ণ করে তোলা।

রজনীকান্তের রচিত আর-এক শ্রেণীর গ্রন্থে তাঁর ঐতিহাসিক মানস আর-এক ভঙ্গিতে দেখা দিয়েছে। ভারত-কাহিনী (১৮৮৩) ভারত-প্রসঙ্গ (১৮৬৬) বই দুটির কয়েকটি প্রবন্ধে রজনীকান্ত ভারতবর্ষের ইতিহাসের ব্যাখ্যা করেছেন। এগুলিও বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধ, ধারাবাহিক ভারত-ইতিহাস নয়। কিন্তু ধর্ম ও সামাজিক সংঘাতের বিবরণ দিয়ে ভারত-ইতিহাসের মর্মটি ধরিয়ে দেবার চেষ্টা আছে। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা' ব্যাখ্যার সঙ্গে এর তুলনাই চলে না। তথাপি রজনীকান্ত ভারত-ইতিহাসের রাজরাজরার কাহিনীকে একান্ত গৌণ করে জীবনধারার দিকে পাঠকের দৃষ্টি ফিরিয়েছেন। এটা একটা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ সাহিত্যিক কীর্তি, তাতে সন্দেহ নেই। ভারত-কাহিনীর অধ্যায়গুলি লক্ষ করা যেতে পারে। —ভারতের ইতিহাস অধ্যয়ন, প্রাচীন আর্যজাতি, ভারতের আর্যজাতি, অশোক, ভারতে গ্রীক, ভারতের ভিন্ন ভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়, জগৎ শেঠ, বাঙ্গালী বীরত্ব, ভারতে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্য, হিউ এন্‌থ সাঙের ভারত ভ্রমণ, ভারতে মুদ্রণ-স্বাধীনতা। 'ভারত-প্রসঙ্গে'র বিষয় ব্রিটিশ অধিকারের ইতিহাস। এতে চারটি অধ্যায়— ভারতাক্রমণ, বঙ্গে

---

৭ মধুসূদন সম্বন্ধে রজনীকান্তের মনোভাব লক্ষণীয়—

"মধুসূদন পণ্ডিতোচিত ধীরতার অবমাননা করিয়াছিলেন। তিনি পিতৃদ্রোহী ও মাতৃদ্রোহী হইয়া পরধর্ম গ্রহণ পূর্বক জাতীয় ভাব বিসর্জন দিয়াছিলেন; জনকজননীর সেই বাৎসল্য, সেই স্নেহপ্রবণতা, সেই শোকাশ্রু মনে করিয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে তাঁহাদের পদপ্রান্তে দণ্ডায়মান হয়েন নাই বা তাঁহাদের হৃদয়গত জ্বালা দূর করিবার জন্য কোন কার্যের অনুষ্ঠান করেন নাই।" —প্রতিভা, ১৩০৩, পৃ ১২৭।

ইংরেজাধিকার, ভারতে ব্রিটিশাধিকার, ভারতে ইংরেজ রাজত্ব। দ্বিতীয় বইটির গুরুত্ব বস্তুত খুবই বেশি। এতে রজনীকান্তের নিজস্ব চিন্তাশক্তির পরিচয় আছে। ইতিহাসের ঘটনাগুলি প্রায় একশ বছরের পুরানো। বিশেষত সিপাহিযুদ্ধের পর ভারতবাসী তখনও কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভাব কাটিয়ে ওঠে নি। ইংরেজের প্রশস্তি এবং পরাধীনতার বেদনা দুইই তাদের মধ্যে প্রবল। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে প্রায় সকল চিন্তাশীল লেখকই তখন জাতিগঠনচিন্তায় পথ খুঁজছেন। আমাদের জাতিগত দোষত্রুটি সবই একে একে বিশ্লেষণ করে দেখতে আগ্রহী হয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনের বিভিন্ন প্রবন্ধে এই আত্মবিশ্লেষণের সূত্রপাত করেছিলেন, রজনীকান্তের লেখাগুলি তারই অনুবৃত্তি বললে অসঙ্গত হয় না। আমরা যথাস্থানে দেখব বঙ্কিমের বক্তব্য এবং রজনীকান্তের বক্তব্যে তেমন কিছু পার্থক্য নেই। এককথায় বলা যায় রজনীকান্তের এই লেখাগুলি ইতিহাস পর্যালোচনাচ্ছলে জাতীয় চেতনাকে সংহত করবার উদ্যম। 'ভারত-প্রসঙ্গে'র ভূমিকা ইঙ্গিতপূর্ণ—

"ইঙ্গরেজ এখন আমাদের রাজা। ইঙ্গরেজের রাজশক্তি এখন আমাদের দেশে বদ্ধমূল হইয়া অনেক বিষয়ে মঙ্গলসাধন করিতেছে। ইঙ্গরেজের পূর্বে ভারতবর্ষ কতবার আক্রান্ত হইয়াছে। ইঙ্গরেজ এই বিশাল রাজ্যে আসিয়া কিরূপে আপনাদের অধিকার স্থাপন করিয়াছেন, এস্থানের কি কি বিষয় তাঁহাদের অধিকার-স্থাপনের অনুকূল হইয়াছিল এবং ঐ অধিকার স্থাপনে ইঙ্গরেজের রাজশক্তি বা লোকশক্তি কতদূর সহায় হইয়াছিল তাহা আমাদের অবশ্য জ্ঞাতব্য এবং ইতিহাসের অবশ্য বর্ণনীয় বিষয়।"[৮]

এর ইঙ্গিতটি অস্পষ্ট নয়। ইতিহাস থেকে এই শিক্ষা নিয়ে আমাদের ভবিষ্যৎ জাতিগঠনে নিযুক্ত হতে হবে। আমাদের পরাধীনতার অবসানে এ শিক্ষা হবে অমূল্য। মনীষী রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী রজনীকান্তের সাহিত্যসেবার পরিমাপ করেছেন এই ভাবে—

"বাঙ্গালা সাহিত্যের জন্য রজনীকান্ত যে কার্য করিয়াছেন, তাহার মূলে একটা কথা পাওয়া যায়— স্বজাতির প্রতি তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ। এই অনুরাগই প্রথমতঃ তাঁহাকে পুরাতত্ত্ব আলোচনায় প্রবৃত্ত করিয়াছিল। এই অনুরাগই তাঁহাকে পরে ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাসের স্বাধীন সমালোচনায় প্রবৃত্ত করে।

৮ ভারত-প্রসঙ্গ, ১ম সং (১২৯৪) থেকে উদ্‌ধৃত।

রজনীকান্তের প্রদর্শিত পথে আজ কাল অনেকেই চলিতে আরম্ভ করিয়াছেন ;- কতিপয় কৃতবিদ্য লোকে স্বদেশের ইতিহাসের স্বাধীন সমালোচনা আরম্ভ করিয়াছেন।"[৯]

এই প্রেরণাতেই রজনীকান্ত আলবার্ট হলের সভায় পড়েছিলেন 'আমাদের জাতীয় ভাব' (১২৯৮)। প্রবন্ধটি ছোট কিন্তু রুচিতে শিক্ষায় চিন্তায় জাতীয় ভাব রক্ষা করার উদাত্ত আহ্বানে ভরপুর।

দুই

তখন দেশাত্মবোধ এবং জাতীয়তাবাদী মনোভাব গড়ে ওঠবার যুগ। হিন্দু মেলায়, বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনে, প্রাচীন ভারতের গৌরবচিন্তায় নানা ভাবে বাঙালির চিত্তে স্বজাতিপ্রীতির বীজ অঙ্কুরিত হচ্ছিল, তার ইতিহাস ছিল আরও চল্লিশ-পঞ্চাশ বছরের পুরনো। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তনের সঙ্গে এর যোগ। ইয়ং বেঙ্গলের বিদেশিয়ানার কথা রাজনারায়ণ বসু বিশদ ভাবেই উল্লেখ করেছেন। আবার সেই সঙ্গে দেশ জাতি ও সমাজকে চিনবার সাধনায় একটা সর্বব্যাপী কৌতূহলেরও সঞ্চার হয়েছে। ইতিহাস-অনুসন্ধান জাগ্রত মনেরই লক্ষণ। বিশ্বভুবনে নিজেকে চিনে নেবার প্রয়াসেই বাঙালির মন অতীতে এবং বর্তমানে সঞ্চরণ করে ফিরেছে। এই ভাবেই সে দেশকে ভালোবাসে, দেশের ভাষাকে, মানুষকে, ধর্ম-সংস্কৃতিকে, অতীত ঐতিহ্যকে। আমাদের এই জাগরণ ঘটেছে নতুন শিক্ষায়, নতুনতর মানবিক মূল্যবোধের দ্বারা। রামমোহন বিশুদ্ধ হিন্দুধর্মকে উপধর্মমুক্ত করে তুলে ধরতে চাইলেন, বাংলা ভাষায় বাঙালির নতুন সাহিত্য গড়ে উঠল, সামাজিক দুঃখ-দুর্দশা দূর করবার চেষ্টায় শিক্ষা এবং অন্যান্য সংস্কার-আন্দোলন শুরু হল। এভাবে আস্তে আস্তে একটা ইহমুখী দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠল।

বঙ্কিমের যুগে দৃষ্টিভঙ্গি সুস্পষ্টতা লাভ করল। রাজনারায়ণ বসু জাতীয় গৌরবেচ্ছাসঞ্চারিণী সভার প্রস্তাব করেছিলেন। তাঁর প্রস্তাব রূপ লাভ করল নবগোপাল মিত্রের হিন্দুমেলায়। 'একজাতীয়তা' 'দেশবাৎসল্য' 'স্বদেশ-প্রীতি' প্রভৃতি বিশেষ ভাবদ্যোতক শব্দগুলি বঙ্গদর্শনের যুগ থেকেই ব্যবহৃত হতে শুরু হয়। বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্তের চরিত রচনা প্রসঙ্গে বলেছেন আগে আমরা নিজের

৯ চরিতকথা, 'রজনীকান্ত গুপ্ত'

নিজের গোষ্ঠী ও সমাজকে মাত্র ভালোবাসতাম। রামমোহন এবং রামগোপাল ঘোষে দেশবাৎসল্যের স্থচনা। বঙ্কিমের মনীষায় দেশপ্রীতি একটা স্থনির্দিষ্ট concept বা চিন্তারূপ পেয়েছে। যা ছিল বিচ্ছিন্ন অস্পষ্ট এবার তাই সংহত ও আকারবান হয়ে উঠল। বঙ্কিমের উদ্যম নিয়োজিত হল এই আদর্শটির সংজ্ঞা ও বিশেষত্ব নির্দেশ করায়। বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যা থেকেই বঙ্কিমচন্দ্র এই কার্যে ব্যাপৃত হয়েছেন।

জাতীয়তাবোধ স্থষ্টির একটি প্রধান সহায়ক ছিল ইতিহাসচর্চা। বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা ও ভারতের ইতিহাসের গতি প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে আমাদের মধ্যে এই বোধকে প্রখর করে তুলতে চাইলেন। এক দিকে 'ভারত-কলঙ্ক' এবং 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা' প্রবন্ধদ্বয় আর-এক দিকে বাংলার ইতিহাস নিয়ে লেখা বহু প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের আত্মসমীক্ষণ করতে বলেছেন। ইতিহাস-বোধে প্রথম পাঠ আমরা বিদেশী ঐতিহাসিকের কাছ থেকেই গ্রহণ করেছি সত্য, কিন্তু তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি এই নববিজিত ভারতীয়দের সম্পর্কে সংস্কারমুক্ত ছিল না। ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার একটি প্রবন্ধে[১০] উনিশ শতকের তিন পর্যায়ে তিনজন ইংরেজ ঐতিহাসিকের দৃষ্টান্ত দিয়ে ভারতবর্ষ সম্পর্কে বিদেশী মনোভাব কি ছিল তার উদাহরণ দিয়েছেন। জেমস্ মিল[১১] প্রাচীন হিন্দুদের সভ্যতা যে কোনো দিক দিয়ে উন্নত ছিল এটা অস্বীকার করেছেন। মধ্যযুগের য়ুরোপীয়েরাও হিন্দুদের চেয়ে বহুগুণে উন্নত। তাঁর মতে মুসলমানদের অধীন হয়ে হিন্দুরা লাভবান হয়েছে। এল্ফিন্স্টোন[১২] বার বার হিন্দুদের বিদেশী আক্রমণে পরাজিত হওয়াই স্বাভাবিক মনে করেছেন। সত্যবাদিতার অভাবই হিন্দুদের স্বভাবের দোষ। ভিন্সেণ্ট স্মিথ[১৩] মনে করতেন হিন্দুরা স্বভাবতই দুর্বল, বিশৃঙ্খলতা এবং অরাজকতাই তাদের জাতীয় প্রকৃতি। ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনত্ব অস্বীকার কিংবা গ্রীকদের থেকে নানা ঋণ কিংবা ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থার নানা ত্রুটি বড় করে দেখানো ছিল বিদেশী ঐতিহাসিকদের সংস্কার এবং অভ্যাস। এই শিক্ষার প্রতিক্রিয়াতেই বঙ্কিমযুগে ইতিহাস পাঠের

---

১০ **Nationalist Historians,** ***Historians of India, Pakistan and Ceylon,*** **London 1961, Edited by C. H. Philips, pp 417-419.**

১১ *History of British India* 1818

১২ *The History of India* 1841.

১৩ *Early History of India* 1904.

নতুনতর পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় বহু স্থলে ইংরেজ ঐতিহাসিকের সমালোচনা আছে। ভারতবর্ষের ইতিহাস বিদেশী দৃষ্টিতে না দেখে স্বাধীন দৃষ্টিতে দেখতে হবে— এটাই বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ অভিপ্রায়। এটি অধিকতর তীব্রতার সঙ্গে তিনি বলেছেন বাংলার ইতিহাস প্রসঙ্গে। আমরা জানি মার্শম্যান ষ্টুয়ার্ট লেথব্রিজ কারো বই-ই তাঁকে তৃপ্ত করতে পারে নি। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'প্রথম শিক্ষা বাংলার ইতিহাস' (১৮৭৪) বইতেই সত্যকার বাংলার ইতিহাসকে তিনি পেয়েছিলেন।

এই পটভূমিতে রজনীকান্তের ইতিহাস-উদ্যমের অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্র যেমন বঙ্গদর্শনের পাতায় ইতিহাসমূলক প্রবন্ধ রচনা করে ঘরে ঘরে একটা নতুন ইতিহাসদৃষ্টি খুলে দিতে চেয়েছেন, রজনীকান্তও তেমনি পত্র-পত্রিকায় বিক্ষিপ্ত প্রবন্ধ রচনা করে এবং পরে ছোটো ছোটো বইয়ে তাদের সংকলন করে সাধারণ বাঙালির জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিক দৃষ্টির উন্মেষ ঘটাতে চেয়েছেন। রজনীকান্তের বইগুলিকে আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে ইস্কুল-পাঠ্য মাত্র। কিন্তু লক্ষ করলে দেখা যাবে এরই মধ্যে তিনি সঞ্চারিত করেছেন স্বাধীন জাতীয়তাবাদী মনোভাব। যেমন, তিনি বলেছেন 'স্বদেশের ইতিহাস না পড়িলে তিনি স্বদেশের বেদনার প্রকৃত কারণ অনুভব করিতে পারিবেন না'। দ্বিতীয়ত 'মনোযোগের সহিত স্বদেশের ইতিহাস না পড়িলে ব্রিটিশ রাজনীতির কৌশল অবগত হইবার সম্ভাবনা নাই'; এবং তৃতীয়ত 'ইতিহাস পড়া উচিত বটে, কিন্তু যে ইতিহাস বৈদেশিক লোকের হাতে পড়িয়া বিকৃত হইয়াছে তাহার অনুশীলন কর্তব্য নহে'।[১৪] সর্ব শেষেরটির দৃষ্টান্ত হিসাবে তিনি সিরাজদ্দৌল্লার ঘটনা আলোচনা করেছেন বিস্তৃত ভাবেই। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দৃষ্টান্ত দিয়েছেন শিখযুদ্ধের এবং অযোধ্যাধিকারের। এই মনোভাবটি উনিশ শতকের শেষে আমাদের দেশে ব্যাপকতা লাভ করে। রমেশচন্দ্র দত্ত, সখারাম গণেশ দেউস্কর, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রভৃতি ঐতিহাসিকদের আবির্ভাব ঘটল যাঁরা বিদেশীরচিত ইতিহাসকে বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করতে পারেন নি। বিদেশীর ইতিবৃত্ত যাকে দস্যু বলে উপহাস করেছিল সেই শিবাজির সম্পর্কে বিদেশীর মিথ্যাময় মুখর ভাষণকে রবীন্দ্রনাথ ধিক্কৃত করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন—

"বিদেশী-লিখিত ভারতবর্ষের ইতিহাসকে বিনা প্রশ্নে, বিনা বিচারে গ্রহণ ও মুখস্থ করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ফার্ষ্ট প্রাইজ পাওয়া আমাদের গৌরবের

---

১৪ ভারত-কাহিনী, 'ভারতের ইতিহাস'— অধ্যায়।

বিষয় হইতেছে না। কোন ইতিহাসই কোনো কালে প্রশ্ন ও বিচারের অতীত হইতে পারে না। য়ুরোপীয় ইতিহাসেও ভূরি ভূরি চিরপ্রচলিত দৃঢ়নিবদ্ধ বিশ্বাস নব নব সমালোচনার দ্বারা তিরস্কৃত হইতেছে। আমাদের দেশীয় ইতিহাস হইতে মিথ্যা বাছিতে গেলে তাহার উজাড় হইবার সম্ভাবনা আশঙ্কা করি।"[১৫]

রজনীকান্তের রচনাগুলির পশ্চাৎপটেও ছিল এই মনোভাব এবং এর সূত্রপাত হয় বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠায়।[১৬] বিদেশীর ইতিহাস পড়ে আমরা দেশের মহৎ ব্যক্তিদের যথার্থ মহত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারি না, তেমনি দেশের জনজীবনের পরিচয়ও পাই না, দেশের ইতিহাসের সত্যকার গতিপ্রকৃতিও বুঝতে পারি না। রজনীকান্ত আর্যকীর্তির প্রবন্ধগুলিতে ভারত-ইতিহাসের আত্মত্যাগ, শৌর্য, পরাক্রম, জ্বলন্ত নিষ্ঠা, রাজ্যগঠনব্রত প্রভৃতির বহু দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করলেন। এদের কথা এমন উৎসাহ-প্রদীপ্ত কণ্ঠে বিদেশী ঐতিহাসিকেরা কেউ বলেন নি। রজনীকান্তের সামনে ছিল সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মরণীয় নেতৃত্ব এবং তাঁর জ্বালাময়ী বক্তৃতা। শিখজাতির অভ্যুত্থান সম্পর্কে ছাত্রসভায় প্রদত্ত সুরেন্দ্রনাথের বিখ্যাত বক্তৃতা যে রজনীকান্তকে উদ্দীপিত করেছিল, এটা অনুমান নয়, সত্য। সুরেন্দ্রনাথের 'ভারতের ইতিহাস অধ্যয়ন' বক্তৃতা শুনেই তিনি ওই নামে প্রবন্ধ-পুস্তিকা লেখেন। রজনীকান্তের 'সিপাহিযুদ্ধের ইতিহাস' রচনার মূলে এই ভাবের আন্দোলন। বিদেশীরচিত বিকৃত ব্যাখ্যাকে প্রতিহত করবার উদ্দেশ্যেই রজনীকান্তের ইতিহাসচর্চা। শিখরা যেমন আপন স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সংগ্রাম করেছিল, সিপাহিযুদ্ধের নায়করাও তেমনি করেই স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রাণত্যাগ করেছিল।

ভারত-কাহিনীতে রজনীকান্ত কয়েকটি মাত্র অধ্যায় লিখেছেন প্রাচীন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে। ভারতে আর্যজাতি প্রবন্ধে তিনি দেখিয়েছেন আর্যদের মধ্যে ধর্মভাব, সামাজিক ও নৈতিক চেতনা, কৃষিসভ্যতার বিকাশ, তাদের সাহিত্য।

---

১৫ ভারতী, বৈশাখ ১৩০৫, রবীন্দ্রনাথের 'ইতিহাস' গ্রন্থে সংকলিত, পৃ ১১৮-১৯।

১৬ 'বঙ্গদর্শনের প্রথম অভ্যুদয়ে বাংলাদেশের মধ্যে একটি অভূতপূর্ব আনন্দ ও আশার সঞ্চার হইয়াছিল। একটি সুদূরব্যাপী চাঞ্চল্যে বাংলার পাঠক-হৃদয় যেন কল্লোলিত হইয়া উঠিয়াছিল। সে আনন্দ স্বাধীন চেষ্টার আনন্দ।...আমরা সেদিন ইস্কুল হইতে, বিদেশী মাষ্টারের শাসন হইতে, ছুটি পাইয়া ঘরের দিকে ফিরিয়াছিলাম।'— 'ঐতিহাসিক চিত্র', ইতিহাস, পৃ ১৪৩।

অন্য ছুটি প্রবন্ধে তিনি প্রাচীন ভারতের হিন্দু বৌদ্ধ ও অন্যান্য ধর্মের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেন। তিনি বলেন 'ভারতবর্ষে প্রথমে শাক্যসিংহই সাম্যের মহিমা ঘোষণা করেন।' আর-একটি প্রবন্ধে হিউ এন্‌থ সাঙের ভারতভ্রমণের বিবরণ দিতে গিয়ে সেকালের ভারতবর্ষের একটি জীবনচিত্র দিয়েছেন। উপসংহারে তিনি লিখলেন—

"যদি ভারতবর্ষ যবনের পর ইংরেজের পদানত না হইত, যদি বৈদেশিক সভ্যতাস্রোত ভারতের এক প্রান্ত হইতে আর-এক প্রান্তে গতি প্রসারিত না করিত, ভারতের সন্তানগণ যদি আপনাদের জাতীয় ভাব হইতে বিচ্যুত না হইত তাহা হইলে বোধহয় আজও ভারতবর্ষে সেই প্রাচীন আর্যকীর্তির অপূর্ব আড়ম্বর দেখা যাইত।"

প্রাচীন ভারত থেকে আধুনিক ভারত— এর মধ্যে ইতিহাসের পথ কখনও সরল, কখনও বিধাতার পরিহাসে কুটিল। রজনীকান্ত আধুনিক ও ভবিষ্যৎ ভারতের কথাই বিশেষভাবে ভেবেছেন। তবে সে ভাবনায় ছিল ইতিহাসের শিক্ষা। 'ভারত-প্রসঙ্গ' বইখানা সবটাই ব্রিটিশ যুগের ভারতবর্ষ— বিশেষত ভারতে ব্রিটিশ অধিকারের জটিল ইতিহাস। প্রথম প্রবন্ধে তিনি সমগ্র ভারত-ইতিহাসের একটা দ্রুত সারসংকলন করেছেন দশটি বহিরাগত আক্রমণের বিবরণ লিপিবদ্ধ করে— আর্যদের প্রবেশ, দরায়ুস সেকেন্দার, বলক, ('অরুণদযবনঃ সাকেতম্‌ অরুণদযবনো মাধ্যমিকান্‌'— পাণিনি) সুলতান মামুদ, ঘোরী, তৈমুরলঙ, বাবর, নাদিরশা, আহমদশা দোররাণীর আক্রমণ। সবশেষে য়ুরোপীয় বণিকদের মানদণ্ডের রাজদণ্ডে পরিণত হওয়ার ইতিহাস বিভিন্ন অধ্যায়ে। লেখকের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভারতের ইতিহাসে এই আক্রমণগুলির ফল নিরূপণ করা। হিন্দু ও মুসলমান যুগের সম্পর্কে লেখকের মন্তব্য—

"হিন্দু আর্যগণের ভারতাক্রমণে ভারতবর্ষের অনেক উপকার হইয়াছে। সমাজনীতি রাজনীতি ধর্মনীতি প্রভৃতিতে যে ভারতবর্ষ সমগ্র জগতের নিকটে শ্রদ্ধা ও প্রীতির পূজা পাইতেছে তাহার মূল এই আক্রমণ। রাজনৈতিক বিষয়ে বাবরের আক্রমণেও ভারতবর্ষের কিয়দংশে উপকার হইয়াছে। যেহেতু ইহাতে জেতৃবিজেতৃ সম্বন্ধ অনেকাংশে শিথিল হয়। আকবরের রাজত্বে এই সম্বন্ধ প্রায় উঠিয়া যায়। বিজিত হিন্দু বিজেতা মোগলের সমকক্ষ হইয়া সৈন্য-পরিচালনা রাজ্যশাসন ও গুরুতর রাজনৈতিক বিষয়ে মন্ত্রণাদান করিতে থাকেন।"[১৭]

১৭ ভারত-প্রসঙ্গ, পৃ ৮।

অন্যত্র বলছেন—

"সুলতান মহমুদ বা মহম্মদ ঘোরী প্রভৃতির সহিত ইঙ্গরেজকে এক শ্রেণীতে নিবেশিত করা যায় না। ইঙ্গরেজ বাণিজ্যের জন্য এদেশে আসিয়া প্রধানতঃ এতদ্দেশীয়দিগের সাহায্যে এ দেশের শাসনদণ্ড অধিকার করিয়াছেন। সময় ও অবস্থা উভয়ই ইঙ্গরেজের অনুকূল হইয়াছিল। অনুকূলতায় ইঙ্গরেজের অদৃষ্ট প্রসন্ন হয়। ইঙ্গরেজ ভারতের আক্রমণকারী না হইলেও ভারতে আপনাদের সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাকর্তা। আয়তনে পরিমাণে ইঙ্গরেজের ভারতসাম্রাজ্য আকবরের প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যকেও অধঃকৃত করিয়াছে।"[১৮]

রজনীকান্ত মোগল শাসন সম্বন্ধে বিশেষ কোথাও কিছু বলেন নি। বঙ্কিমচন্দ্র 'ভারত-কলঙ্ক' প্রবন্ধে বারবার বিদেশী আক্রমণের এবং ভারতীয়দের পরাজয় স্বীকারের কারণ স্বাধীন ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। এই কারণ রজনীকান্তও প্রসঙ্গান্তরে বুঝিয়েছেন। বঙ্কিম 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা' প্রবন্ধে আকবর সম্বন্ধে যে প্রশংসাসূচক উক্তি করে তখনকার ভারতবর্ষকে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র আখ্যা দিয়েছিলেন, রজনীকান্তর অভিমতও মূলত তাই। বঙ্কিমের মতোই রজনীকান্ত বহিরাক্রমণের তাৎপর্য নির্ণয় করে একই সিদ্ধান্ত করেছেন। বঙ্কিম বলেছিলেন, ভারতবর্ষ যে বিজিত হয়েছে তার কারণ বলের অভাব নয়। তার কারণ তিনটি—ইতিবৃত্তের অভাব, হিন্দুর পররাজ্যলোভশূন্যতা এবং স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাহীনতা। 'ভারতে ব্রিটিশাধিকার' প্রবন্ধে রজনীকান্ত বারবারই ভারতবর্ষে স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা ও জাতিপ্রতিষ্ঠার অভাবের উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন—

"পৃথ্বীরাজের পরে আর কোন ভারতীয় বীর তাহাদিগকে দেশ হইতে নিষ্কাশিত করিবার চেষ্টা করেন নাই। এই নিশ্চেষ্টতার কারণ স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তায় অনাস্থা বা জাতীয় জীবনের অবনতি। ধর্মবিপ্লবে হিন্দুদিগের হৃদয়ে ক্রমে বৈরাগ্যের সঞ্চার হইয়াছিল। তাঁহারা পার্থিব বিষয় পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে চিন্তাশীল হইয়া উঠিয়াছিলেন। চিন্তাশীলতা প্রযুক্তক্রমে তাঁহাদের বাহ্যসুখে অনাস্থা জন্মে। এই অনাস্থা হইতেই নিশ্চেষ্টতা ও ঔদাসীন্যের সূত্রপাত হয়।"[১৯]

---

১৮ ভারত-প্রসঙ্গ, পৃ ১৩।

১৯ ভারত-প্রসঙ্গ, পৃ ১৮১। প্রবন্ধটি 'নবজীবন' পৌষ ১২৯১-এ প্রথম প্রকাশিত।

বঙ্কিমচন্দ্রের মতো রজনীকান্তও মনে করেন এর ব্যতিক্রম মেবার, মারাঠা এবং শিখ। এই তিন জাতি কিংবা ভারতের অন্যান্য জাতিরা একত্র মিলিত হয়ে একজাতি গঠন করতে পারল না। এটা ভারত ইতিহাসের দুর্ভাগ্য। এই বহুধা বিভাগের জন্য ভারতীয়রা বিদেশী আক্রমণকে বাধা দিতে সফল হয় নি। আধুনিক ভারতবর্ষ যে একজাতি হয়ে উঠেছে, সেটা ইংরেজ শাসনেরই জন্য। পাঠান মোগলেরা দীর্ঘকাল যা করতে পারে নি ইঙ্গরেজরা একশ বছরেই তাই করল।[২০] সিপাহিযুদ্ধের সময়ে যারা ইংরেজের পক্ষে যুদ্ধ করেছিল, রজনীকান্ত তাদের দেশদ্রোহী বলতে সম্মত নন। কারণ "ভারতবর্ষ তখন সর্বাংশে ভারতবর্ষীয়দিগের ছিল না। মুসলমানেরা ভারতবর্ষের চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। ভারতবর্ষের এক-একটি সামান্য ভূখণ্ডে চারি পাঁচ জাতির চারি পাঁচ ভাষার লোক, পরস্পর পরস্পরকে ঘৃণা ও বিদ্বেষের চক্ষে চাহিয়া দেখিতেছিল।" রজনীকান্ত আক্ষেপ করে বলছেন, ও সময়ে যদি দ্বিতীয় শিবাজী বা দ্বিতীয় প্রতাপ সিংহের আবির্ভাব হত তবে ভারতের ইতিহাস হত অন্যরকম। ইতিহাসে মহারাজ রণজিৎ সিংহের আবির্ভাব হল দেরিতে কোম্পানীর আমলে। রজনীকান্ত এখানে আমাদের ইতিহাসের এক গুরুতর দিকের ইঙ্গিত দিচ্ছেন। বঙ্কিমচন্দ্র একজাতি এবং স্বদেশপ্রাণতার যে-বাণী রচনা করেছিলেন বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের যুগ পর্যন্ত সে-চিন্তা বাঙালী মনীষীদের অধিকার করে রেখেছিল। 'নেশন' কাকে বলে, ভারতীয়দের মধ্যে সে-লক্ষণ কতখানি আছে এসব আলোচনা রামেন্দ্রসুন্দর রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মবান্ধব প্রভৃতি মনীষীরা প্রায়শঃই করেছেন। রজনীকান্ত ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিকায় তার বাস্তবতা প্রমাণে নিরত ছিলেন। রবার্ট সীলির Expansion of England বইটির সাহায্য নিয়ে তিনি ইংরেজ রাজত্বের ভারতবর্ষীয় প্রকৃতি আলোচনা করেছেন। ইতিহাসের দৃঢ় যুক্তি ও তথ্যের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে রজনীকান্ত আমাদের জন্য এক মহৎ

---

২০ ভারত-প্রসঙ্গ, পৃ ১৮৭। অন্যত্রও তিনি বলেছেন—

'এক রাজার অধীন ও এক রাজকীয় বিধিতে পরিচালিত হওয়াতে, সকলেই একবিধ স্বার্থে দৃঢ়সম্বদ্ধ হইয়া উঠিবে। বাঙ্গালী জাতীয় আচার-ব্যবহার, জাতীয় রীতিনীতির মর্যাদা রক্ষা করুন, হিন্দুস্থানী প্রভৃতি জাতীয় ভাবে পরিচালিত হউন। শেষে সকলে একবিধ স্বার্থে— একবিধ স্বদেশপ্রীতিতে সম্বদ্ধ হইয়া স্বদেশের মুহ্যমান হৃদয়ে তাড়িতবেগ সঞ্চারিত করুন, এবং স্বদেশের শিল্পবিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন পূর্বক পরমুখপ্রেক্ষিতারূপ অপার কলঙ্ক মোচনে বদ্ধপরিকর হউন।'—আমাদের জাতীয় ভাব, ১২৯৮, পৃ ৩২।

আশ্বাসও রচনা করেছিলেন। —এত বড় এই দেশ কোন্ মন্ত্রবলে ইংরেজের অধীন হল? একি কোনো ঐশ্বরিক শক্তি? তাঁর গূঢ় ইঙ্গিত এই যে কোনো অলৌকিকতা নয়। ঘটনার গতি নিয়ন্ত্রণের উপায় আমাদেরই হাতে। আমরা যদি জাতীয় ভাবে একতাবদ্ধ হয়ে উঠতে পারি তবে এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে না। একদিন বিদেশী ইংরেজকেও দূর করতে পারব।

একটি বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে রজনাকান্তের কিছু পার্থক্য আছে। বঙ্কিমচন্দ্র ভারতবর্ষ এবং আর্যকীর্তি নিয়ে নানা প্রসঙ্গে চিন্তা ও মন্তব্য করলেও তিনি যেন বাঙালির ইতিহাস নিয়েই বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। এর কারণ আলোচনা এখানে অবান্তর হবে। রজনীকান্ত 'ভারত-প্রসঙ্গ' বইতে 'বঙ্গে ইঙ্গরেজাধিকার'[২১] নিয়ে একশ সাতান্ন পৃষ্ঠার দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখলেও বাংলার প্রাচীন ইতিহাস নিয়ে আলোচনায় ব্যাপৃত হন নি। অবশ্য বাঙালি বীরদের কারো কারো কথা আর্যকাতিতে লিখেছিলেন। 'বাঙালীর বীরত্ব' নামে একটি অধ্যায় আছে ভারত-কাহিনীতে। এতে বাংলার ইতিহাসের বীরত্বপূর্ণ কীর্তির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে। তখন শিক্ষালয়ে বাংলার ইতিহাস পড়বার রীতি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বইয়ের চৌত্রিশটি সংস্করণ হয়েছে প্রথম প্রকাশের চোদ্দ বছরের মধ্যে। আরও অনেকের বাংলার ইতিহাস বেরিয়েছে।[২২] রজনীকান্তও একটি বাংলার ইতিহাস লিখেছেন।[২৩] বইটি আমার দেখবার সুযোগ হয় নি। এর থেকে অবশ্য রজনীকান্তের বঙ্গপ্রীতি বা ভারতপ্রীতির আপেক্ষিক গুরুত্ব নিয়ে কোনো সিদ্ধান্ত করা চলে না।

তিন

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী রজনীকান্তের গদ্যরচনার বিশেষ প্রশংসা করেছিলেন। ভাষার বিশুদ্ধিরক্ষায় রজনীকান্তের সতর্কতা আজও আমাদের অনুকরণযোগ্য।

---

২১ এই প্রবন্ধের আরম্ভ 'নবজীবনে' বৈশাখ, ১২৯২।

২২ এসব বইয়ের বিবরণ দ্রষ্টব্য প্রবোধচন্দ্র সেন, 'বাংলার ইতিহাস-সাধনা' ১৩৬০।

২৩ সাহিত্যসাধক-চরিতমালার অন্তর্গত 'রজনীকান্ত গুপ্ত' বইতে এর প্রকাশকাল দেওয়া আছে যে ১৮৯৯। অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেনের 'বাংলার ইতিহাস-সাধনা' বইতেও (পৃ ৪৬-৪৭) এই বৎসর। প্রবোধচন্দ্র লিখেছেন, তাঁর কাছে এর দ্বিতীয় সংস্করণ (১৯২০) আছে। কিন্তু বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থতালিকায় রজনীকান্তের বাঙ্গালার ইতিহাসের প্রকাশ-বৎসর দেওয়া আছে ১৯০৬। এটি কোন্ সংস্করণ? আবার জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থপঞ্জীতে একটি **History of Bengal for Standard III & IV** আছে; সেটি প্রকাশিত হয়েছে ১৯০২ সালে।

যিনি ইতিহাস নিয়ে লিখেছেন তাঁর গদ্যের এমন কি বিশেষত্ব থাকতে পারে যে তাঁর গদ্য আলাদা পর্যালোচনার বিষয় হতে পারে? ইতিহাস তো নেহাৎই তথ্য-সমাহার মাত্র। তবে এতে গভীরতা যুক্ত হয় তখনই যখন লেখক তার বিশেষ অর্থ তাৎপর্য ও সুদূর সঙ্কেতগুলি বুঝিয়ে দিতে চান। এই গভীরতার ফলে বিশেষণ-প্রয়োগের নৈপুণ্য অন্বর্থ শব্দব্যবহার ক্রিয়াপদপ্রয়োগের বৈচিত্র্য ও চিত্রবৎ ভাষা আসে। তখন গদ্য তথ্যমূলক হয়েও বিশেষত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। গীবনের ইতিহাসের ভাষা চিরকালের সাহিত্যগুণান্বিত।

ভালো গদ্য বলতে আমরা কি প্রত্যাশা করি? বস্তুত এর কোনো একটা মানদণ্ড নেই। রামেন্দ্রসুন্দরের চরিতকথায় পাশাপাশি দুটি প্রবন্ধ আছে—রজনীকান্ত গুপ্ত এবং বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর। দুয়েরই গদ্যের তিনি প্রশংসা করেছেন। অথচ দুজনেরই গদ্য এক রকমের নয়। প্রিরাফায়লাইটরা যাকে 'পার্পল প্রোজ' বলতেন বলেন্দ্রনাথের গদ্য হচ্ছে তাই। এতে চিত্রগুণ এবং সঙ্গীতগুণ দুয়েরই সমাহার। এর শব্দপ্রয়োগে ধ্বনিসঙ্গীত, উপমায় উৎপ্রেক্ষায় চিত্রধর্ম। এ গদ্য অনুভূতিময়। তথ্য গৌণ। বিষয় ভাবমূলক। রজনীকান্তের গদ্যে এ সব গুণের প্রত্যাশাই করা উচিত নয়, ইতিহাসের লেখায় তা থাকে না। তথাপি রজনীকান্তের লেখায় আর-একটি গুণ আছে যাকে বলা যায় অষ্টাদশ শতকীয় ঋজুতার গুণ। অর্থের মধ্যে সংশয়-লক্ষণ না থাকা, কোনো অস্পষ্টতা, বা সাহিত্যিক অলংকার না থাকাই এর বৈশিষ্ট্য। প্রশ্ন এই যে, এর সাহিত্যিক মূল্য কি? বিজ্ঞানের তত্ত্ব কিংবা সংবাদপত্রের সংবাদও তো খুব সাদাসিধে এবং স্পষ্ট। এর মধ্যে একটা কথা মনে রাখতে হবে। ইতিহাস হচ্ছে মানবিক বিষয়। এর ঘটনাপুঞ্জে মানুষের ইচ্ছা ও মনস্তত্ত্ব কাজ করছে। রজনীকান্ত যখন বঙ্গে ইংরেজাধিকারের ইতিহাস লেখেন তখন পক্ষ-প্রতিপক্ষের আচরণের বর্ণনায় ভাষার ঋজুতার সঙ্গে লেখকের বক্তব্যের জোর এবং ইঙ্গিত ফুটে ওঠে। যেমন—

"পক্ষান্তরে মীরকাসেম সিরাজের ন্যায় তরুণবয়স্ক বা অবিবেচক ছিলেন না। বয়সে তিনি প্রবীণ, শিক্ষায় তিনি ধীরপ্রকৃতি এবং সদ্বিবেচনায় তিনি সূক্ষ্মদর্শী ছিলেন। প্রকৃতিবর্গের মঙ্গলবিধানে তাঁহার যত্ন ছিল। ক্রোধের উদ্দীপনায় তিনি দুই-এক সময়ে অবিবেচনার পরিচয় দিয়াছিলেন বটে কিন্তু অনেক সময়ে তিনি ক্রোধসংযমে অভ্যস্ত ছিলেন। তাঁহার প্রভূত সাহস ও বীরত্ব না থাকিলেও আপনার সংকল্প কার্যে পরিণত করিতে তেজস্বিতা ছিল। এই দূরদর্শী প্রবীণ

পুরুষও কখনও ইংরেজের বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই। তথাপি ইংরেজ তাঁহাকে সর্বস্বান্ত করিলেন।”

এই গদ্যাংশের বিশেষণগুলি বক্তব্যের দিক থেকে অত্যন্ত যথাযথ অথচ ইঙ্গিতপূর্ণ। তরুণবয়স্ক, ধীরপ্রকৃতি, সদ্বিবেচনায় সূক্ষ্মদর্শী প্রভৃতি শব্দগুলি লক্ষণীয়। বক্তব্যকে সংহত ও পরিমিত করবার গুণটিও কম নয়: “ক্রোধের উদ্দীপনায়…” বা “কার্যে পরিণত…”। রজনীকান্তের রচনা ভাবমূলক নয় দেখাই যাচ্ছে; অথচ এই রচনার সতর্ক অর্থসমন্বিত শব্দনির্বাচন এবং বাক্যগঠনের পরিমিতি (balance) অসাধারণ। পড়বার সময়ে সহজেই একে পরিমিত খণ্ডে বিভক্ত করে নেওয়া যায়। যেমন—

বয়সে তিনি প্রবীণ/শিক্ষায় তিনি ধীরপ্রকৃতি/এবং সদ্বিবেচনায় তিনি সূক্ষ্মদর্শী/ছিলেন।

এই ভাষার কাঠামোর কিছুমাত্র পরিবর্তন না করে গুণগুলিকে অবিকৃত রেখে একে আরও অর্থগভীর করে তোলা যায় যখন লেখকের নিজের মনের প্রতিক্রিয়া এর সঙ্গে যুক্ত হয়।

“এইরূপে রণজিৎ মহিষী ঝিন্দনের নির্বাসন-ব্যাপার শেষ হইল। পঞ্জাব অবাতবিক্ষোভিত জলধির ন্যায় ধীরভাবে স্বীয় অধিষ্ঠাত্রী-দেবীর এই শোচনীয় নির্বাসন চাহিয়া দেখিল, একটি মাত্রও বারিবিন্দু তাহার নেত্র বিগলিত হইয়া দেহ অভিষিক্ত করিল না, যে বহ্নি ধীরে ধীরে শরীর দগ্ধ করিতেছিল, এসময়ে তাহার একটি স্ফুলিঙ্গও উত্থিত হইয়া অনলক্রীড়া প্রদর্শন করিল না, পঞ্জাব যোগনিদ্রাভিভূত বিরাট পুরুষের ন্যায় জাড্যদোষে আচ্ছন্ন হইয়া রহিল। কিন্তু এই জড়ত্ব প্রকৃত জড়ত্বের লক্ষণাক্রান্ত নহে, এই নির্জীবত্ব প্রকৃত নির্জীবত্বের পরিচায়ক নহে। ইহা গভীর ক্রোধ, গভীর আশঙ্কার গভীর নিস্তব্ধতা। দিলীপ সিংহ সুখময় বাল্যলীলাতরঙ্গে দোলায়মান হইতেছিলেন, জননীর এই দশা বিপর্যয় তাঁহার কোমল অন্তঃকরণ ক্ষুব্ধ করিতে পারিল না।”[২৪]

লেখক এখানে কয়েকটি সাধু উপমা ব্যবহার করেছেন। ঝিন্দনের নির্বাসনে পাঞ্জাব নির্জীব হয়ে পড়ে রইল—ঐতিহাসিক তথ্য এইটুকু। এর সঙ্গে লেখকের মানসিক প্রতিক্রিয়া যুক্ত হওয়ায় কয়েকটি উপমান দিয়ে মূল নেগেটিভ বক্তব্যটিকে জোরালো করে দিয়েছেন। উপমানটিই লেখকের প্রতিক্রিয়া বহন

৮৪ সিপাহিযুদ্ধের ইতিহাস, প্রথম ভাগ, ২য় সংস্করণ ১৮৮৬, সূচনা।

করছে— বহ্নির একটি স্ফুলিঙ্গ উড়িল না। দিলীপ সিংহের কোমল অন্তঃকরণ ক্ষুব্ধ হল না— এটা ইতিহাসের তথ্য কিন্তু বাল্য-লীলাতরঙ্গের পাশাপাশি স্থাপিত হওয়ায় এই তথ্যটির অর্থ জোরালো হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাসমূলক প্রবন্ধের ভাষার সঙ্গে রজনীকান্তের গদ্যের সাদৃশ্য সহজেই চোখে পড়বে। অন্বর্থ শব্দঋজুতা পরিমিতি বাক্যগঠন— এসব দিক দিয়ে দুজনের মিল। কিন্তু বঙ্কিমী গদ্যের জোর আর-এক দিকে। বঙ্কিমের গদ্যে লেখকের ব্যক্তিত্ব আরো প্রকট। সেটা বোঝা যায় শব্দ-ব্যবহারের স্বাধীনতায়। রজনীকান্ত সংস্কৃতমূলক শব্দ এবং উপমার বাইরে যান নি। সেজন্য তাঁর লেখায় আত্মসংযম বেশি। ভাষা সৈন্যবাহিনীর মতো শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং সেজন্য খানিকটা কৃত্রিম সতর্কতা। বঙ্কিমের ভাষা অধিকতর সাবলীল অনায়াস-নির্মিত। রজনীকান্ত যে প্রকৃতির উপমা ব্যবহার করেছেন বঙ্কিমের উপমা সে-প্রকৃতির নয়, এমন কি এই ভাষায় উপমাই ব্যবহার করেন না। বঙ্কিমের শব্দ ও বাক্য-রচনায় লেখকের মানসিক প্রতিক্রিয়া প্রকট, এমন কি কখন কখন উগ্র। যেমন— 'এ কথা যে বিশ্বাস করে তাহার মাথায় বজ্রাঘাত হউক'। বঙ্কিম কখনও নিজের ইচ্ছামতই শব্দ চালনা করেছেন তাতে বক্তব্য যেমন হৃদয়গ্রাহী হয়েছে, তেমনি ভাষার প্রকাশক্ষমতা বেড়েছে। রজনীকান্ত স্বভাব-ঐতিহাসিক ছিলেন আর সেই সঙ্গে ছিলেন জাতীয় ভাবে গাঢ় অনুপ্রাণিত। তাঁর তথ্যসমাশ্রিত ভাষায় এজন্য উন্মাদনা এসেছে কিন্তু অত্যন্ত সংযত ভাবে। তাঁর সাধু ভাষারীতির প্রতি পক্ষপাতিত্বের ফলে এ সংযম স্বাভাবিক হয়েছে।—

"যদি কোন বীরশ্রেষ্ঠ বীরেন্দ্রসমাজের প্রীতিপুষ্পাঞ্জলি পাইয়া থাকেন যদি কোন অদীনপরাক্রম মহাপুরুষ অসাধারণ দেশানুরাগজন্য স্বর্গস্থ দেবসমিতিতে অপ্সরাদিগের বীণানিন্দিত মধুর স্বরে স্তুত হইয়া থাকেন তাহা হইলে তিনি সেই লিওনিদাস ও মিলতাইদিস ; আর এই প্রতাপ সিংহ ও শের সিংহের চিনিবালা উনবিংশ শতাব্দীর একটি পবিত্র যুদ্ধক্ষেত্র। পবিত্র ইতিহাস হইতে এই পবিত্র যুদ্ধক্ষেত্রের গৌরবকাহিনী কখনও অপসারিত হইবে না।"[২৫]

এখানে লেখক ইতিহাসের কঠোর তথ্য বর্ণনা থেকে সরে এসেছেন। স্বর্গলোকে অপ্সরাবন্দিত হাওয়ার কল্পনা ভাষায় আতিশয্য নিয়ে এসেছে এবং

২৫ আর্যকীর্তি 'শিখ'।

লেখকের ভাবাবেগকে সঞ্চারিত করেছে। ভাষার এই রীতি রজনীকান্তের স্টাইলের আর-এক স্তর। এ ভাষা তিনি ব্যবহার করেছেন দেশাত্মবোধের উন্মাদনায়।

কিন্তু যে স্তরের ভাষাই হোক রজনীকান্তের গদ্য ভাষা একটা বিশেষ প্রকৃতির ভাষা— সেটি আমাদের উনবিংশ শতকের গদ্যপ্রকৃতি। এ প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের স্বাধীন কবিত্বমণ্ডিত রোমান্টিক রীতি এবং প্রমথ চৌধুরীর ড্রয়িংরুম-বৈদগ্ধ্যসমন্বিত ভাষারীতির পর। অক্ষয়কুমার দত্ত বঙ্কিমচন্দ্র ভূদেব মুখোপাধ্যায় রজনীকান্ত— এঁদের ভাষার মধ্যে আমরা যে বৈশিষ্ট্য দেখি ইংরেজিতে তাকে বলা যায় 'ডিসিপ্লিন'। লঘু তরল অত্যাবশ্যকতাহীন ভাব ও শব্দের প্রয়োগে এই ডিসিপ্লিন ক্ষুণ্ণ হয়। এটাই ক্লাসিক্যাল গুণ। বাংলা গদ্য থেকে এই ক্লাসিক্যাল গুণ চিরবিদায় নিয়েছে। তবে ক্লাসিক্যাল গুণ থাকার অর্থ সাধু তৎসম শব্দ মাত্রের ব্যবহার নয়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বা রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর ভাষায় মৌখিক বাক্‌ভঙ্গিমা সহজলভ্য। কিন্তু যেটা এর গুণ সেটা হচ্ছে কেন্দ্রীয় সংহতি, মূল বক্তব্যটিকে ঘিরেই ভাষার বিস্তার ঘটে। শব্দের পরিমিতি এবং মূল আকর্ষণ-কেন্দ্রটি ঠিকই থাকে। রজনীকান্ত অবশ্য ঠিক এই রীতির লেখক নন। তাঁর লেখায় মৌখিক বাক্-ভঙ্গিমার আভাস নেই। সে জন্য মনে হয় ভাষার বাঁধুনির দিক দিয়ে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে যেন তাঁর মিল।

রজনীকান্তের যুগে বাংলা গদ্যের অনুসরণীয় রীতি নিয়ে তখনও বিতর্ক উপস্থিত হয় নি। তবে বঙ্কিমচন্দ্র এই বিতর্ক-সম্ভাবনা বুঝেছিলেন, তাই লিখেছিলেন 'বাঙ্গালা ভাষা' নামে প্রবন্ধ। লেখকদের মধ্যে তখনও দ্বিধা নেই। বিশুদ্ধ ভাষা ছিল সাধু রীতির ভাষা। রজনীকান্ত এ-ভাষাতেই লিখতেন। বাংলার এই সাহিত্যিক ভাষার প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল গভীর। 'আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়' প্রবন্ধটিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কর্তব্য নির্দেশ করেছেন অর্থাৎ মাতৃভাষার পরিপুষ্টি-সাধন, জাতীয় সাহিত্যের বৃদ্ধি— তার সঙ্গে প্রায় চল্লিশ বৎসর পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত রবীন্দ্রনাথের সমাবর্তন ভাষণের বক্তব্যে অমিল নেই। এটাই স্বাভাবিক। যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ মাতৃভাষার সমৃদ্ধি সাধনের একমাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে স্থাপিত হয়েছিল ১৩০১ সালের বৈশাখ মাসে রজনীকান্ত ছিলেন তার প্রথম তিন বছরের পত্রিকাধ্যক্ষ (১৩০১-৩) এবং তার পরে রেজিস্ট্রেশন পত্রের অন্যতম স্বাক্ষরদাতা

(১৮৯৯)। রবীন্দ্রনাথ তারই ন্যাসরক্ষক হয়েছিলেন ১৯০১ সালে। বাংলা-ভাষার নিজস্ব গৌরব-বৃদ্ধির সহজ উদ্দেশ্যসাধনে দুয়েরই সমান আগ্রহ।

যুগদার্শনিক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর 'জিজ্ঞাসা' বইখানি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৩১০ সালে। এই বইয়ের প্রবন্ধগুলি প্রায় সবই পূর্ববর্তী দশ বৎসরের মধ্যে লেখা। এই লেখাগুলির উপর নির্ভর করেই মূলত রামেন্দ্রসুন্দরের একটি সুজ্ঞাত পরিচয় গড়ে উঠেছে। বিজ্ঞান ও দর্শনের দুরূহ বিষয় তিনি সহজ করে প্রকাশ করতে পারতেন। 'জিজ্ঞাসা'র প্রবন্ধগুলি সম্পর্কে আজও আমাদের ধারণা এই যে ওইগুলি বিজ্ঞান ও দর্শন সম্বন্ধীয় কতকগুলি বিচ্ছিন্ন আলোচনা মাত্র; নানা সময়ে সাধারণ বাঙালি পাঠকের সাধারণ জ্ঞানবৃদ্ধির উদ্দেশ্য মনে রেখেই বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশের জন্য এগুলি রচিত হয়েছিল। প্রবন্ধগুলি সুরচিত ও জ্ঞানগর্ভ— এ বিষয়ে কারো সন্দেহ নেই, কিন্তু এর পেছনে যে তদতিরিক্ত গভীরতর ধ্যান বা জীবনদর্শন আছে সেকথা সম্ভবত বিশেষ কেউ ভেবে দেখেন নি। এ বিষয়ে রামেন্দ্রসুন্দর নিজেই এই বইয়ের ভূমিকায় একটি গূঢ় ইঙ্গিত দিয়েছেন—

"সর্বদেশে ও সর্বকালে জ্ঞানিসমাজ যে সকল জাগতিক তথ্য নিরূপণের জন্য ব্যাকুল তন্মধ্যে কতিপয়ের আলোচনা এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। অধিকাংশ স্থলেই আলোচ্য বিষয় বিতণ্ডার ক্ষেত্র। বাদী-প্রতিবাদী উভয়পক্ষের মত-সংকলনে যথাজ্ঞান ও যথাশক্তি চেষ্টা করিয়াছি। মাসিক পত্রিকার প্রবন্ধে সংকীর্ণ আয়তনের মধ্যে ঐ সকল দুরূহ তত্ত্বের সম্যক আলোচনা সম্ভবপর নহে। গ্রন্থকারের প্রয়াস জিজ্ঞাসা মাত্র।

বিবিধ বিষয় আলোচিত হইলেও প্রবন্ধগুলির মধ্যে একটি অবিচ্ছিন্ন সূত্র বাহির করা যাইতে পারে।"

'জিজ্ঞাসা'র প্রবন্ধগুলি রচনার মূলে ছিল লেখকের গভীর জীবনজিজ্ঞাসা যা চিরকালের জ্ঞানিসমাজকে ব্যাকুল করেছে। বিচ্ছিন্ন হলেও এদের মধ্যে একটি অবিচ্ছিন্ন ঐক্যসূত্র আছে। এই ঐক্যসূত্রই ব্যক্তি রামেন্দ্রসুন্দরের জীবনচিন্তা। সুতরাং 'জিজ্ঞাসা' থেকেই রামেন্দ্রসুন্দরের গূঢ় জীবনভাবনাকে উদ্ধার করা যায়। 'জিজ্ঞাসা' বিদ্যালয়-পাঠ্য গ্রন্থ মাত্র নয়। যথাযথভাবে অধ্যয়ন করলে দেখা যায় 'জিজ্ঞাসা'র আলোচিত বিষয় এবং অনুসন্ধিৎসার সঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীর

নবজাগ্রত বাঙালি সমাজের চিন্তাভাবনার গভীর যোগ আছে। এই যোগটি অনুভব করবার সহজ উপায় হচ্ছে একালের আলোচিত প্রবন্ধরীতির সঙ্গে এর তুলনা। রামেন্দ্রসুন্দর যেসব বিষয়কে আলোচনার মধ্যে এনেছিলেন কিংবা যেসব জিজ্ঞাসার দ্বারা চালিত হয়েছিলেন, আজকালকার প্রবন্ধকারেরা তার দ্বারা প্রেরণা পান না। তাঁদের সন্ধানের বিষয় অন্য, রীতি ভিন্ন। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় রামমোহনের আমল থেকে অক্ষয়কুমার-বঙ্কিমচন্দ্র-ভূদেব-বিবেকানন্দ পর্যন্ত বাঙালি মনীষার যে-বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে, 'জিজ্ঞাসা'র চিন্তা-বৈশিষ্ট্য তারই সঙ্গে তুলনীয়। 'জিজ্ঞাসা'র রচনাকাল ছিল উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক। বহু কর্ম ও কীর্তিতে পূর্ণ, বিচিত্র ও অভিনব চিন্তাসম্পদে সমৃদ্ধ বহু মনীষীর আবির্ভাবে সমুজ্জ্বল উনবিংশ শতাব্দী তখন অবসানের মুখে। রামেন্দ্রসুন্দর তাঁর গ্রন্থে এই শতাব্দীর ভাবনাকে বিভিন্ন প্রবন্ধে সংহত করে দিয়ে গেলেন।

রামেন্দ্রসুন্দর তাঁর বইখানার নাম দিয়েছেন 'জিজ্ঞাসা'। এই নামটি যেমন সুন্দর, তেমনি অর্থগভীর। এই নামকরণের সার্থকতা কোথায়— তার একটা ইঙ্গিত তিনি ভূমিকাতেই দিয়েছেন। এ-জিজ্ঞাসা সর্বদেশের সর্বকালের জ্ঞানিসমাজের জিজ্ঞাসা। সত্যকার জ্ঞানীমাত্রই এই জিজ্ঞাসায় আকুল হন। দার্শনিকেরা চিরকাল সৃষ্টির মূল কারণ সন্ধান করে এসেছেন, বৈজ্ঞানিকেরা জানতে চেয়েছেন প্রকৃতির নিয়মপদ্ধতি। জ্ঞানীমাত্রেরই এই প্রবৃত্তি। এই বইয়ের সংকলিত প্রবন্ধগুলির প্রকৃতি বিচার করলে সহজেই লক্ষ্যগোচর হয় রামেন্দ্রসুন্দরও সৃষ্টির সেই চিরকালের মৌলিক প্রশ্ন দ্বারাই চালিত হয়েছেন। সুখ না দুঃখ কোনটা সত্য, এ-প্রশ্ন সভ্যতার প্রথম থেকেই মানুষের চিন্তাকে আলোড়িত করেছে। নচিকেতা বা মৈত্রেয়ী, বুদ্ধ বা শংকর, এপিকিউরাস বা চার্বাকের চিন্তায় এবং বিভিন্ন যুগের কবিদের নানা কাব্যগাথায় নানাভাবে মানুষ এই জিজ্ঞাসাকে অপূর্ব করে প্রকাশ করে বলেছে। রামেন্দ্রসুন্দরও তাঁর প্রবন্ধের উপসংহারে বলেছেন—

"মীমাংসা হইল না। নিরপেক্ষভাবে দুই দিক দেখাইতে গিয়া লেখক যদি অজ্ঞাতসারে কোন দিকে বেশী টান দিয়া থাকেন, পাঠকেরা মার্জনা করিবেন।"[১]

১ সুখ না দুঃখ, ১২৯৯।

ঠিক এই সুরেই অধিকাংশ প্রবন্ধ শেষ হয়েছে। 'জগতের অস্তিত্ব' প্রবন্ধটিও এমন একটি মৌলিক প্রশ্নের উত্তরের সন্ধানেই রচিত। কিন্তু উত্তর কি লেখক পেয়েছেন ?

"এই এক এব সদ্বস্তু, ইহার স্বরূপ কি ? ইহা সৎ, ইহা অস্তি, ইহা সত্য পদার্থ— তথাস্তু। ইহা চিৎ ইহা চিন্ময় পদার্থ— mind stuff তথাস্তু। ইহা আনন্দস্বরূপ— তাই কি ? কেহ কেহ ভ্রূকুটি করিবেন ; —বলিবেন জানি না, উহা অজ্ঞেয়, অনির্দেশ্য। মাধ্যমিক বৌদ্ধ বলিবেন, উহা সৎ নহে, অসৎও নহে, সৎও বটে, অসৎও বটে তাহাও নহে, সৎও নয়, অসৎও নয় তাহাও নহে। উহার পারিভাষিক নাম শূন্য। হিউম ও হকসলী হয়ত বলিবেন, সদ্বস্তুর জন্য এত মাথাব্যথা কেন ? যাহা আছে, তাহাই আছে। মায়াপটের অন্তরালে যাইবার আবশ্যকতা কি ? চিদ্বস্তু, সন্দেহ নাই ? কিন্তু চিদ্বস্তুর মূলে কি আছে, অন্বেষণের প্রয়োজন নাই। সদ্বস্তুর মরীচিকায় প্রতারিত হইও না।"[২]

'সৃষ্টি' 'সৌন্দর্যতত্ত্ব' 'কে বড়' 'অমঙ্গলের উৎপত্তি' 'যুক্তি' 'মায়াপুরী' প্রভৃতি প্রায় সব প্রবন্ধেই রামেন্দ্রসুন্দর চিরন্তন সমস্যা এবং প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেছেন। নানাভাবে বিভিন্ন দিক থেকে বিভিন্ন মনীষীর চিন্তার আলো ফেলে প্রশ্নের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করেছেন। কখনও মনে হয় উত্তর বুঝি এসে গেল, কিন্তু পরক্ষণেই নতুন দিক থেকে তার জটিলতা দেখিয়ে দেন। এইভাবেই তিনি পাঠকের বিচারশক্তিকে এবং উত্তরের জন্য ব্যাকুলতাকে তীব্রতর করে তোলেন। অতি সাধারণ বিশ্বাস এবং সংস্কারকেও তিনি প্রশ্ন করেছেন, তার অনিশ্চয়তাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু সর্বত্রই তাঁর প্রবন্ধ পর্যবসিত হয় কোনো উত্তরে নয়, বিশুদ্ধ অনুসন্ধিৎসাতে। সমস্যাকে নানাদিক থেকে দেখাতেই তাঁর আনন্দ। সেইজন্য বারবার উত্তরসন্ধানে ব্যর্থ হয়েও তিনি বিরত হন না। তিনি বলেন—

"আশ্চর্য এই যে, কি জানি কি খেয়ালের বশ হইয়া আমি যেন তাহা জানি না, এইরূপ অভিনয় করি এবং আমার বাহিরে এবং আমার উপরে আর একজন কল্পনাকর্তার ও রচনাকর্তার কল্পনা করিয়া, কোথায় তিনি, কোথায় তিনি এইরূপ জিজ্ঞাসার পণ্ডশ্রমে আমি প্রবৃত্ত হই। অথবা স্বতন্ত্র আমার, স্বাধীন

২ জগতের অস্তিত্ব ১৩০০।

আমার, মুক্ত আমার, এইরূপ পরতন্ত্রবৎ পরাধীনবৎ বদ্ধবৎ আচরণেই,— এই পণ্ডশ্রম স্বীকারেই আমার আহ্লাদ এবং এই জিজ্ঞাসাতেই আমার আনন্দ।"[৩]

এই জিজ্ঞাসা চিরকালই জ্ঞানিসমাজে থাকলেও এ যুগে এর একটা ভিন্নতর বৈশিষ্ট্য ও মহিমা আছে। একালে জিজ্ঞাসা কেবল দার্শনিক বা ঈশ্বরসন্ধানীর তত্ত্বচিন্তায় সীমাবদ্ধ নেই। জিজ্ঞাসা এখন আধ্যাত্মিক এবং আধিভৌতিক জগতের সর্বস্তরেই পরিব্যাপ্ত। প্রাচীনযুগে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি এবং ইহলৌকিক প্রয়োজন-সাধনের জটিলতা এত বেশি ছিল না। বাস্তব বা প্রাকৃতিক জীবন এবং আধ্যাত্মিক জীবন ছিল সম্পূর্ণ পৃথক। মানুষের উচ্চতর চিন্তা সম্পূর্ণরূপে আধ্যাত্মিক জগতেই বিচরণ করে ফিরেছে। আমাদের দেশের তো কথাই নেই। ভারতবর্ষের দার্শনিক ধ্যান ও বিচার আত্মা ঈশ্বর জগৎ ইত্যাদি সম্বন্ধে যে-অপরিসীম এবং অক্লান্ত আগ্রহ দেখিয়েছে, এই ভৌতিক জগৎ সম্বন্ধে তার কিছুই দেখায় নি। এ যেন একটা সম্পূর্ণ পৃথক অভিজ্ঞতার জগৎ, যে অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে জ্ঞানীরা চিরকালই সন্দিহান। অদ্বৈত-বৈদান্তিক তো একে বলেছেন মায়া আর দ্বৈতবাদী ভক্ত একে বলেছেন 'অপ্রকৃত লীলা'। সুতরাং এই লৌকিক জগৎ সম্বন্ধে কোনো কৌতূহলই তাঁদের ছিল না। আমাদের দেশে এই জগৎ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা যাঁর মধ্যে প্রথম জেগেছিল তিনি বলেছিলেন—

"পূর্বে আমারদিগের দেশে এত দর্শনশাস্ত্র প্রকাশ হইয়াছে, এ বিষয়ের অনুসন্ধান করা তাহার তাৎপর্য ছিল না। আপনারদিগের শারীরিক ও মানসিক স্বভাব ও বাহ্যবস্তুর সহিত তাহার সম্বন্ধ বিবেচনা করিবার প্রয়োজন তৎকালের লোকের সম্যক বোধগম্য হয় নাই।"[৪]

তবু মনে হয় প্রাচীন যুগে ভারতীয় দর্শনচিন্তার যে প্রসার ঘটেছিল, সেও ছিল সত্যকার জিজ্ঞাসা। সে চিন্তা শুধু অর্থহীন পুনরুক্তিমাত্র নয়। কিন্তু পরবর্তী কালে, যাকে আমরা মধ্যযুগ বলি, সেকালে এই জিজ্ঞাসা আর ছিল কিনা সন্দেহ। বাংলাদেশে মধ্যযুগে মননের প্রধান ফসল নব্যন্যায়। নব্য-ন্যায়ের সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণের তুলনা সুলভ নয়, কিন্তু এর ভিত্তি কি? প্রাচীন ভারতবর্ষে যেমন ইহলৌকিক জীবন সম্বন্ধে কোনোরকম কৌতূহলই অনাবশ্যক

৩ বিজ্ঞানে পুতুলপূজা ১৩১৭।

৪ অক্ষয়কুমার দত্ত, 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার', প্রথম ভাগ ১৭৭৩ শক, উপক্রমণিকা।

প্রমাণিত হয়েছিল মধ্যযুগেও তেমনি ইহজীবনটাকে ধর্তব্যের মধ্যেই আনা হয় নি। মধ্যযুগে পণ্ডিতেরা বাস করে গিয়েছেন এক বিচিত্র শব্দের জগতে। সেখানে শব্দ নিয়ে বিচার, অতি তুচ্ছ বিষয় নিয়ে যুক্তিবিস্তার— প্রাকৃতিক জগতের বাস্তবতা থেকে তা সুদূরপরাহত। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন—

"It is indeed, still taught with reverence, and learnt with awe, in the secluded tols of Nadiya and other seats of ancient learning, but the philosophy of the tols is the most barren and unprofitable study in which the human intellect can engage itself. Philosophy as taught by the Pandits, is simply a storehouse of verbal quibbles and high proficiency in it is considered synonymous with high proficiency in the art of profitless wrangling. The sum of useful human knowledge would in no way be diminished if by some fortunate accident, the philosophy of the tol disappeared from the face of the earth "[৫]

বঙ্কিমচন্দ্র খুব কঠিন কথা বলে গিয়েছেন। কিন্তু সত্যই যদি সন্ধান করি মধ্যযুগে বাঙালি মনীষা ব্যাপৃত ছিল কি নিয়ে তবে শেষ পর্যন্ত বঙ্কিমের কঠোর মন্তব্যকে মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। য়ুরোপে এই ধরনের যুক্তি-বিচারকে বলা হত স্কলাসটিসিজম্।

একদিকে দার্শনিক চিন্তা পরিণত হল নেহাতই বুদ্ধির ব্যায়ামে আর-একদিকে বাস্তব-জীবন এবং প্রাকৃতিক জগৎ আমাদের সবরকম মনন ও চিন্তার বাইরেই থেকে গেল। এর গতিপ্রকৃতি এঁর সঙ্গে মানুষের সংযোগ ও ব্যবহার, বৃহত্তর সমাজ-জীবনের প্রতি ব্যক্তিমানুষের কর্তব্যপালন— এসব বিষয়ে কোনো কৌতূহল বা জিজ্ঞাসাই আর থাকল না। আমাদের নীতি-নিয়ম ধর্মাচরণ লোকব্যবহার কল্যাণভাবনা— এসবই পর্যবসিত হল শাস্ত্রগত নির্দেশে, অন্ধ আনুষ্ঠানিকতায়। পণ্ডিতের জিজ্ঞাসা আমাদের বাস্তবজীবনকে অবলম্বন করে নি কিংবা প্রকৃতির বিধানকেও বিশ্লেষণ করে দেখে নি।

এই জিজ্ঞাসা প্রথম দেখা গেল রামমোহনের মধ্যে। যে-অভ্যাসকে আমরা

---

৫ *The Study of Hindu Philosophy,* 18 3.

এতকাল পালন করে এসেছি, তার সার্থকতা নিয়ে তিনিই প্রথম প্রশ্ন করলেন। আমাদের দীর্ঘকাল-প্রচলিত আচার-অনুষ্ঠানকে নতুন করে বিচার করে এর সার্থকতা জানবার ইচ্ছা জেগে উঠল। কেমন করে তাঁর মনে এই প্রশ্ন জেগেছিল সে-প্রসঙ্গ অন্য। কিন্তু একথা সত্য যে তিনি উৎসুক হলেন জানতে। অবশ্য এ কথাও ঠিক যে রামমোহনের এই জিজ্ঞাসা পুরোপুরি আধুনিক রূপ গ্রহণ করে নি। তিনি শাস্ত্র দিয়েই আচারের ব্যাখ্যা খুঁজেছেন। প্রাচীন স্মার্ত পণ্ডিতের মতো শাস্ত্রের নতুন অর্থ নির্ণয় করেছেন। তাঁর প্রণালীও পণ্ডিতী বা স্কলাসটিক। শাস্ত্রপুরাণের বাইরে বিশ্বনীতি বা বিশ্বপ্রকৃতির নিয়মকে স্বতন্ত্রভাবে অবলম্বন করে আচার অনুষ্ঠানকে তিনি বিচার করে দেখেন নি। কিন্তু তিনি যে অন্ধ জড় অভ্যাসকে মানতে চাইলেন না, এতেই বোঝা যায় তাঁর মনে সংশয় দেখা দিয়েছিল। এই সংশয় আধুনিক মনের প্রবৃত্তি। উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালির যে নবজাগরণ ঘটেছিল, তার প্রধান লক্ষণ ছিল এই সংশয় এবং জিজ্ঞাসা।

পাশ্চাত্য জাতির সংস্পর্শে এসে বাঙালির মনে বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে যে কৌতূহল জেগে উঠতে আরম্ভ হয়েছিল তার প্রাথমিক পরিচয় পাওয়া যায় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বিচিত্র বিষয়ের পাঠ্যগ্রন্থ-রচনায়, বিশ্বের ইতিহাস-সন্ধানে, ভূগোল, ইতিহাস, পদার্থতত্ত্ব, প্রাণিবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা ইত্যাদি নানা বিষয়ে বাঙালির ঔৎসুক্যকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টায়। বলা বাহুল্য ওইগুলি নেহাৎই বালকপাঠ্য। তথাপি মনে রাখা দরকার, প্রাকৃতিক বা আধিভৌতিক বিষয়ে আমাদের যে জ্ঞানস্পৃহা জেগে উঠছে, এটা নিশ্চয়ই যুগান্তরের লক্ষণ। নব্যবঙ্গের দল ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ইউরোপীয় সভ্যতার জীবন ও সমাজ-জিজ্ঞাসার সঙ্গে গভীরতর পরিচয় লাভ করেছে।[৬] এই জিজ্ঞাসাই ক্রমে গভীর ও জটিল

---

৬ The impetus to enquiry and the promotion of thought given by Derozio manifested itself in debating clubs which were encouraged by Hare. They sprang up in every part of the town. Hare seeing the tendency of the Hindu mind, arranged with Derozio to deliver a course of lectures on metaphysics at his school which was open to the public. Some four hundred youngmen used to attend the *lectures, which were continued for sometime.*—Peary Chand Mitra. *Biographical Sketh of David Hare*, 1877, p 33.

নৈতিক প্রশ্নে রূপান্তরিত হল। সমাজ ও জীবনের এই বৈশিষ্ট্য-নির্ণয়, ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক, নির্বিচার শাস্ত্রপালনের যৌক্তিকতা, প্রাকৃতিক জগতের অনুশাসনের দ্বারা ব্যক্তির কর্তব্য নির্ণয়— এই সব গভীরতর প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসার দিকে উনবিংশ শতাব্দীর চিন্তা উন্মুখ হয়ে উঠল। অক্ষয়কুমার দত্তের রচনাকে বাঙালি মানসের এই প্রবণতার প্রথম প্রতীক বলে নির্দেশ করা যায়। অক্ষয়কুমার ভূগোল পদার্থতত্ত্ব চারুপাঠ প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন সাধারণ পাঠকদের মধ্যে জ্ঞানের বিস্তারের জন্য, আবার এই বিচ্ছিন্ন জ্ঞানচর্চাই সংহত রূপ নিয়েছিল 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার' (১৮৫২) গ্রন্থে। এই গ্রন্থে সুসম্বদ্ধ তত্ত্বচিন্তা সত্যকার আধুনিক জিজ্ঞাসায় এবং তার উত্তর-সন্ধানে পরিণত হয়েছে। আধুনিক মানুষ আর ঈশ্বর বা আত্মার চিন্তায় মগ্ন নয়, এখন সে জানতে চায় এই বাহ্যজগতের সঙ্গে তার সম্বন্ধ কি। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি সংক্ষিপ্ত মন্তব্যে যুগের জিজ্ঞাসা চমৎকার প্রকাশিত হয়েছে। অক্ষয়কুমার সম্বন্ধে তিনি বলেছেন—

"আমি খুঁজিতেছি ঈশ্বরের সহিত আমার কি সম্বন্ধ। আর তিনি খুঁজিতেছেন বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ।"[৭]

উনবিংশ শতাব্দীতে নানা কর্মে নানা উদ্যমে এই একই প্রশ্ন প্রচ্ছন্ন— বিশ্বজগতে মানুষের স্থান কোথায়, বিশ্বনীতি এবং ব্যক্তিনীতির সম্পর্ক কি। এই জিজ্ঞাসা শুধু তত্ত্বচিন্তায় নয়, সাহিত্যেও দেখা দিয়েছে। মধুসূদনের রাবণ একটি খাঁটি উনিশ শতকীয় চরিত্র। রাবণ যখন এই ব্যাকুল প্রশ্ন করে—

কি পাপে লিখিলা
এ পীড়া দারুণ বিধি রাবণের ভালে ?[৮]

তখন এই প্রশ্ন আপাতদৃষ্টিতে অর্থহীন মনে হয়। রাবণ যে কি পাপ করেছে সে কি কারো অজানা ? কিন্তু পাপ করলে তার যে প্রতিফল হয়, এই শাস্ত্র-নির্দিষ্ট কার্যকারণবোধ নিয়ে পরিতৃপ্ত তুষ্ট থাকবার যুগ আর নেই। প্রত্যক্ষ প্রাকৃতিক নিয়মের কার্যকারণ নিয়ে এই পরিণামকে নির্দেশ করা যায় না বলেই রাবণের বিস্ময়। প্রকৃতির কোন নিয়মে এমন অসম্ভব কাণ্ড ঘটতে পারে—

৭ আত্মচরিত, ২ সং, পৃ ২৩।

৮ মেঘনাদবধ কাব্য, নবম সর্গ, ৩৯৯-৪০০।

হায়, বিধি বাম মম প্রতি
কে কবে শুনেছে পুত্র, ভাসে শিলা জলে
কে কবে শুনেছে, লোক মরি পুনঃ বাঁচে ?[৯]

উনবিংশ শতাব্দীর এই জিজ্ঞাসার দুটি দিক্ আছে। একটি হচ্ছে প্রাকৃতিক জগৎ নিয়ে। প্রকৃতিতে যেসব ঘটনা ঘটে, জন্ম মৃত্যু রোগ শোক দিন রাত্রি বন্যা মারী—এসব কেন ঘটে। পূর্বতন যুগে এসব ঘটনার ব্যাখ্যা এক রকম ছিল, আধুনিক কালে মানুষ সে-ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট নয়। রামেন্দ্রসুন্দর 'অমঙ্গলের উৎপত্তি' প্রবন্ধে ঈশ্বর শয়তান কর্মফল জেহোবা প্রভৃতি প্রাচীন ব্যাখ্যার অবতারণা করেও তৃপ্ত হতে পারেন নি। এখানেও তিনি কোনো মীমাংসায় পৌঁছুতে পারেন নি, বিশুদ্ধ জিজ্ঞাসাই থেকে গিয়েছে। এইসব প্রাকৃতিক ঘটনার প্রাচীন ব্যাখ্যায় সত্যই আর আধুনিক মানুষের মন ভরে না।

"A general demand for restatement or explanation seems to have arisen from time to time, perhaps never more vehemently than in the period we are considering. Such a demand presumably indicates a disharmony between traditional explanations and current needs. It does not necessarily imply the 'falsehood' of the older statement; it may merely mean that men now wish to live and to act according to a different formula.···Interest was now directed to the *how*, the manner of causation, not its why, its final cause."[১০]

এই নতুন ব্যাখ্যার একটি সুন্দর উদাহরণ আছে বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মতত্ত্বে—

শিষ্য। আপনি কি বলেন যে এই দারিদ্র্য, গৃহদাহ, রোগ এ সকলই অধর্মের ফল ?

গুরু। তা বলি।

শিষ্য। পূর্বজন্মের ?

গুরু। পূর্বজন্মের কথায় কাজ কি ? ইহজন্মের অধর্মের ফল।

---

৯ মেঘনাদবধ কাব্য. প্রথম সর্গ, ৭৪০–৭৪১।

১০ Basil Willey, *The Seventeenth Century Background*, 1960, p 11.

শিষ্য। আপনি কি ইহাও মানেন যে এজন্মে আমি অধর্ম করিয়াছি বলিয়া আমার রোগ হয়?

গুরু। আমিও মানি, তুমিও মান। তুমি কি মান না যে হিম লাগাইলে সর্দি হয়, কি গুরুভোজন করিলে অজীর্ণ হয়?[১১]

এই ব্যাখ্যা বৈজ্ঞানিক রীতির ব্যাখ্যা, প্রত্যক্ষ জগতের কার্যকারণসূত্র-নির্ণয়। পূর্বে এই সব ঘটনার কারণ হিসাবে হয়ত উল্লিখিত হত মানুষের পাপ পুণ্য ইত্যাদির। কিন্তু আধুনিক যুগে প্রাকৃতিক নিয়মের প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য ছাড়া কোনো কিছুর ব্যাখ্যা চলে না। এই নতুন রীতির ব্যাখ্যার সন্ধানই নতুন যুগের জিজ্ঞাসা।

আধুনিক জিজ্ঞাসার এটা হল একটা দিক— প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যাখ্যা-সন্ধান। এটা বহির্জগতের। এর আর-একটা দিক আছে— অন্তর্জগতের বা নৈতিক জগতের। মানুষের কর্তব্য কি, আচরণবিধি কেমন হওয়া উচিত, লোককল্যাণ বা চরিত্রনীতির স্বরূপ কি? পূর্বে এ সম্বন্ধে সাধারণত কোনো জিজ্ঞাসা ছিল না। শাস্ত্রনির্দেশই ছিল শেষ কথা, স্মৃতিসংহিতার বিধানই ছিল প্রামাণ্য। দেশাচার শাস্ত্রাচার এবং সহস্রবিধ অভ্যাস ও অনুষ্ঠানে আমাদের জীবনযাত্রা ছিল সমাচ্ছন্ন। রামমোহন বিদ্যাসাগর এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন, কিন্তু 'হৃদয়েনাভ্যনুজ্ঞাতঃ'। নৈতিক আচরণ সম্বন্ধে সচেতন নৈতিক তত্ত্বচিন্তার দ্বারা তাঁরা চালিত হন নি। সেই সচেতন নৈতিক তত্ত্বচিন্তা করেছিলেন অক্ষয়কুমার এবং বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁরা মানুষের কর্তব্য সম্বন্ধে গভীর বিচার করলেন। অক্ষয়-কুমারের সে চেষ্টার পর বঙ্কিমচন্দ্র লিখলেন অনুশীলনতত্ত্ব বা মানুষের ধর্মনীতি।

প্রাচীন নৈতিক ব্যাখ্যার ও আধুনিক নৈতিক ব্যাখ্যার প্রধান পার্থক্য এই যে একালে নৈতিক আচরণকে প্রাকৃতিক নিয়মের অমোঘ এবং প্রত্যক্ষ পরিণামের উপরেই স্থাপন করা হয়েছে। শাস্ত্রের অন্ধ আনুগত্যের জন্য নয়, বৈজ্ঞানিক এবং ব্যাবহারিক জগতের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বিবেচনা করেই নৈতিক বিধি নির্ধারিত। ইউটিলিটারিয়ানিজ্‌ম এবং পজিটিবিজ্‌ম বাঙালির নবজাগ্রত মননবৃত্তিকে এমনি করেই প্রভাবিত করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র অনুশীলনতত্ত্বে যে নতুন নীতিশাস্ত্র রচনা করেছিলেন, তারও মূলে ছিল মানুষের কর্তব্যনির্ণয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা। এর বিবরণ তিনি দিয়েছেন—

---

১১ ধর্মতত্ত্ব, প্রথম অধ্যায়।

"অতি তরুণ অবস্থা হইতেই আমার মনে এই প্রশ্ন উদিত হইত, 'এ জীবন লইয়া কি করিব?' 'লইয়া কি করিতে হয়?' সমস্ত জীবন ইহার উত্তর খুঁজিয়াছি। উত্তর খুঁজিতে খুঁজিতে জীবন প্রায় কাটিয়া গিয়াছে, অনেক প্রকার লোকপ্রচলিত উত্তর পাইয়াছি, তাহার সত্যাসত্য নিরূপণ জন্য অনেক ভোগ ভুগিয়াছি, অনেক কষ্ট পাইয়াছি। যথাসাধ্য পড়িয়াছি, অনেক লিখিয়াছি, অনেক লোকের সঙ্গে কথোপকথন করিয়াছি এবং কার্যক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছি। সাহিত্য বিজ্ঞান ইতিহাস দর্শন দেশী বিদেশী শাস্ত্র যথাসাধ্য অধ্যয়ন করিয়াছি। জীবনের সার্থকতা সম্পাদন জন্য প্রাণপাত করিয়া পরিশ্রম করিয়াছি।"[১২]

ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত বাঙালী চেতনায় জিজ্ঞাসার যে দুটি দিক দেখা গিয়েছিল, রামেন্দ্রসুন্দরের 'জিজ্ঞাসা' বইখানি প্রধানত প্রথমটিরই অভিব্যক্তি। সেকালের মননপ্রণালীর বিশিষ্টতায় নৈতিক জিজ্ঞাসা ছিল বস্তুজিজ্ঞাসাসাপেক্ষ। আগেই বলেছি, প্রাকৃতিক নিয়মের সূত্র দিয়েই নীতিনির্ধারণের পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। রামেন্দ্রসুন্দর তাঁর এই বইটিতে কর্তব্যনীতির আলোচনা করেন নি যদিও অনিবার্যভাবেই সে-প্রসঙ্গ কখনও কখনও এসে গিয়েছে। বস্তুবিশ্লেষণেই তিনি আনন্দ পেয়েছেন, সিদ্ধান্ত অনেক সময়েই অ-লব্ধ, ফলে চরিত্রনীতির মানদণ্ডও অধিকতর দুর্লভ। কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দরের জিজ্ঞাসা শেষ পর্যন্ত কেবল বস্তুজগতেই বদ্ধ থাকে নি, তাঁর জিজ্ঞাসা বিস্তৃত হয়েছে অন্তর্জগতের নীতিসূত্র উদ্‌ভাবনে। তাঁর সেই অনুসন্ধিৎসার ফল 'কর্মকথা'র আশ্চর্য প্রবন্ধগুলি।

'জিজ্ঞাসা'য় রামেন্দ্রসুন্দরের বস্তুবিচারের বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি এখানে সাধারণভাবে ব্যাবহারিক জগতের বর্ণনা করে যান নি। অক্ষয়কুমার দত্ত পদার্থ-বিদ্যা বা ভূগোলের যে-বই লিখেছিলেন তাতে তিনি সাধারণ জ্ঞান বিতরণ করেছিলেন মাত্র। রামেন্দ্রসুন্দরের আলোচনা বর্ণনামূলক আলোচনা মাত্র নয়। তিনি এই প্রাকৃতিক জগতের ঘটনাধারার নিয়ামক কোনো নিয়ম আবিষ্কার করতে চেয়েছেন। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়, সৌন্দর্যকে নানাভাবে নানা পর্যায়ে অনুভব করা হয়—এর কোনো সাধারণ নিয়ম আছে কি? জীবজন্তু ও মানুষের মধ্যে সৌন্দর্যবোধের কোনো একটি প্রাকৃতিক নিয়ম আছে কি? বস্তুজগতের অস্তিত্ব কি সকলে একইভাবে অনুভব করে? মঙ্গল

১২ ধর্মতত্ত্ব, একাদশ অধ্যায়।

ও অমঙ্গল বলতে আমরা যা বুঝি তার কি কোনো নিরপেক্ষ সংজ্ঞা আছে? যুক্তি বলতে বিভিন্ন নীতিশাস্ত্র যে বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছে তাদের মধ্যে কোনো ঐক্য সম্ভব কি? অতিপ্রাকৃত বলতে কি বোঝায়? প্রাকৃতিক নিয়মের অতীত কোনো অতিপ্রাকৃত কি সম্ভব? সুখ ও দুঃখের সংজ্ঞা কি? এদের কি বস্তুগত অস্তিত্ব আছে? তার ব্যাখ্যা কি? সত্যকে তো পন্‌টিয়াস পাইলেট ঠাট্টা করেই উড়িয়ে দিয়েছিল। তবে সত্যের সংজ্ঞা কি?

এই ধরনের প্রশ্ন ও বিচারকে আমরা সহজেই দার্শনিক বলে নির্দেশ করতে পারি। কিন্তু এই আলোচনার সবচেয়ে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই যে রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞানের প্রাপ্ত সিদ্ধান্তগুলিকেই একটি একটি করে সংগ্রহ করে বিন্যস্ত করে শ্রেণীবদ্ধ এবং পারস্পরিক সংযোগ লক্ষ্য করে এদের অন্তর্নিহিত ঐক্যসূত্র বা নিয়ম বের করবার চেষ্টা করে দেখেছেন। নিয়ম-নির্ধারণ বিজ্ঞানেরই কাজ, কিন্তু সে নিয়মগুলি এক-এক বিভাগের। জীবতত্ত্ব উদ্ভিদতত্ত্ব পদার্থতত্ত্ব প্রভৃতির নিজের নিজের বিভাগের নিজের নিজের নিয়ম। এই নিয়মেরও নিয়ম থাকা সম্ভব। অর্থাৎ রামেন্দ্রসুন্দরের জিজ্ঞাসা ছিল সর্বব্যাপী নিয়মে। এ ধরনের প্রয়াস মূলত দার্শনিকের; কিন্তু দার্শনিক জিজ্ঞাসায় বস্তুবিজ্ঞানকে এমন করে ভিত্তি আমাদের দেশে প্রাচীনকালে কখনই করা হয় নি। আগেই বলেছি, বস্তুজগৎকে চিরকালই সন্দেহের চোখে দেখা হয়েছে বলেই এর সাক্ষ্য-প্রমাণকে অন্তর্ভুক্ত করার কথাই ওঠে নি।

মননের এই পদ্ধতি আধুনিক। য়ুরোপেও রেনাশাঁসের পর এই পদ্ধতিই প্রচলিত হয়েছে। এর প্রবর্তকের নাম ফ্রান্সিস বেকন। বস্তুবিজ্ঞানের সব বিভাগের থেকে জ্ঞান আহরণ করে বেকন চেষ্টা করেছিলেন অন্তর্নিহিত নিয়ম-সূত্রটিকে আবিষ্কার করতে। এমন কি জ্যোতিষ, স্বপ্ন, ভোজবাজি কোনোটাকেই বেকন বাদ দিতে চান নি। বলা যায় না কোনটার থেকে কোন অভাবিত কার্যকারণসূত্র আবিষ্কৃত হবে—

"Nothing is beneath Science, nor above it. Sorceries, dreams, predictions, telepathic communications, 'psychical phenomena' in general must be subjected to scientific examination; 'for it is not known in what cases and how for, effects attributed to superstition participate of natural causes.' Despite his strong naturalistic bent he feels the

fascination of these problems; nothing human is alien to him."[১৩]

রামেন্দ্রসুন্দরের জ্ঞানের পিপাসা ছিল বেকনের মতোই। জ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে তিনি বিচরণ করে ফিরেছেন। পদার্থবিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত, রসায়নের তথ্য, জীববিজ্ঞানের আবিষ্কার, বৌদ্ধ দর্শন এবং বেদান্তের অভিমতের সঙ্গে ফলিত জ্যোতিষ খ্রীষ্টীয় পুরাণ হিন্দুর নৈতিক সংস্কার— সব কিছুরই খবর তিনি রাখতেন এবং নিয়মতন্ত্রের সন্ধানে সব কিছুরই বিচার করে দেখেছেন। ঠিক বেকনের মতোই রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞানকে অবলম্বন করে বৃহত্তর নিয়মের সন্ধান করেছেন—

"So Bacon runs from field to field pouring the seed of his thought into every Science. At the end of his Survey he comes to the conclusion that science by itself is not enough; there must be a force and discipline outside the sciences to coordinate them and point them to a goal. He condemns the habits of looking at isolated facts out of their context without considering the unity of nature."[১৪]

মধ্যযুগীয় রহস্যবোধ সংস্কার অলৌকিক যুক্তিহীন বিশ্বাসের স্থানে যুক্তি-বোধ্য নিয়মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা আধুনিকতার সর্বপ্রধান লক্ষণ। বেকনের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির পরিণামে নিয়মতন্ত্রের প্রতি গভীর আস্থা পরবর্তী শতাব্দীর চিন্তাধারাকে শাসন করে এসেছে। এই নিয়মনিষ্ঠা শেষ পর্যন্ত যদিও একটা যান্ত্রিক অভ্যাসের মতোই হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তথাপি এর ফলে চিন্তার যে পরিচ্ছন্নতা এবং বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি লাভ করা গিয়েছে তার মূল্য কম নয়। পজিটিবিজ্‌ম্ হচ্ছে প্রত্যক্ষ জীবনচিন্তা আর ইউটিলিটারিয়ানিজ্‌ম্ হচ্ছে নীতি-বোধের যুক্তিবদ্ধ মানদণ্ড। বাংলাদেশের আধুনিক যুগের আরম্ভ থেকেই রহস্যবর্জিত যুক্তিধর্মের প্রতি একান্ত আনুগত্য এবং তারই স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবে প্রত্যক্ষতাবাদ এবং উপযোগিতাবাদকে গ্রহণ আমাদের আধুনিক ভাবনার নিশ্চিত প্রমাণ। মিস্‌টিসিজ্‌ম্‌কে বর্জন করে বিশ্বজগৎকে নিয়ম-

---

১৩ Will Durant, *The Story of Philosophy*, Chapter III, Advancement of Learning.

১৪ পূর্বোক্ত গ্রন্থ ও অধ্যায়।

শাসিত করে দেখতে গিয়ে 'প্রাকৃতিক নিয়ম'-তত্ত্বের উদ্ভব।[১৫] উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যে ও মননে প্রাকৃতিক নিয়মের আধিপত্য বিশেষ করেই লক্ষ্য করবার বিষয়।

রামেন্দ্রসুন্দর 'জিজ্ঞাসা'য় পূর্বসংস্কারমুক্ত হলেও এই সংস্কার তাঁর ছিল—যদি এই নিয়মপ্রীতিকে সংস্কার বলা যায়। 'নিয়মের রাজত্ব' নামক সুপরিচিত প্রবন্ধটিতে তিনি তাঁর এই বিশ্বাসকেই বুঝিয়ে বলেছেন, যদিও লঘুভঙ্গিতে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে ইতিহাস-ব্যাখ্যায়, সমাজ-ব্যাখ্যায়, সাহিত্য-ব্যাখ্যায়, ধর্ম-ব্যাখ্যায় প্রাকৃতিক নিয়মতত্ত্বের যে-অপ্রতিহত প্রভাব পড়েছিল[১৬] তার চূড়ান্ত রূপ হচ্ছে এই প্রবন্ধটি। তাঁর পরিহাসপূর্ণ বক্তব্যভঙ্গিতেই বোঝা যায় এতে মানুষের চিরকালীন জ্ঞানের সীমা নির্দিষ্ট হয়েছে কিনা তাতে তাঁর নিজেরও সংশয় আছে।

"যাহা দেখিব, তাহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। যাহা এ পর্যন্ত দেখি নাই, তাহা নিয়ম নহে বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি; কিন্তু যে কোন সময়ে তাহা অজ্ঞাতপূর্ব ঘটনা ঘটিয়া আমার নির্ধারিত প্রাকৃতিক নিয়মকে বিপর্যস্ত করিয়া দিতে পারে। কাজেই এটা প্রাকৃতিক নিয়ম, ওটা নিয়ম নহে, ইহা পুরা সাহসে বলাই দায়।"[১৭]

কিন্তু ব্যাবহারিক জগতে প্রাকৃতিক নিয়মের চেয়ে সত্য কিছু নেই। তিনি বলেন—

"বাহ্যজগৎকে দেশে সাজাই ও কালে সাজাই; এবং উভয়ের মধ্যে উক্তরূপ সুবিহিত ব্যবস্থা রাখিয়া সাজাই। এই ব্যবস্থা আমার চেতনার কারিকরি এবং এই ব্যবস্থার নাম প্রাকৃতিক নিয়ম। প্রকৃতিতে বা বহির্জগতে নিয়মের শৃঙ্খলা কেন? জগৎ নিয়মতন্ত্র রাজ্য কেন? কেননা, আমিই নিয়মের প্রতিষ্ঠাতা।

নিয়মের প্রতিষ্ঠায় আমার চেতনার বিকাশ ও জ্ঞানের প্রসর; সেই

---

১৫ দ্রষ্টব্য অক্ষয়কুমার দত্ত 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার', ১ম ভাগ, 'প্রাকৃতিক নিয়ম' অধ্যায়।

১৬ বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদেশের কৃষক', 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রভৃতি প্রবন্ধ, ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'সামাজিক প্রবন্ধ', রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় চন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতির প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

১৭ নিয়মের রাজত্ব ১৩০৬।

নিয়মের প্রতিষ্ঠাতেই আমার আনন্দ ও শান্তি; নিয়মের প্রতিষ্ঠাই আমার স্বভাব। যাহা নিয়মের ভিতরে এখনও আইসে নাই, তাহা আমার কেমন কেমন অসঙ্গত ঠেকে; তাহাকে দৈব বলি, অতিপ্রাকৃত বলি, মিরাকল বলি। তাহার জন্য ভূতপ্রেতপিশাচের, দেবতা-উপদেবতার কল্পনা করি। তাহার জন্য আমাছাড়া জগৎছাড়া সৃষ্টিছাড়া একজন সৃষ্টিকর্তার ও বিধাতার কল্পনা করি।

যাহাতে এখনও নিয়ম দেখিতে পাইতেছি না, তাহাকে নিয়মের অধীনতায় আনিবার জন্যই আমার চেষ্টা। সর্বত্র যে আমি কৃতকার্য হইয়াছি, তাহা নহে; তবে ইহার সফলতা ধরিয়া আমার আত্মবিকাশের পরিমাণ। ইহার নাম বিজ্ঞানচর্চা— যাহার ফলে জ্ঞানের উন্নতি বা বিকাশ।"[১৮]

এইখানেই রামেন্দ্রসুন্দরের আধ্যাত্মিক সঙ্কট বা দ্বন্দ্বের মূল। উনবিংশ শতাব্দীর ঐতিহ্যে এবং পাশ্চাত্ত্যের পূর্ববর্তী শতাব্দীর লব্ধ বিশ্বাসের ফলে জগতে নিয়মের একাধিপত্যে তাঁর স্বাভাবিক বিশ্বাস আছে। কার্যকারণবাদ ও ল অফ ইউনিফরমিটি অফ নেচার— এই দুটি প্রধান নিয়মসূত্র পাশ্চাত্য চিন্তাধারাকে শাসন করে এসেছে। ডারউইনের বিবর্তনবাদ তারই ফল। রামেন্দ্রসুন্দর সর্বত্রই এই নিয়মের প্রতিষ্ঠা আকাঙ্ক্ষা করেন, কার্যকারণ দিয়ে ব্যাখ্যা চান। কিন্তু সৃষ্টির কতকগুলি স্থল যেন এই নিয়মসূত্র দিয়েও ঠিক বোঝানো যায় না। মানুষের সুখ দুঃখের পুরোপুরি সংজ্ঞা নির্ধারণ এই সূত্র দিয়ে করে চলে না। এই জন্যই কখনও কখনও এই রকম সত্যের নির্বিশেষত্বে সন্দেহ এসে পড়ে। জগতে এমন ক্ষেত্র আছে, এমন সম্ভাবনা আছে যেখানে এসব নিয়মের আলো পড়ে না। কিন্তু সে জন্য, বলাই বাহুল্য, রামেন্দ্রসুন্দর কোনোরকম অলৌকিক মিসটিক ব্যাখ্যার দিকে ঝুঁকতে একেবারেই অসম্মত। এই সংশয় বা দ্বিধাই 'জিজ্ঞাসা'র মূলে। রামেন্দ্রসুন্দরের নাস্তিকত্বের মূল্য এখানেই।

প্রসঙ্গত আর-একটি কথাও বলা দরকার। রামেন্দ্রসুন্দর নিয়মের কথা বলতে গিয়ে মাঝে মাঝেই এ কথা বলেছেন যে এসব শেষ পর্যন্ত ব্যাবহারিক সত্য মাত্র। উপরের উদ্ধৃতিতেই এর আভাস আছে। এই কথাটাই তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন অন্যত্র—

"যাহাতে বিশ্বাস না করিলে জীবনযাত্রা চলে না বা নিজের অস্তিত্ব টিকে না, তাহাকেই আমরা সত্য বলি। কিন্তু এই শ্রেণীর সত্য আপেক্ষিক বা ব্যাবহারিক

---

১৮ সৃষ্টি ১৩০০।

সত্য। মনুষ্যের যাবতীয় বিজ্ঞান এই ব্যাবহারিক সত্য লইয়াই কারবার করে। জগদযন্ত্রের গতির পর্যালোচনা করিয়া এই সকল সত্যের আবিষ্কার করিতে হয়। অর্থাৎ ভূয়োদর্শন দ্বারা এই সকল সংকীর্ণ প্রাকৃতিক সত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ভূয়োদর্শন যত বাড়ে এই সকল সত্যের মূর্তিও তেমনই পরিবর্তিত হয়। চিরকাল এক মূর্তি থাকে না। এই সকল সংকীর্ণ অলৌকিক সত্যের মধ্যে আবার সবচেয়ে ব্যাপক সত্য প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা।"[১৯]

সত্যের যে ব্যাবহারিক এবং আপেক্ষিক রূপ আছে, এ-কথাটা প্রাচীন দর্শনে স্থান পেলেও এই ব্যাবহারিক সত্যের উপর এতখানি আস্থা বা নির্ভর আর কোনো যুগে দেখা যায় নি। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী চিন্তায় সত্যের এই নতুন ধারণা অনেক বিপ্লব নিয়ে এসেছিল। ব্যাবহারিক জীবন এবং ব্যাবহারিক সত্য নির্বিশেষ সত্যের স্থান অধিকার করল। ফলে ব্যাবহারিক জীবনকে পূর্ণাঙ্গ ও সুন্দর করে তোলার দিকে যেমন আগ্রহ দেখা দিল তেমনি এর বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি এবং বিচার আমাদের সমগ্র চিন্তাকে আকর্ষণ করে নিল। রামেন্দ্রসুন্দর নির্বিশেষ সত্যের সম্ভাবনাকে অস্বীকার করেন নি, ব্যাবহারিক সত্যের অনুসন্ধানই তাঁর ছিল প্রধান কাম্য। আধ্যাত্মিক ও ব্যাবহারিক সত্যের দুই রূপকে আলাদা করে নেওয়াই আধুনিক যুগের চিন্তার লক্ষণ। আধুনিক মনন-রীতিতে বেকনের এটাই একটা বড়ো দান—

"He is concerned to insist that Truth is *twofold.* There is truth of religion and truth of science ; and these different kinds of truth must be kept separate."[২০]

এতকাল এই সত্যকে পৃথক করা হয় নি। ধর্মের সত্য বা শাস্ত্রের সত্য দিয়ে আধুনিক জীবনের জটিলতা এবং বৈচিত্র্যকে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। এ কথা উপলব্ধি না করা পর্যন্ত জীবনের অগ্রগতিও সম্ভব নয়। আধুনিক শিক্ষার উদ্দেশ্যই হচ্ছে বিভিন্ন সত্যের সঙ্গে পরিচয়-সাধন করানো। প্রত্যক্ষ জগতের বিভিন্ন দিকের সত্যগুলিকে উদ্‌ঘাটন করাই আধুনিক মনন-বিদ্যার কাজ। আধুনিক কালে সমাজতত্ত্ব ইতিহাস ভূতত্ত্ব পদার্থতত্ত্ব জীববিদ্যা উদ্ভিদতত্ত্ব মনস্তত্ত্ব শারীরতত্ত্ব প্রভৃতি বহুবিধ শাস্ত্রের বহুবিধ সত্যকে আবিষ্কার সত্যের বৈচিত্র্যকে আমাদের কাছে তুলে ধরেছে। সত্যকে একটি মাত্র জেনে

---

১৯ সত্য ১৩০০।

২০ Basil Willey, *The Seventeenth Century Background*, Chapter 2, Twofold Truth।

নিশ্চিন্ত হওয়া এখন অসম্ভব। যাই হোক সত্য প্রত্যক্ষ জগতের এবং বহুবিধ— আধুনিক বাংলার মননধারার এই উপলব্ধি নৈতিক বিচারে যে বিপ্লব উপস্থিত করেছিল বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের স্মরণীয় বিতর্কে সে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।[২১]

সত্যের বহু বিচিত্র রূপকে জানা, জগতের বিন্যাসকৌশল এবং শৃঙ্খলা-রীতিকে জানা, রামেন্দ্রসুন্দরের মতে এটাই হচ্ছে জ্ঞানের লক্ষণ। জীবপর্যায়ে উন্নত সেই, যে জ্ঞানী, মনুষ্যত্বের পূর্ণতা তারই। জ্ঞানের মহিমায় রামেন্দ্রসুন্দর এমনই বিশ্বাসী ছিলেন যে তিনি হৃদয়ধর্মকে আলাদা কিছু বলে ভাবেন নি। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর এখানে বোধহয় একটা বড়ো পার্থক্য। রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধির চর্চাকে এক সময়ে অনুভূতি-বিস্তারের পক্ষে বাধাই মনে করেছেন।[২২] রামেন্দ্রসুন্দর মনে করেছেন যথার্থ জ্ঞানই হৃদয়ধর্মকে জাগ্রত করে। এ বিষয়ে তাঁর যুক্তি অভিব্যক্তিবাদের উপরেই নির্ভরশীল। জীবপর্যায়ে যে যত উন্নত, সে তত বিশ্বজগতের অন্তঃস্থলে দৃষ্টি প্রেরণ করতে পারে, অনুভবশক্তি তার ততই বৃদ্ধি পায়। তিনি বলেন—

"জ্ঞান ধর্ম, তাহারা ত অন্তর্দৃষ্টির প্রসর বাড়াইয়া অনুভূতির তীক্ষ্ণতা জন্মাইয়া দুঃখভোগেরই সুবিধা করিয়া দেয়। যে জ্ঞানী, যে ধার্মিক, তাহার দুঃখভোগশক্তি অধিক; তাহার দুঃখও অধিক। মানুষেরই ত দুঃখ, কাঠ পাথরের আবার দুঃখ কি?"[২৩]

সুখ-দুঃখের এই তত্ত্ব সেকালের সাহিত্যে একটা প্রধান ভাবনা ছিল। সুখ কি, দুঃখের সঙ্গে তার সম্পর্ক কি— এ চিন্তা মনীষীদের মনে এসেছে। বঙ্কিম-চন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলিতে মধুসূদনের মহাকাব্যে দুঃখবোধের ছায়া গভীর। অক্ষয়কুমার দত্তের চিন্তায় বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মতত্ত্বে সুখ-দুঃখের তত্ত্বপর্যালোচনা স্মরণীয়। থিয়োরির দিক দিয়ে সংজ্ঞা এই ছিল যে চিত্তবৃত্তির সামঞ্জস্যসাধনই মনুষ্যত্ব এবং মনুষ্যত্বই সুখ। বঙ্কিমচন্দ্র চন্দ্রশেখর উপন্যাসে রামানন্দস্বামী-চন্দ্রশেখরের কথোপকথনে সুখ-দুঃখের দার্শনিক আলোচনা করেছেন।[২৪] সেখানেও রামানন্দস্বামী মনুষ্যত্ব-সাধনের উপদেশ দিয়েছেন। কিন্তু উপন্যাসে

---

২১ এই প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনার জন্য বর্তমান লেখকের 'চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র' (২য় সং ১৯৭৩) পৃ ১৭৭-১৮২ দ্রষ্টব্য।

২২ দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রনাথের 'পঞ্চভূত' 'মন', 'অখণ্ডতা' প্রভৃতি রচনা।

২৩ সুখ না দুঃখ। ১২৯৯।

২৪ চন্দ্রশেখর ৩ খণ্ড ১ পরিচ্ছেদ।

এটা হল নীতিনির্দেশ, দুঃখপরিহারের উপায়। রামেন্দ্রসুন্দর নীতির দিক থেকে একে দেখেন নি, জ্ঞানের দিক থেকে দেখেছেন। দুঃখ জগতের মূল সত্য কেননা জ্ঞানের তৃপ্তি নেই, অনুভব-শক্তিরও তৃপ্তি নেই। কথাটা বোধহয় ঠিক। মানুষের বিচরণক্ষেত্র যত বিস্তীর্ণ আকাঙ্ক্ষা ততই সীমাহীন। উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যে দুঃখের সুর সর্বব্যাপী হয়ে ওঠার কারণ তাই। বাংলার আধুনিক চিত্তোন্মেষের সঙ্গে হৃদয়ধর্মের বিকাশও এক সঙ্গেই হয়েছিল।

বাঙালির মননধারায় 'জিজ্ঞাসা'র আর-একটি বড়ো দান আছে, আধুনিক মননপদ্ধতির সঙ্গে বৈদান্তিক মননপদ্ধতির সমন্বয়সাধন। ইতিপূর্বে এ-চেষ্টা হয় নি। রামমোহনের সময় থেকে বেদান্তের প্রসঙ্গ বারবার উত্থাপিত হয়েছে। রামমোহনে অদ্বৈতবাদের আভাস কিছু কিছু পাওয়া গেলেও সে ছিল তাঁর অধ্যাত্মচিন্তার অঙ্গ। অদ্বৈতবাদী চিন্তা যে মানুষকে নিরুদ্যম করে লোক-কল্যাণে উদাসীন করে রামমোহন স্পষ্টত সে কথা না বললেও আমহার্স্টের কাছে লেখা চিঠিতে তার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। এই বিষয়টাই খ্রীষ্টান মিশনারীদের একটি প্রধান বক্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল।[২৫] দেবেন্দ্রনাথও অদ্বৈতবাদকে স্বীকার করেন নি। তিনি ছিলেন ভক্ত উপাসক। অধ্যাত্মসাধনার পক্ষে প্রয়োজন ছিল দ্বৈতবাদকেই অবলম্বন করা। কেশবচন্দ্রও ছিলেন ভক্ত সাধক। এঁরা সকলেই ছিলেন সংস্কারক, ইহজীবনকে তাঁরা জ্ঞানীর দৃষ্টিতে নিস্পৃহচিত্তে দেখেন নি। অক্ষয়কুমার বঙ্কিমচন্দ্র ভূদেব ছিলেন তাত্ত্বিক। অক্ষয়কুমার বঙ্কিমচন্দ্র দুজনেই পাশ্চাত্য মনীষীদের দ্বারাই পরিপূর্ণভাবে প্রভাবিত। ভূদেবের মনীষাও ছিল আধুনিক যুক্তিবাদে প্রতিষ্ঠিত যদিও বেদান্তের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল স্পষ্ট। ভূদেবের 'সামাজিক প্রবন্ধ' সমাজ ও ব্যক্তির ব্যাবহারিক সম্পর্ক নিয়ে ইতিহাস এবং সমাজতত্ত্বের ভিত্তিতে নৈতিক বিচার। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কতকগুলি দার্শনিক প্রবন্ধ রচনা করেছেন বেদান্তের আলোচনা করে।[২৬] বস্তুত ব্রাহ্মসমাজের উপনিষদ চর্চার ফল হিসাবে এই সম্প্রদায়ভুক্ত কয়েকজন বেদান্তের সম্বন্ধে দার্শনিক আলোচনা করেছিলেন সত্য,[২৭] কিন্তু যে-অর্থে রামেন্দ্রসুন্দর আধুনিক এবং সজীব মননরীতির সঙ্গে বৈদান্তিক সিদ্ধান্তের

২৫ দ্রষ্টব্য **Alexander Duff**, ***India and India Mission***, **1840.**

২৬ অদ্বৈতমতের সমালোচনা ১৮৯৬, অদ্বৈতমতের প্রথম ও দ্বিতীয় সমালোচনা ১৮৯৭, সারসত্যের আলোচনা ১৯০১।

২৭ বিশেষত 'ভারতী' পত্রিকায় এ শ্রেণীর দার্শনিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হত।

সমন্বয় করেছিলেন সে-অর্থে এঁরা বেদান্তের আলোচনা করেন নি। এঁদের আলোচনা পুঁথিগত এবং শাস্ত্রানুগ। বিশেষত দ্বিজেন্দ্রনাথও ছিলেন ভক্তিবাদী। বস্তুত অদ্বৈতবাদের সঙ্গে লোকাশ্রয়কে মিলিয়েছিলেন একজনাই। তিনি স্বামী বিবেকানন্দ। কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দরের মতো শুধুই জ্ঞানী তিনি ছিলেন না। বিবেকানন্দ ছিলেন একাধারে কর্মী জ্ঞানী এবং প্রেমিক। তাঁর বস্তুজিজ্ঞাসা ছিল বহুর কল্যাণকামনারই ফল।

রামেন্দ্রসুন্দর ছিলেন বিশুদ্ধ জ্ঞানসাধক। জীবন জগৎ সমাজ সম্বন্ধে তাঁর কোনো নৈতিক আদর্শ প্রচার নেই। তিনি বস্তুজগৎকে বিশ্লেষণ করেছেন, নিয়ম বের করবার চেষ্টা করেছেন ; বারবার বলেছেন, এ নিয়ম-রচনা নেহাৎই ব্যাবহারিক অর্থাৎ একটা নিয়মে অভ্যস্ত না হলে জীবনরক্ষা হয় না সেইজন্যই নিয়ম মানতেই হয়। এই ব্যাবহারিক (pragmatic) সত্যটিকে যে বের করে সে 'আমি' অর্থাৎ জ্ঞানময় চিৎসত্তা। এর কাজই জগৎকে সুবিন্যস্ত সুশৃঙ্খল করে দেখা। রামেন্দ্রসুন্দর এই আত্মার নিয়ম-রচনার আনন্দকেই অন্যনিরপেক্ষ মূল্য দিয়েছেন, যদিও এই নিয়মের কোনো নির্বিশেষ (absolute) মূল্য নেই। কেননা প্রতি মুহূর্তেই নিয়মের পরিবর্তিত হওয়ার সম্ভাবনা থেকেই যাচ্ছে। যার সম্বন্ধে শেষ পর্যন্ত সংশয় করা যায় না, সে হচ্ছে এই আত্মা বা জ্ঞানময় সত্তা। জগৎ আপেক্ষিক, জগতের নিয়ম আপেক্ষিক— এই সিদ্ধান্ত করতে রামেন্দ্রসুন্দরকে দার্শনিক উপমা বা যুক্তির আশ্রয় নিতে হয় নি, বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত দিয়েই তিনি সপ্রমাণ করেছেন। জগৎকে আপেক্ষিক বললেও জগতের বিশ্লেষণ করতেই যার আনন্দ সেই জ্ঞানময় সত্তাকে তিনি আপেক্ষিক বলতে পারেন নি।—

"জগতে যতগুলা সত্য মানিতে হয়, তার মধ্যে একটা সত্য সকলের উপর সত্য। আর সকলই তার নীচে। আমি আছি, ইহা অপেক্ষা সত্য কথা আর দ্বিতীয় নাই। যাবতীয় বিজ্ঞানের প্রথম স্বতঃসিদ্ধ এই। জীবনযাত্রার আরম্ভ এই সত্যে— বিশ্বাসে। যদি কোন সত্যকে নিরপেক্ষ ধ্রুব সত্য বলিতে হয়, তাহা এই সত্য। বস্তুতঃই ইহা পারমার্থিক সত্য।"[২৮]

ডেকার্ট এই যুক্তি দিয়েই পাশ্চাত্যে র‍্যাশনালিজমের সূত্রপাত করেছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দরের চিন্তায় বেদান্তের অদ্বৈতবাদের সঙ্গে ডেকার্টের যুক্তি সমন্বিত। তাঁর 'বিচিত্রজগতে'র মননধারার পূর্বাভাস ছিল এখানেই।

চতুষ্কোণ, শ্রাবণ ১৩৭৩।

২৮ সত্য ১৩০০।

দীনেশচন্দ্র ও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস চর্চার প্রথম যুগ

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' নামে সুপরিচিত বইখানা প্রকাশিত হলে সকলেই খুব বিস্মিত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এই বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণের (১৯০১) সমালোচনা-উপলক্ষে লিখেছিলেন—

"এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ যখন বাহির হইয়াছিল তখন দীনেশবাবু আমাদিগকে বিস্মিত করিয়া দিয়াছিলেন। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য বলিয়া এতবড়ো একটা ব্যাপার আছে তাহা আমরা জানিতাম না; তখন সেই অপরিচিতের সহিত পরিচয়স্থাপনেই ব্যস্ত ছিলাম।"

বাংলা সাহিত্যের এই প্রথম ইতিহাসখানা রচিত হওয়ার আগে এই বিষয় নিয়ে যে সব কাজ হয়েছে অথবা বই লেখা হয়েছে সেগুলি পর্যালোচনা করলে দীনেশচন্দ্রের অসীম কৃতিত্ব যেমন বোঝা যায়, তেমনি বোঝা যায় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার খণ্ড ও বিচ্ছিন্ন প্রয়াস কি ভাবে দীনেশচন্দ্রের উদ্যমে সংহত রূপ লাভ করেছিল। ইংরেজ শাসনকালীন বাংলা সাহিত্যের তথ্যগত ইতিহাস রচনা কঠিন ছিল না। যাঁরা এই ইতিহাসের বিষয় তাঁরা অনেকেই জীবিত ছিলেন, ছাপাখানার কল্যাণে তাঁদের বই প্রচলিত ছিল। কিন্তু কঠিন ছিল মধ্য ও প্রাচীন যুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করা, যার প্রায় সব উপকরণই ছিল পুথিতে বদ্ধ। মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলনে এবং শিক্ষাবিস্তারের পদ্ধতি পরিবর্তিত হয়ে যাওয়ায় মধ্যযুগের বাংলা পুথি অপ্রচলিত হয়ে পড়ে। মুকুন্দরাম ভারতচন্দ্র কৃষ্ণদাস-কবিরাজ বা বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতি কয়েকজন কবির নাম ছাড়া আর কারো নামই প্রায় এ যুগের শিক্ষিত বাঙালির জানা রইল না। ১৯০১-এ অক্ষয়চন্দ্র সরকার উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের গোড়ার দিকের কথা বলতে গিয়ে বলেছিলেন—

"ত্রিশ সালে অর্থাৎ এখন হইতে আশী বৎসর পূর্বে বাঙ্গালা লেখার চর্চা ছিল, গুরু মহাশয়ের পাঠশালে ব্যবসাদারের খাতায় আর আত্মীয় স্বজনকে 'বন্ধুবান্ধবকেও নয়' পত্র লেখায়; পড়ার চর্চা যথেষ্ট ছিল। কেবল পাঠশালে বলিয়া নয়, সকলেই রামায়ণ মহাভারত পাঠ করিত। বৃদ্ধ গঙ্গাতীরে ঘাটে বসিয়া, মুদি মুদিখানার পাটে বসিয়া, পুরোহিত ঠাকুর শিবের মন্দিরের ধারিতে

বসিয়া, মোসাহেব মুকুয্যে মহাশয় বড় মানুষের বৈঠকখানায় বসিয়া অবাধে দশ বারোজন শ্রোতৃমণ্ডলির মধ্যে, কৃত্তিবাস, কাশীদাস পাঠ করিতেন। গোস্বামী ঠাকুর বিষ্ণুমন্দিরের দাওয়ায় বাবাজী ঠাকুর আকড়ায় আঙ্গিনার বৃক্ষতলে, বৈষ্ণব গৃহস্বামী পূজার দরদালানে, সেইরূপ শ্রোতৃমণ্ডলি মধ্যে চৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিতেন। এতদ্ভিন্ন কবিকঙ্কণের চণ্ডী, রামেশ্বরের শিবায়ন, ঘনরামের ধর্মমঙ্গল, দুর্গাপ্রসাদের গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিনী প্রভৃতি গ্রন্থ এইরূপই নিয়ত পঠিত হইত।"[1]

ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এগুলিই ছিল প্রচলিত সাহিত্য। পাদ্রী ওয়ার্ড লিখেছিলেন সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ ও শূদ্রগণ অনেকেই দেশীয় ভাষায় রচিত রামায়ণ মহাভারত বিদ্যাসুন্দর এবং চণ্ডীর পুথি রাখে। কোনো কোনো বাড়িতে মনসাগীত ধর্মগীত শিবগীত ষষ্ঠীগীত পঞ্চাননগীত এসবও থাকে। বৈরাগী এবং অন্যান্য সাধারণ জনসম্প্রদায়ের মধ্যে ছোটো ছোটো কাহিনী চলিত আছে যেগুলি ইংরেজি ভাষার উপকথা বা গাথার চেয়ে বিশেষ উন্নত নয়। এই সব অকিঞ্চিৎকর বিষয়গুলির উপজীব্য নানা পৌরাণিক কাহিনী সাধু সন্ন্যাসীর অলৌকিক কীর্তি অথবা দেবতার মাহাত্ম্য-বর্ণনা। কখনও কখনও নীতিমূলক গল্পও পাওয়া যায়, তবে অধিকাংশই কৃষ্ণলীলা বিষয়ের গল্প।[2]

তারপর মুদ্রিত গ্রন্থের প্রচারের ফলে এবং ইংরেজি সাহিত্যের আদর্শে রচিত বাংলা সাহিত্যের ব্যাপক প্রবর্তনে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলার সাহিত্য শিক্ষিত সমাজের অন্তরালে চলে যেতে থাকে। দীনেশচন্দ্রের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' রচনার পূর্বে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস যতটুকু আলোচিত হয়েছিল, তাতে কোথাও এইসব সুপরিচিত গ্রন্থ ছাড়া অন্যগুলির উল্লেখ দেখি নি। এই অপরিচয়ের অন্তরাল থেকে দীনেশচন্দ্র বাংলা সাহিত্যকে উদ্ধার করেছিলেন। ইংরেজি শিক্ষা দেশের মধ্যে শিক্ষিত এবং অশিক্ষিতের মধ্যে দুরপনেয় ব্যবধানের সৃষ্টি করেছিল। দীনেশচন্দ্রের প্রয়াস ছিল দুয়ের মধ্যে নতুন করে যোগ স্থাপন করা। এ চিন্তা ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্কিমচন্দ্র-প্রমুখ মনীষীরা করে গিয়েছেন।

---

১ 'বঙ্গভাষার লেখক' (১৯০১) গ্রন্থে পিতাপুত্র প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

২ *History, Literature, Manners etc. of the Hindoos* (1820) Part III, p 502 দ্রষ্টব্য।

বঙ্গদর্শন পত্রিকার 'পত্রসূচনা'য়, 'লোকশিক্ষা' প্রভৃতি প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র যে সমস্যার অবতারণা করেছিলেন দীনেশচন্দ্র বাংলার নিজস্ব অন্তরলোকের সাহিত্যের বিস্তৃত পরিচয় শিক্ষিত সমাজের কাছে তুলে ধরে সেই সমস্যার একটা মীমাংসার পথ প্রদর্শন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণে' (১৩১১) বলেছিলেন—

"পূর্বে ইংরেজি শিক্ষা আমাদের দেশে প্রাচীন নবীন, শিক্ষিত অশিক্ষিত, উচ্চ নীচ, ছাত্র ও সংসারীর মধ্যে যে একটা বিচ্ছেদের সৃষ্টি করিয়াছিল এখন তাহার উল্‌টা কাজ আরম্ভ হইয়াছে, এখন আবার আমরা নিজেদের ঐক্যসূত্র সন্ধান করিয়া পরস্পর ঘনিষ্ঠ হইবার চেষ্টা করিতেছি। মধ্যকালের এই বিচ্ছিন্নতাই পরিণামের মিলনকে যথার্থভাবে সম্পূর্ণ করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই মিলনের আকর্ষণেই আজ বঙ্গভাষা বঙ্গসাহিত্য আমাদের ইংরেজি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকেও আপন করিয়াছে।"

মনে রাখা দরকার রবীন্দ্রনাথ বাংলাভাষা ও সাহিত্যের এই মহৎ দায়িত্বের কথা উল্লেখ করছেন দীনেশচন্দ্রের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের বিস্তৃত সমালোচনা লেখার পরে। এই প্রবন্ধে তিনি আরো বলেন—

"আমরা ইতিহাস পড়ি— কিন্তু যে ইতিহাস আমাদের দেশের জনপ্রবাহকে অবলম্বন করিয়া প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছে, যাহার নানা লক্ষণ নানা স্মৃতি আমাদের ঘরে বাহিরে নানা স্থানে প্রত্যক্ষ হইয়া আছে, তাহা আমরা আলোচনা করি না বলিয়া ইতিহাস যে কী জিনিস তাহার উজ্জ্বল ধারণা আমাদের হইতেই পারে না। আমরা ভাষাতত্ত্ব মুখস্থ করিয়া পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকার করি, কিন্তু আমাদের নিজের মাতৃভাষা কালে কালে প্রদেশে প্রদেশে কেমন করিয়া যে নানা রূপান্তরের মধ্যে নিজের ইতিহাস প্রত্যক্ষ নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে তাহা তেমন করিয়া দেখি না বলিয়াই ভাষারহস্য আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হইয়া উঠে না।"

এই কথাগুলি পড়লে মনে হয়, এ যেন দীনেশচন্দ্রের উদ্যমেরই তাৎপর্য-বিশ্লেষণ। বস্তুত দীনেশচন্দ্রের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' মধ্যযুগের বঙ্গসাহিত্য সম্বন্ধে তথ্য সংকলন মাত্র নয়, এর পটভূমিতে ছিল দেশ এবং জাতির প্রতি গভীর মমতাবোধ, একটি গঠনাত্মক দৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথ যখন স্বদেশী সমাজের পরিকল্পনা করেছিলেন, দেশ এবং জাতি সম্বন্ধে এমনি একটি মমতা এবং আদর্শ ই ছিল

তার মূলে। তুলনা হিসাবে বলা যায়, বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' যেমন শুধুই মহাভারত নিয়ে পণ্ডিতী গবেষণা নয়, এর প্রেরণায় ছিল আর-একটি গঠনাত্মক আদর্শ, 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' তেমনি শুধু গবেষণা নয়, তার চেয়েও বেশি।

তথাপি এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে ইতিহাস বলতে মূলত যে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণাকে বোঝায়, উনবিংশ শতাব্দীতে রচিত বাংলা সাহিত্যের বিষয়ে এই বইখানাই ছিল তার সুপরিণত সর্বোৎকৃষ্ট রূপ। সাহিত্যের ইতিহাস রচনার চেষ্টা আগেও হয়েছে। কিন্তু এতখানি পূর্ণতা কোনোটাতেই ছিল না। 'ইতিহাস' কথাটির মধ্যেই নিহিত ধারাবাহিকতার অর্থ। অতীতের ঘটনাগুলিকে ধারাবাহিক ক্রমে দেখাতে না পারলে তারা ঠিক ইতিহাস-পদবাচ্য হয় না। যুক্তি এবং কার্যকারণের সূত্রটি স্পষ্ট করে দেখাতে হয়; পারিপার্শ্বিক দেশকালের যথার্থ পরিপ্রেক্ষিকায় স্থাপন করে তবেই ইতিহাসের পূর্ণ রূপ গঠন করতে হয়। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' রচিত হওয়ার পূর্বে যে কয়খানি বাংলা সাহিত্য-বিষয়ে বই লেখা হয়েছিল, তার কোনোটাতেই এই আদর্শের সিদ্ধি ছিল না।

বাংলা সাহিত্যের অতীতকে রক্ষা করবার প্রথম চেষ্টা যিনি করেছিলেন তিনি কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। ১৮৫৩ থেকে ১৮৫৫-র মধ্যে ঈশ্বর গুপ্ত 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রাচীন কবি ও কবিওয়ালাদের জীবনী প্রকাশ করেছিলেন, তাঁর পরোক্ষ উদ্দেশ্য ছিল সাহিত্যের একটা যুগের ইতিহাসকে রক্ষা করা। এই যুগ হচ্ছে অষ্টাদশ শতাব্দী, এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পচিশ বৎসর। প্রধানত শাক্তসঙ্গীত-রচয়িতা এবং কবিওয়ালাদের উল্লেখ করলেও অন্যান্য সাহিত্যধারার মধ্যে "কবিকঙ্কণ, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, বিদ্যাধর (?), কাশীদাস, কীর্তিবাস, কেতকী দাস, রামেশ্বর"— এঁদের জীবনী ও কীর্তি প্রকাশ করার অভিপ্রায় তাঁর ছিল। কার্যত তিনি পেরেছিলেন ভারতচন্দ্র রামপ্রসাদ নিধুবাবু রামবসু হরুঠাকুর নিত্যানন্দ বৈরাগী রাসু-নৃসিংহ লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কয়েকজনের আলোচনা করতে। সুতরাং আলোচনার ব্যাপকতা বিচার করলেও ঈশ্বর গুপ্তের প্রয়াস পূর্ণাঙ্গ নয়। ইতিহাস হিসাবে অপূর্ণতার আরো লক্ষণ ছিল। এ যুগের কবিদের আলোচনায় ব্যাপৃত হতে গিয়ে, যুগের অনেক ঘটনার উল্লেখ প্রাসঙ্গিক হলেও পারিপার্শ্বিক জীবন ও সমাজের সঙ্গে যোগকে স্পষ্ট করে তুলতে পারেন নি। সে রকম চেষ্টার আভাস যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় নি, তা নয়। যেমন ভারতচন্দ্রের প্রসঙ্গে তিনি বলছেন—

"এই মহাশয় অন্নদামঙ্গল রচনার পূর্বে কিম্বা পরে যে সকল ভাষা কবিতা রচনা করিয়াছেন, অন্নদামঙ্গলের সহিত তাহার তুলনা কোন ক্রমেই হইতে পারে না। ইহাতে বিশিষ্টরূপেই প্রমাণ হইতেছে যে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভার আশ্রয় লওয়াতেই নানাকারণে এই অন্নদামঙ্গল অনেক প্রকারে দোষশূন্য ও প্রকৃষ্ট হইয়াছে..."

এখানে ঈশ্বর গুপ্ত ভারতচন্দ্রের কবিমনের সঙ্গে পারিপার্শ্বিকের যোগ নির্ণয় করবার চেষ্টা করেছেন। এই প্রয়াস ইতিহাসকারেরই প্রয়াস। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের আলোচনায় এই কার্যকারণ নির্ণয়ের চেষ্টা তেমন সুলভ নয়।

কিন্তু এতে ঈশ্বর গুপ্তের উদ্যমের মৌলিক অগ্রগামিত্ব, তাঁর অসাধারণ নিষ্ঠা ও গবেষণার মূল্য কিছুমাত্র অস্বীকৃত হচ্ছে না। তিনি বলেছিলেন—

"ইহার পূর্বে কোন মহাশয় এতদ্দেশীয় কোনো কবির জীবনচরিত প্রকাশ করেন নাই— এবং এতৎ প্রকাশের কি ফল তাহাও কেহ জ্ঞাত হয়েন নাই— আমরা প্রথমেই ইহার পথপ্রদর্শক হইলাম।"

ঈশ্বর গুপ্তের এই কথাগুলি আত্মম্ভরিতা নয়। যে অর্থে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা দেশের ইতিহাসের জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করেছিলেন ঈশ্বর গুপ্তের এই উক্তিও সেই অর্থেই। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন—

"যেমন কুলি মজুর পথ খুলিয়া দিলে, অগম্য কানন বা প্রান্তরমধ্যে সেনাপতি সেনা লইয়া প্রবেশ করিতে পারেন, আমি সেইরূপ সাহিত্যসেনাপতি-দিগের জন্য সাহিত্যের সকল প্রদেশের পথ খুলিয়া দিবার চেষ্টা করিতাম। বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে আমার সেই মজুরদারির ফল এই কয়েকটি প্রবন্ধ। ইহার প্রণয়ন জন্য অনবসরবশতঃ এবং অন্যান্য কারণে ইচ্ছানুরূপ অনুসন্ধান ও পরিশ্রম করিতে পারি নাই। কাজেই বলিতে পারি না যে, ইহার দর বেশী। দর বেশী না হউক, ইহা পরিত্যাগ করিতে পারি না। যে দরিদ্র, সে সোণা-রূপা জুটাইতে পারিল না বলিয়া কি বনফুল দিয়া মাতৃপদে অঞ্জলি দিবে না?"[৩]

এই মনোভাবকে হুবহু ঈশ্বর গুপ্তের মনোভাব বলেই বর্ণনা করা যেতে পারে। সাহিত্য-ইতিহাস রচনার সার্থক ভূমিকা তিনি করে গিয়েছেন। তাঁর এই জীবনী-রচনাও ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের মতোই সাহিত্য-জননীপদে অঞ্জলি-স্বরূপ।

---

৩ বিবিধ প্রবন্ধ, ২য় ভাগ, বিজ্ঞাপন।

বিশুদ্ধ ইতিহাসের রূপ যদি এই রচনাগুলি নাও পেয়ে থাকে, তথাপি ঈশ্বর গুপ্ত যে এই প্রচেষ্টায় অনেক দূর এগিয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। রমেশচন্দ্র দত্ত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের এই প্রচেষ্টার সশ্রদ্ধ উল্লেখ করে বলেছেন—

"Iswar Chandra Gupta, the first great poet of this century, was the first writer who attempted to publish biographical accounts of the previous writers; but his attempt necessarily met with imperfect success."[৪]

কেউ যদি ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনচরিতটির সঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তের ভারতচন্দ্র ও রামনিধি গুপ্তের জীবনচরিত দুটির তুলনা করে দেখেন, তবে বুঝতে পারবেন তাঁর অপূর্ণতা সত্ত্বেও আলোচ্য ব্যক্তিদের দেশে এবং কালে স্থাপিত করতে তিনি কতখানি সফল হয়েছিলেন। নানা ঘটনার উল্লেখ, সময়-নির্দেশক নানা ঐতিহাসিক বিবরণের তুলনাত্মক আলোচনায় ঈশ্বর গুপ্তের জীবনীগুলি পূর্ণ। পুরনো দলিলপত্রও তিনি যথাসম্ভব পরীক্ষা করেছিলেন। বিশেষত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে তথ্যসংগ্রহে ঈশ্বর গুপ্ত যে অক্লান্ত অধ্যবসায় এবং পরিশ্রম করেছিলেন 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'-রচনাকালে দীনেশচন্দ্রের অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের সঙ্গে তা তুলনীয়।

পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার প্রাথমিক বাধা হচ্ছে উপকরণের অভাব। ঈশ্বর গুপ্ত যথাসাধ্য উপকরণ সংগ্রহ করে গিয়েছিলেন, কিন্তু তার পর দীর্ঘকাল উপকরণ সংগ্রহের সে-রকম চেষ্টা হয় নি। আগেই বলেছি, ইংরেজি-শিক্ষিত সমাজের মধ্যে যে বাংলা সাহিত্য গড়ে উঠছিল সেগুলির ঠিক ইতিহাস রচনার সময় তখনও আসে নি, তবে সমালোচনা বা মূল্যবিচারের চেষ্টা যে চলে নি তা নয়। ঈশ্বর গুপ্তের পর বাংলা সাহিত্যের আলোচনা-গ্রন্থ হিসাবে দুটি বই উল্লেখযোগ্য, যে-দুটি বই ঈশ্বর গুপ্তের আলোচনাপদ্ধতিকেই মূলত অনুসরণ করেছিল। কবি হরিশচন্দ্র মিত্র ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে 'কবিকলাপ' (১ম খণ্ড, আশ্বিন ১২৭৩) নামে একটি বই প্রকাশ করেন। ঈশ্বর গুপ্ত যেমন ভিন্ন ভিন্ন কবিদের নিয়ে বিভিন্ন প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন, সেই একই প্রণালীতে এতে 'আদিকবি কৃত্তিবাস, কবিকঙ্কণ, নন্দকুমার চক্রবর্তী, কাশীরাম দাস এবং

৪ *The Literature of Bengal* (1895), ভূমিকা।

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত উত্তম প্রণালীতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। বইটা ছোটো; মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা ৭৯।[৫]

এই আলোচনারীতির অনুসরণে পরবর্তী বই 'কবিচরিত' রচিত হয়। বইখানা লেখেন হরিমোহন মুখোপাধ্যায় ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে। এই বইয়ে আটটি অধ্যায়। প্রথম অধ্যায় উপক্রমণিকা। পরে সাতটি অধ্যায়ে আলোচিত কবিরা হচ্ছেন কৃত্তিবাস, মুকুন্দরাম, কাশীরাম দাস, রামপ্রসাদ সেন, ভারতচন্দ্র রায়, মদনমোহন তর্কালংকার এবং ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। উল্লেখযোগ্য, কবিচরিতে প্রকাশিত জীবনীই ঈশ্বর গুপ্তের প্রথম জীবনচরিত।

লক্ষ্য করবার বিষয় কবিচরিতের উপক্রমণিকাটি। এখানেই আমরা প্রথম ধারাবাহিক বাংলা সাহিত্যের একটি বিবরণ পাচ্ছি। এই বিবরণের আরম্ভ বাংলা ভাষার উৎপত্তি বর্ণনা করে। এখানে বৈষ্ণব কবিদের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিস্তৃত আলোচনা পাই। লেখকের মতে 'জীব গোস্বামীর করচাই সর্ব প্রাচীন গ্রন্থ। উহার বয়ঃক্রম প্রায় ৩৪০ বৎসর।' বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস কৃষ্ণদাস কবিরাজ— এই কয়জন লেখকদের পর্যালোচনা করে লেখক বাংলা সাহিত্যের এক সমৃদ্ধ যুগের পরিচয় দিয়েছেন। দীনেশচন্দ্র সেন এবং তৎপরবর্তী ঐতিহাসিকেরা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বৈষ্ণব যুগের যে একটি বৃহৎ এবং মহৎ অধ্যায় রচনা করবেন তার স্থচনা হয়েছিল এখানেই। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব ছাড়া অন্যান্য কবিদের মধ্যে আলোচিত কৃত্তিবাস মুকুন্দরাম রামপ্রসাদ প্রাণরাম চক্রবর্তী ভারতচন্দ্র রাধামোহন সেন রামমোহন (ব্রহ্মসঙ্গীত-রচয়িতা হিসাবে) রামনিধি গুপ্ত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর অন্যান্য আলোচিত কবি কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ি, দুর্গামঙ্গল-রচয়িতা বঙ্গচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রঘুনাথ গোস্বামী দাশরথি রায় গোবিন্দ অধিকারী মধু কান এবং কবিওয়ালা নামে পরিচিত কবিরা।

ইংরেজি যুগের মধ্যে আলোচনা করা হয়েছে 'অনঙ্গমোহন' -লেখক অক্ষয়কুমার দত্তকে। এ যুগের অন্যান্য লেখকদের আলোচনা 'কবিচরিতে'র পরবর্তী খণ্ডে

৫ বইটি দুষ্প্রাপ্য। সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা থেকে এই বিবরণ গৃহীত। কবিকলাপ বইটি কলকাতা বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ্ গ্রন্থাগারেও নেই। ঢাকা সাহিত্যপরিষদে এক কপি ছিল। শ্রীযুক্ত ত্রিপুরাশংকর সেনশাস্ত্রী এই বইয়ের বিবরণ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেন— এ-কথা সেনশাস্ত্রী মশায়ের কাছে শুনেছি।

থাকবে বলে হরিমোহন জানিয়েছেন। 'কবিচরিতে'র দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় নি। কিন্তু দীর্ঘকাল পরে 'বঙ্গভাষার লেখক' (১৯০১) রচনা করে হরিমোহন 'কবিচরিতে'র আরব্ধ কাজ সম্পূর্ণ করেছিলেন। 'কবিচরিত' রচনা করতে গিয়ে লেখক যেসব বই ও পত্রিকার সাহায্য নিয়েছিলেন, তাও উল্লেখযোগ্য ; যেমন হরিশচন্দ্র মিত্র -প্রণীত কবিকলাপ, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় -কৃত কবিকঙ্কণের সমালোচনা, নন্দলাল দত্তের কবিরঞ্জনের কাব্যসংগ্রহ, নিউ প্রেসে মুদ্রিত ভারতচন্দ্রের গ্রন্থসংকলন এবং প্রভাকর, বিবিধার্থসংগ্রহ, নবপ্রবন্ধসার, হিতসাধক প্রভৃতি সাময়িকপত্র ও গ্রন্থ। বলা বাহুল্য, এগুলি সবই দ্বিতীয় পর্যায়ের (secondary) প্রমাণপত্র। ঈশ্বর গুপ্তের পরে মৌলিক প্রমাণপত্র (primary source) ব্যবহার করেছিলেন দীনেশচন্দ্র সেন। দীনেশচন্দ্র পুথি মিলিয়ে দলিল পরীক্ষা করে পাঠনির্ণয় করে ইতিহাস রচনা করেন। ঈশ্বর গুপ্ত তার আরম্ভ করেছিলেন।

মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'বঙ্গভাষার ইতিহাস' (১৮৭১) বস্তুত লেখা হয়েছিল কবিচরিতের এক বৎসর পরেই। এই বইটির বিশেষত্ব, ইতিহাস নামে বাংলা সাহিত্য-বিষয়ে এটাই প্রথম সম্পূর্ণ গ্রন্থ, যদিও বইটিকে মূলতই বলা যেতে পারে কবিচরিতের উপক্রমণিকা-প্রবন্ধেই সম্প্রসারণ। এখানেও বাংলা ভাষার ইতিহাস উপক্রমণিকার মতোই বৈদিক যুগ থেকে বর্ণনা করা হয়েছে। উপক্রমণিকার মতোই বৌদ্ধ গাথা পালি প্রাকৃত ইত্যাদি ভাষান্তরগুলি আলোচিত। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম গ্রন্থ সম্বন্ধে হরিমোহনের মতের অনুসরণে মহেন্দ্রনাথও বলেছেন জীব গোস্বামীর করচা ৩৪০ বৎসর পূর্বে রচিত হয়েছিল। হরিমোহন মধ্যযুগের যেসব কবিদের আলোচনা করেছিলেন, 'বঙ্গভাষার ইতিহাসে'ও ঠিক তাঁরাই আলোচিত।

মহেন্দ্রনাথের নিজস্ব কীর্তি হচ্ছে আধুনিক গদ্যলেখকদের অবতারণা। হরিমোহন দ্বিতীয় খণ্ডে আলোচনা করবেন বলে কবিচরিতে তাদের আলোচনা করেন নি। সে দিক থেকে 'বঙ্গভাষার ইতিহাস' ব্যাপকতর। মহেন্দ্রনাথের বইতে তিনটি অধ্যায়ই সেকালের পক্ষে অভিনব— বঙ্গভাষার বিদ্যালয় এবং বাঙ্গলা সংবাদপত্র সম্বন্ধে দুটি অধ্যায় এবং পরিশিষ্টে আধুনিক গদ্যলেখকদের বিবরণ। কবিচরিতে বৈষ্ণব যুগের যে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল মহেন্দ্রনাথ তাকে স্বীকার করে বলেছিলেন চৈতন্যাবতরণের পরেই বাংলা ভাষার উন্নতির সূচনা। মনে হয় হরিমোহনের কবিচরিতের (১৮৬৯) থেকেই বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে

রসবিচারের দৃষ্টি পরিবর্তিত হতে থাকে। বৈষ্ণব সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতা এবং চৈতন্যের প্রভাবে বাংলা সাহিত্যের পরিবর্তনের প্রতি হরিমোহন আমাদের অবহিত করেন। এর পরে রামগতি ন্যায়রত্ন, রাজনারায়ণ বসু বা বঙ্কিমচন্দ্র কেউ এ বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করেন নি। দীনেশচন্দ্রের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'র অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্যই ছিল বৈষ্ণব যুগের বিস্তৃত ইতিহাস রচনায়। দীনেশচন্দ্র ইংরেজিতে এই যুগ নিয়ে আলাদা বইও রচনা করেছিলেন। অথচ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক থেকে ঈশ্বর গুপ্তের পরিকল্পনাতে পর্যন্ত বৈষ্ণব কবিদের উল্লেখের স্বল্পতা পরবর্তী যুগের তুলনায় চোখে না পড়ে পারে না। 'কবি-চরিতে'র সমালোচনা-উপলক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজিতে যে-প্রবন্ধ[৬] লেখেন তাতে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের দুটি শ্রেণীর উল্লেখ করেছিলেন, চৈতন্য-সাহিত্য এবং পুরাণ-সাহিত্য অর্থাৎ রামায়ণ-মহাভারত-মঙ্গলকাব্য। তিনি দুয়ের তুলনায় স্পষ্টভাবেই বলেছিলেন—

"In poetic power they are decidedly inferior to the best of the Vaisnava poets."

বঙ্কিমচন্দ্র ভারতচন্দ্রকে father of modern Bengali বললেও তাঁর অভিমত ছিল—

"In the higher attributes of a poet Bharat Chandra is far inferior to many who have preceded and followed him."

বঙ্কিমচন্দ্রের এই প্রবন্ধটিকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ঠিক বলা চলে না। প্রবন্ধটিতে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের একটি সাধারণ সমালোচনা করেছিলেন। তাতে ইংরেজি শিক্ষিত নব্যদল বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে কি ধারণা পোষণ করেন তার আভাস পাওয়া যায়। আধুনিক রসরুচি বাংলা সাহিত্যের কোন্ দিককে সার্থক বলে মনে করে এবং ইতিহাস-রচনায় কোন্ দিকে বিশেষ জোর দেওয়া উচিত, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধে তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। আধুনিক কালে রচিত বাংলা সাহিত্যকে বঙ্কিমচন্দ্র দুই ভাগে ভাগ করেছিলেন, সংস্কৃতানুগত এবং ইংরেজি-অনুগত। বলা বাহুল্য, বঙ্কিমচন্দ্রের সমস্ত ভরসা ছিল দ্বিতীয় দলের উপর।

বঙ্কিমচন্দ্র নিজে বাংলা সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা না করলেও তাঁর

৬ Bengali Literature, *Calcutta Review*, 1871.

কয়েকটি লেখায় ইতিহাস-রচনার দু-একটি সূত্রের নির্দেশ ছিল। 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব'[৭] প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলছেন—

"সকলই নিয়মের ফল। সাহিত্যও নিয়মের ফল। বিশেষ বিশেষ কারণ হইতে, বিশেষ বিশেষ নিয়মানুসারে, বিশেষ ফলোৎপত্তি হয়। সাহিত্যও দেশভেদে, দেশের অবস্থাভেদে, অসংখ্য নিয়মের বশবর্তী হইয়া রূপান্তরিত হয়। সেই সকল নিয়ম অত্যন্ত জটিল, দুর্জ্ঞেয়, সন্দেহ নাই; এ পর্যন্ত কেহ তাহার সবিশেষ তত্ত্ব নিরূপণ করিতে পারে নাই। কোমৎ বিজ্ঞান সম্বন্ধে যেরূপ তত্ত্ব আবিষ্কৃত করিয়াছেন, সাহিত্য সম্বন্ধে কেহ তদ্রূপ করিতে পারেন নাই। তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে সাহিত্য দেশের অবস্থা এবং জাতীয় চরিত্রের প্রতিবিম্ব মাত্র।"

বঙ্কিমচন্দ্র স্পষ্টতই প্রাকৃতিক নিয়ম এবং কোমতীয় চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এই কথাগুলি লিখেছেন। তাঁর এই নীতিটাই আমরা গ্রাহ্য করব কিনা সেটা আলাদা কথা, কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাস-রচনায় যে একটি নীতিসূত্রের প্রয়োজন, বঙ্কিমচন্দ্রের এই কথাটাই প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার যুগে একটা বড়ো ইঙ্গিত। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের এই ইঙ্গিত নিয়ে দীর্ঘকাল কোনো ইতিহাস লেখা হয় নি। সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করতে গেলে যুগ জীবন ও সমাজের বিশিষ্ট প্রবণতাগুলির সন্ধান করতে হয়, দীনেশচন্দ্রের পূর্বে সেই কথা কারোই মনে হয় নি।

এইজন্য 'বঙ্গভাষার ইতিহাসে'র পরের বৎসরে প্রকাশিত রামগতি ন্যায়রত্নের 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৭২) শেষ পর্যন্ত প্রস্তাবই, পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস নয়। তা হলেও এই বইখানিতে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার আদর্শ যতদূর অগ্রসর হয়েছে, দীনেশচন্দ্রের পূর্বে এমন আর কোনো বইয়ের দ্বারাই হয় নি। রামগতি এখানে একটি প্রবন্ধ মাত্র রচনা করেন নি, পূর্বযুগ এবং আধুনিক যুগ মিলিয়ে তিনি একটি বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করেছেন। রামগতি বাংলা সাহিত্যের যে আকৃতি নির্ণয় করেছেন তাঁর আগে এমন আর কেউ করেন নি। তিনিই সর্বপ্রথম বাংলা সাহিত্যের যুগভাগ করলেন, প্রথম থেকে চৈতন্যদেবের পূর্ব পর্যন্ত আদ্যকাল, চৈতন্যদেব থেকে ভারতচন্দ্রের পূর্ব পর্যন্ত মধ্যকাল, ভারতচন্দ্র থেকে ইদানীন্তন কাল। আদ্যকালের আলোচিত কবি বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস ও কৃত্তিবাস। মধ্যকালের আলোচিত

৭ বঙ্গদর্শন, পৌষ ১২৮০।

কবি বৃন্দাবনদাস জীবগোস্বামী কৃষ্ণদাস-কবিরাজ মুকুন্দরাম কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ কাশীরামদাস রামেশ্বর রামপ্রসাদ। ইদানীন্তন কালে ভারতচন্দ্র-কবিওয়ালা থেকে পরবর্তী সমস্ত সাহিত্যই আলোচিত। বলা বাহুল্য এই অংশটিই সর্ববৃহৎ।

দেখা যাচ্ছে, রামগতি ন্যায়রত্নের সময়ে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের নিদর্শন তেমন কিছু আবিষ্কৃত হয় নি। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের কালনির্ণয় করবার গবেষণা তিনি করেছিলেন, এটা রামগতির ইতিহাস-বোধের একটা বড়ো বৈশিষ্ট্য। তাঁর সাধ্যমতো তিনি ইতিহাসের পূর্বাপরতা বিচার করে দেখাতে চেষ্টা করেছেন। বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাস -প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—

"চৈতন্যদেব কর্তৃক বিদ্যাপতি -বিরচিত গীত শ্রবণ এবং গোবিন্দদাস কর্তৃক চৈতন্যলীলা বর্ণন— এই উভয়ের প্রদর্শন দ্বারা আমরা নিঃসংশয়রূপে প্রতিপাদন করিয়াছি যে বিদ্যাপতি চৈতন্যদেবের পূর্বকালীন ও গোবিন্দদাস উত্তরকালীন ছিলেন।"

রামগতির এই আলোচনাপদ্ধতিই প্রমাণ করে ইতিহাস-রচনার কাজে তিনি কতখানি এগিয়ে ছিলেন। এইভাবেই তিনি বাংলা সাহিত্যের কিংবদন্তী এবং লোকপ্রবচনের ভিতর থেকে সত্য উদ্ধার করে বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিবদ্ধ রূপ দেবার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি যে তিনটি যুগ ভাগ করেছেন, আলোচনার আরম্ভে তিনি সেই যুগের ভাষা ও সাহিত্যের সাধারণ লক্ষণগুলিও বোঝাবার চেষ্টা করেছেন, তাতে বাংলা সাহিত্যের চিত্রটি আরো উজ্জ্বল হয়েছে। এই ইতিহাস রচনা করবার জন্য তিনি যে শ্রম স্বীকার করেছিলেন, তাতে নিষ্ঠাবান ঐতিহাসিকের পুত্র গিরীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

"এই পুস্তকখানির প্রণয়ন সময়ে পিতৃদেবকে যেরূপ পরিশ্রম, যেরূপ অর্থব্যয় ও যেরূপ কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল তাহা হৃদয়ঙ্গম করা অন্যের পক্ষে সহজ নহে। এই উপলক্ষে তিনি ছোট বড় অনেক গ্রন্থকারের রচনা পাঠ করিয়াছেন। কত পাণ্ডুলিপি, কত গ্রাম ও প্রদেশের কত স্থান যে সন্ধান করিয়াছেন তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।"

কিন্তু রামগতি ন্যায়রত্নের বইটির বিশেষ চিত্তাকর্ষক অংশ হচ্ছে আধুনিক যুগের আলোচনা। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বৈচিত্র্য সম্বন্ধে তিনি সচেতন হলেও উপন্যাসধারা কাব্যধারা নাটকধারা প্রভৃতির আলাদা শ্রেণী না করে গ্রন্থকার বা গ্রন্থের শিরোনামে তিনি এ যুগের সাহিত্যের পর্যালোচনা করেছেন। এতে ইতিহাসের ধারাবাহিক ক্রম ঠিক রক্ষিত হয় নি, সম্ভবত 'ইদানীন্তন'

বলেই তার প্রয়োজন বোধ করেন নি। কিন্তু সেকালের সাহিত্য সম্বন্ধে সেকালেরই একজন আলোচকের অভিমতটাই আজ বিশেষ মূল্যবান হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষত রামগতি নিজেই একজন সাহিত্যিক ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র যাঁদের সংস্কৃতপন্থী দল বলেছেন রামগতি ছিলেন তাঁদেরই অন্তর্ভুক্ত। রামগতির এই আলোচনা ইতিহাস অপেক্ষা সমালোচনা হিসাবেই কৌতূহলজনক।

সম্ভবত তখন পর্যন্ত প্রাপ্ত সাহিত্যিক নিদর্শনের ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা করা অপেক্ষা সমালোচনামূলক বিবরণ রচনা করাই সম্ভব ছিল। তাই রামগতির পরেই রাজনারায়ণ বসু 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব'ই (১৮৭৮) লিখেছেন। রাজনারায়ণ বসু প্রধানত দুটি বইয়ের উপরেই নির্ভর করেছিলেন, রামগতির বই এবং লঙের Descriptive Catalogue। রাজনারায়ণের এই ছোটো বইটির মূল্যও আজ ইতিহাস হিসাবে নয়, সমসাময়িকের চোখে সেকালের সাহিত্যের মূল্যনির্ণয়ের প্রচেষ্টা হিসাবে। সেদিক থেকে একে বঙ্কিমচন্দ্রের Bengali Literature প্রবন্ধটির সমগোত্র করা যায়। এসব রচনার প্রধান লক্ষ্য প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা নয়, বাংলা সাহিত্যের মূল্যবিচার। বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের কালানুক্রমিক ভাগ করেন নি; তিনি সাহিত্যের প্রকৃতি বিচার করে শ্রেণীভাগ করেছিলেন।

রমেশচন্দ্র ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর সুবিখ্যাত বই *Literature of Bengal* প্রকাশ করলেন; তাতেও তিনি প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা করেন নি। স্বভাব-ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র ইতিহাসের সংস্কার দ্বারা চালিত হয়ে বাংলা সাহিত্যের যে বিবরণ প্রস্তুত করেছিলেন, তা প্রখর ইতিহাস-চেতনায় সমুজ্জ্বল, তথাপি লক্ষ্য করবার বিষয় রমেশচন্দ্র নিজে তাঁর এই বিবরণকে ইতিহাস বলেন নি। কারণ এই বইতে সত্য সত্যই তিনি বাংলা 'সাহিত্যে'র ইতিহাস লিখতে চান নি, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সাহিত্যকে অবলম্বন করে বাঙালির মনোজীবনের গতি-প্রকৃতিকে নির্ণয় করা। এটাই যে তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ষোড়শ শতাব্দীর সাহিত্যের নবজন্মের বর্ণনাতেই তা বোঝা যায়—

"Up to the end of the fifteenth century our literature consisted simply of songs feelingly sung, about the amours of Krishna and Radhika. But the national mind was now awakened. The first effect of this change was the introduction of new religion, deep and earnest in its character, and

far-reaching in its consequences. In literature, too, there was a hankering for something vaster and nobler than what had been inherited from the preceding ages; there was an energy capable of something greater than the composition of songs"

উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন ও প্রসারের ফলে বাঙালির চিত্তে যে নবচেতনার সূত্রপাত হয়েছিল সে সম্বন্ধে রমেশচন্দ্র বলছেন—

"The conquest of Bengal by the English was not only a political revolution, but ushered in a greater revolution in thoughts and ideas; in religion and society"[৮]

এ ধরনের কথা ইতিপূর্বে কেউ বলতে পারেন নি। যথার্থ ঐতিহাসিকের পক্ষেই তথ্যকে আশ্রয় করে গভীরতর ভাবগত সত্যকে উদ্ধার করা সম্ভব। রমেশচন্দ্র বাংলা সাহিত্য-অবলম্বনে এই ভাবজীবনের পরিচয়ই দিতে চেয়েছিলেন। সেইজন্য Raghunath and his school of Logic এবং Raghunandan and his Institutes এবং General Intellectual Progress (Nineteenth century) প্রভৃতি অধ্যায় তাঁর গ্রন্থে স্থান পেয়েছে, কারণ বাঙালির মননপ্রকৃতিকে বুঝতে হলে এগুলির সন্ধান নিতেই হবে।

রমেশচন্দ্রের এই বইখানা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার প্রয়াসে একটি বড়ো পদক্ষেপ। এতে যথার্থ ইতিহাস-চেতনার সঙ্গে জাতীয় মনটিকে বোঝাবার মতো তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির সমন্বয় ঘটেছে। এতকাল এই অন্তর্দৃষ্টিরই অভাব ছিল। অবশ্য প্রাচীন ও মধ্যযুগের প্রধান কয়েকজন কবিকে অবলম্বন করেই রমেশচন্দ্র এই দুর্লভ অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন। যদি বাংলা সাহিত্যের নিদর্শন অধিকতর পরিমাণে পেতেন তবে হয়তো বাঙালি জাতির অন্তর্জীবনের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস তিনি লিখতে পারতেন। সেই সিদ্ধিতে পৌঁছেছিলেন দীনেশচন্দ্র সেন 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' (১৮৯৬) রচনা করে।

তাই রবীন্দ্রনাথ এই বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণের (১৯০১) সমালোচনা-উপলক্ষে লিখেছিলেন—

---

৮ এই মন্তব্যগুলি রমেশচন্দ্রের বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণে (১৮৯৫) বর্জিত হয়েছিল। J. N. Gupta প্রণীত *Life and Work of Romesh Chunder Dutt* (1911) গ্রন্থে বর্জিত অংশগুলি সংকলিত আছে, পৃ ৬১-৬৫।

"দ্বিতীয়বার পাঠে গ্রন্থের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার সময় ও সুযোগ পাইয়াছি। এবারে বাংলার প্রাচীন সাহিত্যকারদের স্বতন্ত্র ও ব্যক্তিগত পরিচয়ে বা তুলনামূলক সমালোচনায় আমাদের মন আকর্ষণ করে নাই; আমরা দীনেশবাবুর গ্রন্থের মধ্যে বাংলাদেশের বিচিত্র শাখাপ্রশাখাসম্পন্ন ইতিহাস-বনস্পতির বৃহৎ আভাস দেখিতে পাইয়াছি।"

দীনেশচন্দ্রের গ্রন্থে পূর্বযুগের খণ্ডিত ও বিচ্ছিন্ন প্রয়াস একত্র সম্মিলিত হয়ে বাংলা সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসে পরিণত হয়েছে। প্রচুর তথ্যসংগ্রহ, কালানুক্রমিক বিন্যাস এবং লোকচিত্তের উদ্‌ঘাটনের দ্বারা জাতির অন্তর্জীবনের বিবরণ রচনা— এই তিন দিক দিয়েই দীনেশচন্দ্রের বইখানা একটি সুস্পষ্ট ও সমগ্র রূপ-রচনায় সার্থক হয়েছিল।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের অপ্রচুর সাহিত্যিক নিদর্শন সত্ত্বেও কীভাবে তিনি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় উদ্যোগী হয়েছিলেন, তিনি নিজেই তার বিবরণ দিয়েছেন। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার পিস অ্যাসোসিয়েশন থেকে বাংলা ভাষা সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ-লেখককে 'বিদ্যাসাগর-পদক' দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করা হয়। দীনেশচন্দ্র এই পদক লাভ করেন। এই প্রবন্ধ রচনা করতে গিয়েই তিনি রতিদেবের 'মৃগলুব্ধ'র একটি পুথি পান। তাঁর উৎসাহ বেড়ে ওঠে। ত্রিপুরা চট্টগ্রাম অঞ্চলের পল্লীতে ঘুরে ঘুরে বহু পুথি তিনি সংগ্রহ করেন। তিনি এই কাজে এশিয়াটিক সোসাইটির সাহায্য প্রার্থনা করে চিঠি লেখেন। তখনই তিনি হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর আনুকূল্য লাভ করেন। কয়েক বৎসরের চেষ্টায় বহু কষ্ট স্বীকার করে তিনি যে পুথি সংগ্রহ করেন, তারই উপর ভিত্তি করে রচনা করেন 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'। দীনেশচন্দ্রের এই ক্লেশ ও শ্রম স্বীকার আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে; তিনিও ঠিক এমনি কষ্ট স্বীকার করেই কবিওয়ালাদের জীবনী সংগ্রহ করেছিলেন। দীনেশচন্দ্র প্রাচীন পুথি সংগ্রহ করতে আরম্ভ করে বাংলা সাহিত্য-আলোচনার এক নবযুগের সূচনা করলেন। মনীষী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এই সম্বন্ধে আশা এবং উৎসাহ প্রকাশ করে বিস্তৃত প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন নবপ্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ পত্রিকায়।[৯] 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'

৯ দ্র বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ পত্রিকা, শ্রাবণ ১৩০১, 'প্রাচীন সাহিত্যালোচনা' প্রবন্ধ।

প্রকাশিত হলে হীরেন্দ্রনাথ 'সাহিত্য' পত্রিকায় এই গ্রন্থের এক বিস্তৃত সমালোচনাও প্রকাশ করেন।[১০]

প্রাচীন সাহিত্যের অজস্র নিদর্শনই যে তিনি উদ্ধার করেছিলেন তা নয়। বস্তুত এই কাজে যত পরিশ্রমই থাক, দীনেশচন্দ্রের প্রতিভার পরিচয় অন্যত্র। অজস্র নিদর্শন উদ্ধার করে কালনির্ণয় করা এবং কালানুক্রমিক ধারাবাহিকতায় তাদের স্থাপন করাতেই দীনেশচন্দ্রের প্রতিভার প্রমাণ পাওয়া গেল। যে-কালে প্রাচীন সাহিত্যের পুথি সামান্যই পাওয়া যেত, সেই সময়ে দীনেশচন্দ্র পুথি সংগ্রহ করে তারিখ নির্ণয় করে শূন্য অতীতকে ইতিহাসে পূর্ণ করে দিয়েছিলেন। মাঝে মাঝে তাঁর যে ভুল হয় নি তা নয়। 'শূন্যপুরাণ' অর্বাচীন রচনা হলেও প্রাচীন যুগের সাহিত্য মনে করেই তিনি আলোচনা করেছিলেন। এ ধরনের ত্রুটি আরো ছিল। কিন্তু দীনেশচন্দ্র প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের যে পূর্ণাবয়ব রূপ নির্মাণ করেছিলেন সেই রূপ অক্ষয় হয়ে রইল।

এই রূপটিকে স্পষ্ট করে তুলবার জন্য তিনি বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগ নির্দিষ্ট করে দিলেন, হিন্দু-বৌদ্ধ যুগ, চৈতন্য-যুগ, সংস্কার-যুগ, কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগ এবং ইংরেজ-যুগ। ইতিপূর্বে রামগতি যুগবিভাগের একটা চেষ্টা করেছিলেন। রমেশচন্দ্রও গীতিকবিতার যুগ, সংস্কৃত প্রভাবের যুগ এবং পাশ্চাত্য প্রভাবের যুগ— এইভাবে যুগভাগ করেছিলেন। দীনেশচন্দ্রের যুগভাগের সঙ্গে তুলনা করলেই তাঁদের পরিকল্পনার অসম্পূর্ণতা সহজেই চোখে পড়ে। দীনেশচন্দ্র যেভাবে যুগভাগ করেছিলেন কালসীমা তাতে তেমন সুস্পষ্ট না হলেও বাংলা সাহিত্যকে চিহ্নাঙ্কিত করে নেওয়া অনেক সহজ হয়েছে। ইংরেজি সাহিত্যে যেমন এলিজাবেথান যুগ বা রেস্টরেশন যুগ প্রভৃতি নামকরণ করা হয়েছে দীনেশচন্দ্রও সেই রীতির অনুসরণেই বাংলা সাহিত্যের নামকরণ করেছিলেন।[১১] এক একটি যুগের প্রবৃত্তি ধরে যুগের নামকরণ করাতে বেশ বোঝা যায় যে ইতিহাস যে 'সাহিত্যে'র এ বিষয়ে দীনেশচন্দ্র যথেষ্ট সচেতন ছিলেন।

'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'র এটাই সবচেয়ে বড়ো বিশেষত্ব, এতে খাঁটি বাংলা সাহিত্য-অবলম্বনে জাতি ও সমাজের পূর্ণ পরিচয় উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব হল।

---

১০ সাহিত্য ১৩০৪ আষাঢ়।

১১ পরবর্তী কালে জে সি ঘোষ বাংলা সাহিত্যকে গৌড় যুগ, নবদ্বীপ যুগ এবং কলিকাতা যুগ— এই তিন ভাগে বিভক্ত করেছিলেন। কিন্তু সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং সুকুমার সেন বাংলা সাহিত্যকে বৎসর ধরে ভাগ করে দেখবার পদ্ধতি প্রবর্তন করেছেন।

এই কাজের দিগ্‌দর্শন করিয়েছিলেন রমেশচন্দ্র, কিন্তু এর পূর্ণতা এনেছেন দীনেশচন্দ্র। এখানে দীনেশচন্দ্র শুধু প্রত্নতাত্ত্বিক নন, যথার্থ ঐতিহাসিক। এই মূল্য বিচার ও সমালোচনাতে, ভাবজীবনের পুনর্গঠনের কাজেই দীনেশচন্দ্রের প্রতিভার সর্বোত্তম বিকাশ ঘটেছিল। দীনেশচন্দ্রের এই কীর্তির পথ ধরেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধটি রচনা করেছিলেন। সমাজ ও সাহিত্যের মধ্যে অচ্ছেদ্য যোগের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র— যখন তিনি বলেছিলেন সকলই নিয়মের ফল, সাহিত্যও নিয়মের ফল। দীনেশচন্দ্র এই ইঙ্গিত গ্রহণ করেছিলেন। তথাপি সাহিত্য যে যান্ত্রিক সৃষ্টি নয়, সে যে প্রতিভারই দান, এ কথা তাঁর চেয়ে ভালো করে আর কেউ জানত না। তাই সাহিত্য-পর্যালোচনা করতে করতে তাঁর ভাষায় মুগ্ধতা এসেছে, আবেগের উচ্ছ্বাস এসেছে, স্বরের উচ্চাবচতা ধ্বনিত হয়েছে। আধুনিক ইতিহাস-রচনার মাপকাঠিতে এটা হয়তো ত্রুটি বলে গণ্য, কিন্তু তথ্যের কঙ্কালে তিনি যে প্রাণ সঞ্চার করেছেন, দীনেশচন্দ্রের এই গৌরব নিত্য স্মরণীয়। তিনিই হলেন এ বিষয়ে পথিকৃৎ।

বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ ১৩৭৩
পুনর্মুদ্রণ : শতবর্ষের আলোয় (১৯৬৯, অসীমা মৈত্র -সম্পাদিত)

সখারাম গণেশ দেউস্কর

স্রষ্টা বা শিল্পী বলতে যা বোঝায় সখারাম গণেশ দেউস্কর (১৭ ডিসেম্বর ১৮৬৯—২৩ নভেম্বর ১৯১২) তা ছিলেন না। উপন্যাস, কবিতা, নাটক বা গল্প তিনি লেখেন নি। তবু বাংলা সাহিত্যে তিনি স্মরণীয়। রসের ক্ষেত্রে তাঁর দান নয়, মননের ক্ষেত্রেও নয়। মননের সঙ্গে যেখানে জীবনের যোগ সখারামের স্মরণীয়তা সেখানেই। বাংলা গদ্যসাহিত্য এই যোগসাধনের কাজটি করে এসেছে। যে চিন্তাধারা রামমোহনের সময় থেকেই রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যাত্রা করেছিল বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে তা এমন একটি পর্যায়ে পৌঁছল যখন থেকে আধুনিক জীবনাদর্শের বাহক রাজা এবং নব উদ্‌বুদ্ধ প্রজার মধ্যে সম্পর্ক একটি স্পষ্ট আকৃতি পেল। সখারামের প্রধানতম রচনা 'দেশের কথা'য় তার চরম রূপটি ফুটে উঠেছিল। সখারামকে ইতিহাসে স্থাপন করতে গেলে বাঙালি চিন্তাধারার এই গতিরেখাটিকেই অনুসরণ করে আসতে হবে।

ভারতবর্ষের অন্য অঞ্চলের প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে বাংলাদেশের কথাই বলি। এখানে ইংরেজের আধিপত্যের আরম্ভ, এখানেই ইংরেজি সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ প্রভাব। বাঙালি মনীষীরাই এর সুফল এবং কুফল চিন্তা করেছিলেন। সখারাম বাঙালি ছিলেন না, যদিও বাংলাই ছিল তাঁর কর্মভূমি, জন্মভূমি ছিল দেওঘর, পিতৃভূমি মহারাষ্ট্র। সখারামের জীবনকথা সংক্ষেপে বলে নেওয়া ভালো।

বৈদ্যনাথের কাছে করো গ্রামটি সম্ভবত বর্গীর হাঙ্গামার সময় মরাঠাদের হস্তগত হয়। সদাশিব বিবাহ-সূত্রে এই গ্রামটি পান। সদাশিব ছিলেন সখারামের পিতামহ, সদাশিবের পুত্র ছিলেন গণেশ। গণেশ সদাশিব কাশীধামে বেদ অধ্যয়ন করেন। সখারাম বৈদ্যনাথে জন্ম গ্রহণ করেন ১৭ ডিসেম্বর ১৮৬৯। বাল্যকালেই সখারাম মাতৃহীন হন। তাঁর পিসীমাই তাঁকে লালন করেছিলেন। পিসীমা ছিলেন বুদ্ধিমতী, বিদ্যানুরাগিনী। মরাঠা সাহিত্যে এবং ইতিহাসে তাঁর বিশেষ দখল ছিল। সখারামের জীবনের আদর্শ গড়ে ওঠে এই পিসীমারই প্রভাবে। মরাঠা জাতির ইতিহাস, শিবাজীর কীর্তিকলাপ সখারামের কিশোর মনে ছায়া ফেলেছিল। পরবর্তী জীবনে নূতনতর ইতিহাসের পরিবর্তিত পটভূমিতে দেশাত্মবোধক কার্যকলাপে সেটাই হয়েছিল ফলবান্।

পিতা তাঁকে সাহায্য করেছিলেন বেদ-অধ্যয়নে। দেওঘর ইস্কুলে তিনি পড়াশোনা আরম্ভ করেছিলেন। বাংলাও স্বাভাবিকভাবেই তিনি শিখতে থাকেন। তখন দেওঘর ইস্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন যোগীন্দ্রনাথ বসু, মাইকেল মধুসূদন দত্তের বিখ্যাত জীবনীকার। সখারামের বাংলা ভাষায় অনুরাগের মূলে প্রভাব ছিল যোগীন্দ্রনাথের। দেওঘরে তখন থাকতেন রাজনারায়ণ বসু। রাজনারায়ণের গৃহে সখারাম প্রায়ই যেতেন। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের সঙ্গে সখারামের পরিচয় হয় সেখানেই। হেমেন্দ্রপ্রসাদ সখারামের মৃত্যুর পর একটি স্মৃতিকথা লিখেছিলেন।[১]

দারিদ্র্যের জন্য সখারাম পড়াশোনা বেশিদিন চালাতে পারলেন না। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে দেওঘরেই তিনি শিক্ষকের পদ গ্রহণ করলেন। তখন থেকেই তিনি তখনকার শ্রেষ্ঠ পত্রিকা সুরেশচন্দ্র সমাজপতির 'সাহিত্যের' লেখক। 'ভারতী' 'প্রদীপ' 'বঙ্গদর্শন' 'আর্যাবর্তে' তাঁর ভারতীয় ও মহারাষ্ট্রীয় ইতিহাস-সম্পর্কিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে থাকে। তাঁর প্রথম পুস্তিকা 'এটা কোন যুগ' শিক্ষক পদে নিযুক্ত হবার আগেই ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে বেরিয়েছিল। প্রবন্ধটি 'সাহিত্য ও বিজ্ঞানে' এবং স্থানে স্থানে পরিবর্তিত হয়ে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বইটি রাজনৈতিক বা সামাজিক বিষয়ে লেখা নয়, যুগ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বিচার। পিতার প্রভাবে তিনি ধর্ম-শাস্ত্র ও ইতিহাস চর্চা করেছিলেন, এটা তারই ফল। তার পরেই বেরোতে থাকে মহামতি রানাডে (১৯০১), ঝাঁসীর রাজকুমার (১৯০১), বাজীরাও (১৯০২), আনন্দবাঈ (১৯০৩)। কিন্তু এই বইগুলি ছাড়াও তাঁর বহু রচনা পুস্তকাকারে অনিবদ্ধ। এই রচনাধারা অনুসরণ করে গেলে সখারামের ইতিহাস-সন্ধান এবং দেশানুরাগের ক্রম-গভীরতার পরিচয় পাওয়া যায়। মরাঠা জাতির গৌরবপূর্ণ ইতিহাস, শিবাজীর দেশ ও জাতি গঠনে দিল্লীর বাদশাহের সঙ্গে তাঁর দুঃসাহসিক সংগ্রামে তার চূড়ান্ত পরিণতি— এই ইতিহাস সখারাম ভালো করেই পড়েছিলেন। তাঁর পড়া শুধু পুঁথিগত ছিল না, তাঁর ব্যক্তিজীবনেও দেশানুরাগের শিখা জ্বলে উঠল। দেওঘরের ম্যাজিষ্ট্রেট হার্ডের অন্যায় আচরণ সম্বন্ধে 'হিতবাদী'তে যে সব লেখা বেরিয়েছিল, সখারামই তার লেখক অনুমান করে স্কুল কমিটির সভাপতি ম্যাজিষ্ট্রেট হার্ডি সখারামকে কর্মচ্যুত করলেন। শুধু তাই নয় ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে সখারাম দেওঘর ছেড়ে কলকাতায় চলে আসতে বাধ্য হলেন।

---

১ আর্যাবর্ত, ৩য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩১৯।

হিতবাদীর সম্পাদক তখন কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ। কাব্যবিশারদই সখারামকে হিতবাদীতে চাকরি দিলেন। কাজ আরম্ভ করলেন ত্রিশ টাকায়, কর্মদক্ষতাগুণে সে বেতন বৃদ্ধি পেল। ইতিমধ্যে সখারাম নানা বিষয়ে জড়িয়ে পড়লেন। শিবাজী-উৎসব প্রবর্তন, বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলন ছাড়াও রাজনৈতিক কর্মীদের সঙ্গেও তাঁর যোগ স্থাপিত হল। তাঁর বিখ্যাত বই 'দেশের কথা' লেখা হল ১৯০৪-এ। ১৯০৭ সালে কাব্যবিশারদ স্বাস্থ্যান্বেষণে জাপান যাত্রা করেন। সেখান থেকে ফেরার পথে জাহাজেই তাঁর মৃত্যু হয়। কাব্যবিশারদের অনুপস্থিতি-কালে সখারাম ছিলেন হিতবাদীর সম্পাদক, পরে তিনিই হলেন স্থায়ী সম্পাদক। কিন্তু সেই কাজেও তিনি বেশিদিন থাকতে পারলেন না। সুরাট কংগ্রেসের (১৯০৭) ঘটনা উপলক্ষ করে সখারাম হিতবাদীর কাজ ছেড়ে দিলেন। দ্রুতপন্থী এবং ধীরপন্থীদের বিরোধে সুরাট কংগ্রেসের অধিবেশন ভেঙে গেল। দ্রুতপন্থীদের নেতা তিলককে দোষারোপ করতে চাইলেন হিতবাদী-কর্তৃপক্ষ। সখারাম তাতে অসম্মত হলেন। রাজনৈতিক আদর্শের গুরুকে তিনি কিছুতেই সমালোচনা করতে চাইলেন না। তেজস্বী মরাঠী ব্রাহ্মণ সামান্য আয়ের উপায়টিও ছেড়ে দিলেন।

হিতবাদীর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের পর তিনি জাতীয় বিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছিলেন। এদিকে 'দেশের কথা' এবং 'তিলকের মোকদ্দমা' বই দুখানাই সরকার বাজেয়াপ্ত করলেন। 'দেশের কথা' সম্পর্কে হেমেন্দ্রপ্রসাদ একটি কৌতূহলোদ্দীপক সংবাদ দিয়েছেন—

"১৩১১ থেকে ১৩১৪ সাল এই চারি বৎসরে দেশের কথা চারি সংস্করণে ১০০০০ খণ্ড বিক্রীত হয়। তাহার পর সরকার ইহার প্রচার বন্ধ করিয়া দেন। কিন্তু পুস্তকের প্রচার যত বাড়িতে লাগিল শিক্ষাব্রত সখারাম তাহার মূল্য তত কমাইতে লাগিলেন।"

হেমেন্দ্রপ্রসাদ সখারামের ব্যক্তিত্বদ্যোতক আর-একটি ঘটনার কথা বলেছেন, সেটিও উল্লেখযোগ্য—

"বাঙ্গালার রাজনৈতিক জটিলতাজড়িত স্বদেশী আন্দোলনের বহু পূর্বে রানাডে প্রমুখ অর্থনীতিবিশারদের চেষ্টায় বোম্বাই অঞ্চলে ভারতীয় শিল্পের উন্নতিচেষ্টা হইতেছিল। তখন বোম্বাই অঞ্চলের কলে যে বস্ত্র উৎপন্ন হইত তাহার পাড়ের বর্ণ পাকা হইত না। সখারাম সেই মোটা কাপড় ব্যবহার করিতেন।"

সরকারের রোষভাজন সখারামকে জাতীয় পরিষদও কাজে রাখতে ভরসা পেলেন না। সখারাম নিজেই অধ্যাপকপদ ত্যাগ করলেন। ১৯১২-র ২৩ নভেম্বর দেওঘরে করো গ্রামে দারিদ্র্য ও ব্যাধির আক্রমণের মধ্যে সখারাম গণেশ দেউস্কর মৃত্যুবরণ করলেন। ইতিপূর্বে পুত্র ও পত্নীকে তিনি হারিয়েছিলেন। সখারাম দেশসেবার পুরস্কার পেলেন অর্থ বিত্ত স্বাচ্ছন্দ্যের দ্বারা নয়, স্বরাজ-আন্দোলনে রাজরোষকে উপহাস করে 'দেশের কথা' এবং 'তিলকের মোকদ্দমা'র লেখকরূপে জনচিত্তে স্থায়ী আসন-লাভের দ্বারা। 'স্বরাজ' শব্দটি সখারাম গণেশ দেউস্কর তাঁর বাংলায় লেখা 'দেশের কথা' (১৯০৪) গ্রন্থে সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন।[২]

কলকাতায় চলে আসার পর থেকেই সখারাম দেশাত্মবোধক কর্মে অধিকতর নিবিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। তখন বাংলাদেশে সর্বজনপরিচিত শ্রেষ্ঠ পুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামীজির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সখারাম যে উদ্দীপনা এবং দৃষ্টি লাভ করেছিলেন, সে কথা সখারাম স্বামীজির দেহত্যাগের পর নিজেই বলেছিলেন।

পাঞ্জাব প্রদেশাগত এক বন্ধুকে নিয়ে সখারাম একবার বিবেকানন্দের সঙ্গে দেখা করতে যান। বিবেকানন্দ আরম্ভ করলেন পাঞ্জাবের অন্নকষ্ট ইত্যাদির আলোচনা। জনসাধারণের প্রতি আমাদের যে বিশেষ কর্তব্য রয়েছে স্বামীজি তার কথা বিশেষ ভাবেই উল্লেখ করতে থাকলেন। শিক্ষা অন্ন বস্ত্র ইত্যাদি নানা দিক দিয়ে পতিত অগণ্য ভারতবাসীর উন্নয়নের নানা আলোচনায় সময় কেটে গেল। বিদায় গ্রহণের সময় পাঞ্জাবি ভদ্রলোকটি বললেন যে তিনি আশা করেছিলেন স্বামীজির কাছে আধ্যাত্মিক উপদেশ শুনবেন কিন্তু দুর্ভাগ্য-ক্রমে সমস্ত আলোচনার গতিই ভিন্নদিকে প্রবাহিত হল। একথা শুনে স্বামীজি গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন—

"Sir, so long as even a dog of my country remains without food, to feed and take care of him is my religion and anything else is either non-religion or false religion."[৩]

স্বামীজির দেহত্যাগের দীর্ঘকাল পরে সখারাম এই ঘটনা বর্ণনা করে বলেছিলেন স্বামীজির কথাগুলি তাঁর অন্তরকে দগ্ধ করেছিল, সেদিন বুঝতে

---

২ সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা (১৯৬৮), পৃ ২০৪।

৩ *The Life of Swami Vivekananda* **by his Eastern and Western Disciples (1960), p 644.** এই বই প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯১২-তে সখারামের মৃত্যুর বৎসরে।

পেরেছিলেন দেশাত্মবোধ কাকে বলে। 'দেশের কথা' রচনা মূলে যে প্রজ্বলন্ত দেশচেতনা ছিল স্বামী বিবেকানন্দের তেজোগর্ভ অনুপ্রেরণাও যে তার অন্যতম ইন্ধন ছিল, এই অনুমান খুবই যুক্তিসংগত।

অবশ্য সবচেয়ে বড়ো প্রেরণা ছিল তিলকের। মহারাষ্ট্র আন্দোলন ক্রমেই বলশালী হয়ে উঠছিল। লোকমান্য তিলক মহারাষ্ট্রে গণপতি-পূজার নূতনতর ব্যাখ্যা দিয়ে সার্বজনিক পূজারূপে তার প্রবর্তন করলেন। ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসে তিলকের জ্ঞান ও গবেষণা তাঁর দেশচেতনাকে গঠিত করেছিল। দেশের সংস্কৃতির সঙ্গে রাজনৈতিক কর্তব্যকে যুক্ত করে একটি নূতন মূল্যমানকে সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন তিলক। একই প্রেরণাতে প্রবর্তিত হল শিবাজী-উৎসব। প্রতাপগড়ে তিলকের চেষ্টায় মহারাজ শিবাজীর উপাস্য ভবানীদেবীর মন্দিরের সংস্কার হয়। শিবাজী ধর্মবলে ভারতবর্ষে ধর্মরাজ্য স্থাপন করার স্বপ্ন দেখেছিলেন, তিলকেরও আকাঙ্ক্ষা ছিল আমাদের নতুন জাতীয়তাবাদ ধর্মের বলেই বলীয়ান হয়ে উঠুক। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে শিবাজী-উৎসবের অনুষ্ঠান হল মহারাষ্ট্রে। এই উপলক্ষে কেশরী প্রবন্ধ-কবিতায় এবং উৎসব-বিবরণে মুখর হয়েছিল। তারপরে দুজন ইংরেজ যখন আততায়ীর হাতে নিহত হলেন, তখন শাসন-কর্তৃপক্ষ মনে করলেন তিলকের রচনাই এই হত্যাকাণ্ডকে প্রণোদিত করেছিল। তিলক কারারুদ্ধ হলেন।

সখারামের চিন্তাপথ তিলকের পথকেই অনুসরণ করেছিল। তিলকের মতোই তিনি ধর্মশাস্ত্র আলোচনা করতে করতে বর্তমান ভারতে তার উপযোগিতা চিন্তা করেছিলেন। ধর্মের বন্ধনেই ভারতচিত্তকে বাঁধতে হবে। নতুন জাতীয়তা ধর্মকে আশ্রয় করেই গঠিত হবে। ধর্মবিচ্ছিন্ন দেশাত্মবোধের চিন্তা তখনও দেখা যায় নি। বাংলাদেশে এই দেশাত্মবোধের পটভূমি রচনা করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। আনন্দমঠে বঙ্কিমচন্দ্র যে ত্যাগব্রতী দেশসাধকদের কল্পনা করেছিলেন, তারা সন্ন্যাসী, দেশ এবং ঈশ্বর তাদের কাছে প্রায় সমার্থক।

সখারামের দেশকল্পনার পরিচয় পাই 'শিবাজীর দীক্ষা'য়—

"ভারতবর্ষের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে এদেশে ধর্ম ভিন্ন কখন কোন জাতির বা কোন সাহিত্যের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হয় নাই। শিখজাতির উন্নতির সহিত গুরু নানকের প্রচারিত ধর্মের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। প্রাণনাথ নামক জনৈক মহাপুরুষ বুন্দেলখণ্ডে যে নবধর্মভাবের প্রবর্তন করেন তাহারই ফলে বুন্দেলা জাতি মোগল শাসনের

উচ্ছেদ সাধনে সমর্থ হয়। মুসলমান আমলে রাজপুতনায় পাঞ্জাব ও বুন্দেলখণ্ডের ন্যায় নবধর্মের উদ্দীপনা ও পরিপ্লাবন সংঘটিত হয় নাই বলিয়া সেখানে আমরা হিন্দু শক্তির বিজয়িনী মূর্তি দেখিতে পাই নাই।···

যে সকল কারণের সমবায়ে মহারাষ্ট্রীয়গণ অল্পদিনের মধ্যে সমগ্র ভারত ব্যাপী হিন্দু সাম্রাজ্য স্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন মহারাষ্ট্র দেশে ধর্মসংস্কার ও ধর্মভাবের উদ্দীপনা তাহাদিগের মধ্যে প্রধান। মহারাষ্ট্রীয় জাতির অভ্যুদয়ের ইতিহাস তাহাদিগের দেশের ধর্মশিক্ষক ভক্ত কবিগণের জীবনের কার্যাবলীর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। মহারাজ শিবাজীর জীবনীর সহিত ঐ সকল সাধু পুরুষের সম্পর্ক অধিকতর ঘনিষ্ঠ।···রামদাস স্বামীর নিকট মহাত্মা শিবাজী ও তাঁহার অনুগামী মহারাষ্ট্র সমাজ যে অপূর্ব দীক্ষালাভ করিয়াছিল, তাহারই ফলে মুসলমান-প্লাবিত ভারতে হিন্দুশক্তির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। হিন্দুশক্তির এই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার ইতিহাস বিধর্মীর চক্ষে অরাজকতার ইতিহাসরূপে প্রতিভাত হইতে পারে। কিন্তু হিন্দুর চক্ষে এই ইতিহাস তাঁহাদিগের গৌরব কাহিনীতে পরিপূর্ণ।”[৪]

ধর্মের সাহায্যে জাতিগঠন-কল্পনা রবীন্দ্রনাথেরও ছিল। সম্ভবত তিলকের শিবাজী-উৎসব অনুষ্ঠানের উদ্দীপনাতেই তিনি ‘প্রতিনিধি’ (১৮৯৭) কবিতাটি রচনা করেছিলেন। যে-রাজ্য শিবাজী গুরুকে দান করেছিলেন, গুরু শিষ্যকে সেই রাজ্যই শাসন করতে আদেশ দিলেন অন্ধ কর্তৃত্বে নয়, ঈশ্বরের প্রতিনিধিরূপে মাত্র। শিবাজী ঈশ্বরের রাজ্যকে অপ্রমত্ত চিত্তে শাসন করবেন ধর্মেরই সেবকরূপে —

গুরু কহে তবে শোন করিলি কঠিন পণ
অনুরূপ নিতে হবে ভার
এই আমি দিনু কয়ে মোর নামে মোর হয়ে
রাজ্য তুমি লহো পুনর্বার।
তোমারে করিল বিধি ভিক্ষুকের প্রতিনিধি
রাজ্যেশ্বর দীন উদাসীন।
পালিবে সে রাজধর্ম জেনো তাহা মোর কর্ম
রাজ্য লয়ে রবে রাজ্যহীন।

---

৪ শিবাজীর দীক্ষা (১৩১১)।

শিবাজীর এই রাজআদর্শে আকৃষ্ট করেছিল সখারামকে, মুগ্ধ করেছিল রবীন্দ্রনাথকে। এই সমধর্মিতাতে সখারাম এবং রবীন্দ্রনাথ পরস্পরের নিকটে এলেন। ১৯০২ সালে বাংলাদেশেও মহারাষ্ট্রের এই উৎসব পালিত হল। সখারামই ছিলেন তার প্রধান উদ্যোক্তা। কয়েকবারের শিবাজী-উৎসব উপলক্ষে সখারাম 'শিবাজীর মহত্ত্ব' (১৯০৩), 'শিবাজীর দীক্ষা' (১৯০৪) এবং 'শিবাজী' (১৯০৬) নামে তিনটি পুস্তিকা রচনা করেন। তিনটিই বিনামূল্যে বিতরিত হয়েছিল। দ্বিতীয়টিতে রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কবিতা 'শিবাজী-উৎসব' এবং প্রেমতোষ বসুর একটি কবিতা যুক্ত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের এই কবিতার মধ্যেও সেই বিশ্বাসই ধ্বনিত—

এক ধর্মরাজ্য হবে এ ভারতের এ মহাবচন
করিব সম্বল।

ধর্মের নির্দেশেই রাজ্য গড়তে হবে। জনচিত্তকে উদ্‌বুদ্ধ করতে ধর্মের চেয়ে মহত্তর অনুপ্রেরণা ও শক্তি আর কিছুই নেই। রবীন্দ্রনাথ গদ্য-রচনাতেও বলেছেন, "আমাদের দেশে মোগলশাসনকালে শিবাজীকে আশ্রয় করিয়া যখন রাষ্ট্রচেষ্টা মাথা তুলিয়াছিল, তখন সে-চেষ্টা ধর্মকে লক্ষ্য করিতে ভুলে নাই। শিবাজীর গুরু রামদাস এই চেষ্টার প্রধান অবলম্বন ছিলেন।"[৫]

শরৎকুমার রায়ের 'শিবাজী ও মরাঠা জাতি' গ্রন্থের (১৯০৮) ভূমিকাতেও রবীন্দ্রনাথ একই কথা বলেছিলেন। এ বিষয়ে সখারাম ও রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একমত।

ধর্ম ও জাতীয়তার মিশ্রণকে অনেকেই অনুকূল চিত্তে গ্রহণ করতে পারেন নি। এই মিশ্রণের বিপদ এই যে ভিন্ন ধর্ম যারা আচরণ করে, এই জাতীয়তার আদর্শ তাদের চিত্তে সাড়া জাগাতে পারে না। ফলে হিন্দুধর্মাশ্রিত জাতীয় চেতনা ভারতবর্ষের এক বৃহৎ অংশকেই অবহেলা করতে চায়। অবশ্য এর উদার ব্যাখ্যাও আছে। তবু অনুভূতি যুক্তিতে নিরস্ত হবার নয়। ১৯০৬-এর শিবাজী-উৎসবে অনুষ্ঠিত ভবানী-পূজায় তিলক কলকাতায় এসেছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাতে যোগ দেন নি। কিন্তু তাই বলে শিবাজী-উৎসব পালন করতে তিনি কোনো বাধা অনুভব করেন নি। কারণ যে-ধর্ম জাতীয় সংহতি গড়ে তোলে সে-ধর্ম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারণা কিছু বিশিষ্ট। রবীন্দ্রনাথের সে-

---

৫ ভারতবর্ষ, ধম্মপদং (১৯০৪)।

কালীন গদ্য রচনা যিনি মনোযোগের সঙ্গে পড়েছেন তিনি সহজেই উপলব্ধি করবেন, আমাদের সকল কর্মপ্রচেষ্টাতেই তিনি ধর্ম রক্ষা করে চলতে উপদেশ দিয়েছেন, সে-ধর্ম কোনো সাম্প্রদায়িক, পৌরাণিক বা ঔপনিষদিক ধর্ম নয়; সে-ধর্ম মানবনীতির ধর্ম। আমরা যখনই কোনো সঙ্কট সমাধানের চেষ্টা করব তখন আমরা যেন শুধু আশু প্রয়োজনকেই বড়ো করে না দেখি। সকল সমস্যার মূল চরিত্রশুদ্ধি। আমাদের বুদ্ধি যদি হয় দুর্বুদ্ধি, চরিত্র যদি হয় সংকীর্ণ তবে কোনো সমস্যারই স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথের মতে তারই নাম ধর্ম। মরাঠা রাজ্য স্থায়ী কেন হল না, তার কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি বললেন—

"একদিন সেই ধর্মসাধনা স্বার্থসাধনে বিকৃত হইয়া গেল। তখন সমস্ত দেশের শক্তি আর একত্র মিলিতে পারিল না, তখন পরস্পর অবিশ্বাস ঈর্ষ্যা বিশ্বাসঘাতকতা বটগাছের শিকড়জালের মত মরাঠা প্রতাপের বিশাল হর্ম্যকে ভিত্তিতে ভিত্তিতে দীর্ণ বিদীর্ণ করিয়া দিল। ধর্ম সমস্ত জাতিকে এক করিয়াছিল এবং স্বার্থই তাহাকে বিশ্লিষ্ট করিয়া দিয়াছে— ইহাই মরাঠা অভ্যুত্থান ও পতনের ইতিহাস।"[৬]

সাম্প্রদায়িক সমস্যা, সামাজিক সংস্কার, এমন কি ইংরেজের সঙ্গে বিরোধের সময়েও রবীন্দ্রনাথ এই ধর্মাচরণের অনুকূলে বারবার সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন।

সখারাম যে-সময়ে লেখকরূপে দেখা দিয়েছেন, সে-সময়টায় রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ প্রখর হয়ে উঠেছে, ইংরেজ ও ভারতবাসার সম্পর্কও এক শতাব্দী পর নতুন দিকে মোড় ফিরেছে। ইংরেজ জাতি আমাদের কাছে তো শুধু রাজার জাতি ছিল না, সে ছিল জঙ্গম শক্তির প্রতীক, জাতীয় জড়তা ঘোচাবার মন্ত্রদাতা। ভারতীয় সমাজের বিভিন্ন বিকাশের সহায়ক শক্তিরূপেই আমরা ইংরেজকে গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু আমাদের সেই বিশ্বাসের ভাণ্ডার ক্রমে ক্রমে নিঃস্ব হয়ে এল সেই শতাব্দীর শেষে। অবিশ্বাস রূপ নিল তীব্র রাজনৈতিক উদ্যোগ আয়োজনে। জাতীয় মহাসভার ধীরগতি কর্মসূচি মনঃপূত হয় নি অনেকেরই। মহারাষ্ট্রে তিলক এবং বাংলাদেশে সন্ত্রাসবাদী যুবসংগঠন এক অধীরতার আবহাওয়া সৃষ্টি করে তুললেন। সখারাম গণেশ দেউস্করের 'দেশের

৬ 'শিবাজী ও মারাঠা জাতি', ভূমিকা।

কথা' (১৯০৪) রচিত হয়েছিল এই উত্তাল জনচেতনার মুহূর্তে। এই বইতে সখারাম ইংরেজ শাসনের দুদিক নিয়েই প্রশ্ন তুলেছিলেন, অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সার্থকতা এবং নৈতিক সার্থকতা। প্রথম যুগে ইংরেজ জাতির প্রভুত্বের নৈতিক প্রভাবের চিন্তাই হয়েছিল বড়ো, কিন্তু উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে ইংরেজ প্রভাবের প্রত্যক্ষ কুফল সম্বন্ধে সচেতনতা দেখা দিল। নৈতিক প্রভাবের সার্থকতা নিয়েও প্রশ্ন উঠল। ইংরেজ ও ভারতবাসীর সম্পর্কের ক্রমপরিবর্তিত রূপান্তরের সাক্ষ্য আছে মনীষীদের চিন্তায়। আধুনিক বাংলার মননধারার এদিকের আলোচনার গুরুত্ব কম নয়, কারণ এর সঙ্গে জড়িত আছে আমাদের আত্ম-অভিব্যক্তির কাহিনী— অন্ধ বিদেশী অনুকরণের স্থলে স্বাধীন চেতনার প্রতিষ্ঠা। প্রায় প্রতি চিন্তাশীল ব্যক্তিরই এ সম্পর্কে মন্তব্য আছে। অতএব এই ইতিহাস সংক্ষেপে অনুসরণ করা অসংগত হবে না, কারণ সখারামের বই এই ইতিহাসেরই ফসল।

ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাণিজ্যের ছলনায় এদেশে যখন রাজদণ্ড বিস্তার করে বসল তখন বিদেশী বণিকের শাসন আমাদের কাছে অবমাননাজনক মনে হয় নি। তার ছিল দুটো কারণ। একটা কারণ, এটা যে অপমান এ-বোধ দেখা দেয় নি অন্তত হিন্দুদের কাছে। অর্থাৎ দেশাত্মবোধের তখনও জন্মই হয় নি। দ্বিতীয় কারণ, ইংরেজ শাসনে আমাদের দেশীয় সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত দুর্বলতা প্রকট হয়ে উঠছিল, সেই জন্যই উন্নততর জাতির সান্নিধ্য এবং প্রভাব সুফলদায়ক বলেই মনে হয়েছিল। ভারতবর্ষের ইতিহাসের নতুন অধ্যায়ের সূচনায় দেখা দিলেন রামমোহন। অসাধারণ তেজস্বী পুরুষ তিনি, অসামান্য ধীশক্তি এবং অপরিমেয় কর্মপ্রেরণা তাঁর। তবু তিনি ইংরেজের অধীনতাকে বাঞ্ছনীয় মনে করেছিলেন। একটি প্রবন্ধে তিনি বলেন—

"...for having unexpectedly delivered this country from the long continued tyranny of its former rulers and placed it under the Government of the English, a nation who not only are blessed with the enjoyment of civil and political liberty, but also interest themselves in promoting liberty and religions subjects among those nations to which that influence extends."[৭]

The English Works of Raja Rammohan Roy, Part III. p 105 (Final

এই বহুবিধ সুফল উনিশ শতকের বাঙালিদের চিন্তাকে দীর্ঘকাল আচ্ছন্ন করেছিল। শিক্ষার নবতর পদ্ধতিতে, উন্নততর নীতিবোধে সর্বভারতীয় সংহতি সাধনে, সমাজ ও ধর্ম-সংস্কারের সহায়তায় ইংরেজ শাসন আমাদের খণ্ড ও বিচ্ছিন্ন জাতিকে প্রবুদ্ধ করেছে। ধর্ম ও সামাজিক সংস্কারের দ্বারা একদিন রাষ্ট্রনৈতিক উদ্দেশ্য সাধিত হবে— রামমোহনের এই বিশ্বাসের মধ্যে নিহিত ছিল সুদূর ভবিষ্যতের একটি পরম আকাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন। পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্তর্নিহিত মানবিকতা, যার ধারক সেদিন ছিল ইংরেজ শাসন, ভারতীয় জাতিগঠনে প্রেরণা স্বরূপ কাজ করেছিল।

নব্যবঙ্গের ইংরেজি-প্রীতি এই বিশ্বাসেরই আতিশয্যপূর্ণ প্রকাশ। তাঁরা নির্বোধ অনুকারক ছিলেন না। কিন্তু তাঁদের বিশ্বাস ছিল ইংরেজের সহযোগিতায়, তাদের দেওয়া মানব বিদ্যা দিয়েই দেশের অচল জড়তার স্তূপকে নিরাকৃত করতে হবে। ইংরেজই এ বিষয়ে সহায়ক হবে। তাদের উদ্দেশ্যের সাধুতায় তখনও সন্দেহের কীট প্রবেশ করে নি। শিক্ষালয় স্থাপনে ইংরেজ সহায়তা করেছে, সতীদাহের মতো সামাজিক অন্যায় দূরীকরণে দেশবাসীর ইচ্ছাকে তারা দিয়েছে স্বীকৃতি, নিরপেক্ষ শাসন-বিধান প্রয়োগে দেশীয় জাতি এবং সম্প্রদায় ভেদকে মান্য না করে মানবিক মূল্যকে তারা প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। নব্যবঙ্গের কর্মপদ্ধতি নির্দিষ্ট করে দিয়ে জর্জ টমসন বলেছিলেন ইংরেজ শাসনে আস্থা রেখেই তাদের চলতে হবে।[৮] আস্থা তাঁরা রেখেছিলেন। ১৮৫৭-র সিপাহি যুদ্ধের সময়ে বাঙালি শিক্ষিত সমাজ তার পরিচয় দিয়েছিলেন। ইংরেজ শাসনের সৌধ যে-দেশের মাটিতে গড়ে উঠছে, সে-মাটির থেকে প্রাণরস ধারা ক্রমেই নিঃশেষিত হয়ে চলেছে, সেদিকে তখনও মনোযোগ পড়ে নি। সেদিনের কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—

"তখন আমরা স্বজাতির স্বাধীনতার সাধনা আরম্ভ করেছিলুম, কিন্তু অন্তরে

Appeal to the Christian Public)। কিশোরীচাঁদ মিত্রও রামমোহন সম্পর্কে বলেছেন : '...he cheerfully and gratefully admitted the manifold blessings it conferred on his country and was strongly of opinion that the English were better fitted to govern it than the native themselves'— *Calcutta Review* 1845।

৮ ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বাংলার ইতিহাস, তৃতীয় ভাগ, গ্রন্থাকারে প্রকাশ ১৯০৩, দ্বিতীয় অধ্যায়।

অন্তরে ছিল ইংরেজ জাতির ঔদার্যের প্রতি বিশ্বাস। সেই বিশ্বাস এত গভীর ছিল যে এক সময়ে আমাদের সাধকেরা স্থির করেছিলেন যে এই বিজিত জাতির স্বাধীনতার পথ বিজয়ী জাতির দাক্ষিণ্যের দ্বারাই প্রশস্ত হবে। কেন না এক সময়ে অত্যাচার-প্রপীড়িত জাতির আশ্রয়স্থল ছিল ইংলণ্ডে। যারা স্বজাতির সম্মান রক্ষার জন্য প্রাণপণ করেছিল তাদের অকুণ্ঠিত আসন ছিল ইংলণ্ডে। মানবমৈত্রীর বিশুদ্ধ পরিচয় দেখেছি ইংরেজ চরিত্রে। তাই আন্তরিক শ্রদ্ধা নিয়ে ইংরেজকে হৃদয়ের উচ্চাসনে বসিয়েছিলাম। তখনো সাম্রাজ্যমদমত্ততায় তাদের স্বভাবের দাক্ষিণ্য কলুষিত হয় নি।"[৯]

ইংরেজ জাতির যে মহত্ত্বের কথা রবীন্দ্রনাথ এখানে উল্লেখ করেছেন তার প্রতি বিশ্বাস বহুদিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ থাকলেও একটি বিপরীত চিন্তার আভাস ক্রমেই পাওয়া যাচ্ছিল। এই নতুন মনোভাবের কারণ ছিল ক্রমজাগ্রত দেশাত্মবোধ। ইংরেজ শাসনের সঙ্গে সহযোগিতা করেই দেশাত্মবোধ প্রথম দিকে গড়ে উঠেছিল। রঙ্গলালের কাব্যে স্বাধীনতাহীনতার জন্য দুঃখবোধের সঙ্গে ইংরেজের কৃপাপ্রার্থনা ছিল, তেমনি ছিল ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায়। ইংরেজই আমাদের আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠতে সাহায্য করবে— ইংরেজ চরিত্রের মহত্ত্বে এই বিশ্বাসটুকু ভাঙতে দীর্ঘ সময় লেগেছিল। উইলসন হেয়ার বেথুন বেণ্টিঙ্ক মেটকাফ হারডিন্জ প্রভৃতি কয়েকজন শাসক যাঁরা এদেশীয় ভাবুক সমাজের সঙ্গে মিশে ছিলেন, তাঁদের সান্নিধ্যই ইংরেজ চরিত্রের অন্তর্নিহিত মহত্ত্বে আস্থা জন্মিয়ে দিয়েছিল। ইংরেজ-প্রবর্তিত ন্যায়নীতিও আমাদের মধ্যে মুগ্ধতার সৃষ্টি করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র স্পষ্টতই বলেছিলেন—

"ইংরেজের জন্য পৃথক বিচারালয় হউক, কিন্তু আইন পৃথক নহে। যেমন একজন দেশীয় লোক ইংরেজ বধ করিলে বধার্হ, ইংরেজ দেশী লোককে বধ করিলে আইন অনুসারে সেইরূপ বধার্হ। কিন্তু ব্রাহ্মণ রাজ্যে শূদ্রহন্তা ব্রাহ্মণের এবং ব্রাহ্মণহন্তা শূদ্রের দণ্ডের কত বৈষম্য! কে বলিবে প্রাচীন ভারতবর্ষ হইতে আধুনিক ভারতবর্ষ নিকৃষ্ট?"[১০]

ইংরেজ-প্রবর্তিত বিধিবিধানের সততাই শিক্ষিত বাঙালির চিত্তে ইংরেজ মহত্ত্বকে আকাঙ্ক্ষিত করে তুলেছিল। কিন্তু সংশয়ের সরীসৃপ একটু একটু

৯ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'সভ্যতার সঙ্কট'।

১০ বঙ্কিমচন্দ্র, 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা' (১৮৭৩)।

করে মাথা তুলতে লাগল। ইংরেজের ন্যায়বিধি চমৎকার কিন্তু তার প্রয়োগ বড়ো সহজ নয়। বঙ্কিমচন্দ্রই 'বঙ্গদেশের কৃষক' এবং 'বাঙ্গালা শাসনের কল' (১৮৭৪) প্রবন্ধ দুটিতে সে-অসুবিধার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। যদি ন্যায়বিধি প্রয়োগ করাই না যায় অথবা কঠিন হয়, তবে সে-বিধির সার্থকতা কি? সরকারি শাসনকার্যে অংশভাক্ হবার সুযোগেও বাঙালির বাধা হচ্ছিল। দেশীয় ব্যক্তিদের জীবন-ধারার সঙ্গে অপরিচয় যেমন একদিকে শাসক শ্রেণীকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছিল, তেমনি এ বিষয়ে দেশীয় ব্যক্তিদের সাহায্যকে কাজে লাগাবার অনিচ্ছাও শাসকদের প্রতি নানা সন্দেহের সৃষ্টি করে তুলছিল।[১১] এ সন্দেহেরও নানা প্রমাণ বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাতে ছড়িয়ে আছে। ইংরেজ চরিত্রের প্রতি ব্যঙ্গ তাঁর রচনায় সহজপ্রাপ্য। তিনিই ১৮৭৩ সালে ইংরেজ ও দেশীয় এই দুই সম্প্রদায়ের অসহযোগের উল্লেখ করেছিলেন; কিন্তু অসহযোগের দ্বারাই সুফল অর্জন করতেও বলেছিলেন—

"ইংরেজের নিকট অপমানগ্রস্ত উপহসিত হইলে যতদূর আমরা তাহাদিগের সমকক্ষ হইবার জন্য যত্ন করিব তাহাদিগের কাছে বাপু বাছা ইত্যাদি আদর পাইলে ততদূর করিব না— কেন না সে গায়ের জ্বালা থাকিবে। বিপক্ষের সঙ্গেই প্রতিযোগিতা ঘটে, স্বপক্ষের সঙ্গে নয়। উন্নত শত্রু উন্নতির উদ্দীপক— উন্নত বন্ধু আলস্যের আশ্রয়। আমাদিগের সৌভাগ্যক্রমেই ইংরেজের সঙ্গে আমাদিগের জাতিবৈর ঘটিয়াছে।"[১২]

এই জাতিবৈর থেকেই দেশাত্মবোধের সৃষ্টি হল। যে-সময়ে বঙ্কিম এই কথাগুলি লিখেছেন সেই সময়েই বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠায় ভারতবর্ষ ও বাংলাদেশের ইতিহাস সম্বন্ধে আত্মচেতনামূলক বিশ্লেষণাত্মক ব্যাখ্যা লিখছেন। 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এ দেশের মাতৃমূর্তি দেখা দিয়েছে, 'লোকরহস্যে' দেখা দিয়েছে ইংরেজের বৈরীমূর্তি। অবশেষে 'ধর্মতত্ত্বে' বঙ্কিম বুঝিয়েই বললেন ইংরেজের থেকে কতটুকু নিতে হবে, কোথায় তার শ্রেষ্ঠত্ব, আর দেশের ভাণ্ডারেই বা লুকিয়ে আছে কোন ঐশ্বর্য। 'কমলাকান্তে'র থেকে 'আনন্দমঠে' দেশাত্মবোধ হল তীব্রতর। ইংরেজ চরিত্রের মহত্ত্ব বঙ্কিমের চোখে যেন নিষ্প্রভ হয়ে এল, মুখ্য হয়ে উঠল

১১ দ্রষ্টব্য: ***British Paramouintcy and Indian Renaissance*, Vol. IX, Part I (1963), p 410.**

১২ বঙ্কিম-রচনাবলী, বিবিধ, 'জাতিবৈর' (১২৮০)।

দেশ ও জাতীয় চরিত্রের পরিণাম-ভাবনা। বিভিন্ন প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের আধুনিক সভ্যতার ব্যর্থ পরিহাসের উল্লেখ করেছেন। আধুনিক সভ্যতার আলোক থেকে বঞ্চিত রামা কৈবর্ত, হাসিম শেখ, পরাণ মণ্ডল, রামধন পোদদের ভাবনা বঙ্কিমচন্দ্রকে অধিকার করল। এই বিভেদের জন্য দায়ী ইংরেজপ্রবর্তিত শিক্ষাপদ্ধতি, যার উদ্দেশ্য ছিল 'বাবু' শ্রেণী তৈরি করা এবং জনসমাজ থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে আসা।

ইংরেজ কী কৌশলে ভারতবাসীর জীবনধারা শোষণ করছিল রমেশচন্দ্র দত্ত তার জ্বলন্ত বর্ণনা দেবার আগে আর-একজন ঋষিকল্প ব্যক্তি ধীর গম্ভীরভাবে এই সর্বনাশের দিকে আমাদের দৃষ্টি ফেরাবার চেষ্টা করেছিলেন। কঠিন নিরপেক্ষতার সঙ্গেই ভূদেব মুখোপাধ্যায় নতুন সভ্যতার সুফল-কুফল বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। দশটি সূত্রে তিনি তাঁর এই আলোচনাকে সংহত করে দেখিয়েছিলেন। তার ষষ্ঠ ও সপ্তম সূত্র যথাক্রমে এই—

"শুল্ক বা বাণিজ্যকর আদায় সম্বন্ধে বৈদেশিক ভাব এই যে যাহাতে ইংরাজী শিল্পজাত ভারতে বিক্রীত হয় তদনুকূল ব্যবস্থা প্রণয়ন হওয়াতে দেশীয় শিল্পের বিলোপসাধন ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে।

স্বায়ত্তশাসন প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু শাসন ক্ষমতা প্রায় সমুদায়ই ইংরাজ কর্মচারীর হস্তগত।"[১৩]

রমেশচন্দ্র দত্ত এবং সখারাম গণেশ দেউস্কর বহু তথ্যপ্রমাণ-সহযোগে যে কথা বলেছিলেন, ভূদেবও সংক্ষেপে সেই কথাই বলেছিলেন। পূর্ববর্তীর রচনাতে তখনও কোনো তিক্ততা ফুটে ওঠে নি, রমেশচন্দ্র হয়তো তখনও ভেবেছিলেন রাজকার্যে ভারতীয়দের অধিকতর সুযোগ দিলে এইসব দোষ এড়ানো যাবে। ইংরেজের শাসনযন্ত্রে ভারতীয়রা অধিক সংখ্যায় স্থান গ্রহণ করতে পারলে সেও এক রকমেরই স্বায়ত্তশাসনই হবে। তাতে পীড়ন যেমন কম হবে তেমনি দেশীয় লোকসমাজে আত্মনিয়ন্ত্রণের আত্মপ্রসাদ আসবে। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে রমেশচন্দ্র দত্ত England and India নামে একটি বই প্রকাশ করেন। তাতে ইংরেজ ও ভারতবাসীর সম্পর্কের বর্ধমান বিচ্ছেদের উল্লেখ করে তিনি বলেন—

"A feeling of unrest is perceptible in India, not of unrest

১৩ সামাজিক প্রবন্ধ (১৮৯২) ইংরেজাধিকার— ইংরাজের বৈদেশিক ভাব

under the British rule, but of unrest under a form of government framed forty years ago and which no longer suits the circumstances of the present day. Indian opinion seeks to be heard, and is not heard ; Indian feeling seeks to be represented and is not represented."[১৪]

ইংরেজ শাসনের প্রতি যে-প্রত্যাশা নিয়ে আমাদের আধুনিক যুগের যাত্রা শুরু হয়েছিল, ঐ শতাব্দীর শেষে সে-প্রত্যাশা ফুরিয়ে এল। ইংরেজের প্রতি আমাদের সন্দিগ্ধতার উল্লেখ করেছেন রমেশচন্দ্র, ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি অধিকতর মনোযোগ দেবার পরামর্শও দিয়েছিলেন, কিন্তু যে সর্বনাশ ইতিমধ্যেই হয়ে গিয়েছে তার বিবরণ দিয়েছেন রমেশচন্দ্র তার পরের বই The Economic History of India (1901)-তে। কিন্তু ইতিমধ্যেই ইংরেজের প্রতি আমাদের অবিশ্বাসের পাত্র পূর্ণ হয়েছে। যে ইংরেজ ভারতবর্ষ শাসন করছে তার কাছ থেকে আমাদের পাওয়ার আর কিছু নেই। বাহুবলে যে কোটি কোটি লোককে পদানত করে রেখেছে, বাহুবল দিয়ে তার প্রতিকার হবে না। প্রতিকারের একমাত্র উপায় আত্মগঠন, চরিত্রবল— আমাদের স্বভাবকে ক্ষুদ্রতামুক্ত করা। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চৈতন্য লাইব্রেরিতে বঙ্কিমচন্দ্রের সভাপতিত্বে পঠিত রবীন্দ্রনাথের 'ইংরেজ ও ভারতবাসী' প্রবন্ধে একথাই বলা হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর পূর্বোক্ত প্রবন্ধে যে সুফল লাভের জন্য ইংরেজ শাসনকে সহ্য করতে বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে তার কোনো কথা নেই, এমন কি রমেশচন্দ্র শাসনকার্যের দায়িত্ব দিয়ে ভারতবাসীর অবিশ্বাস দূর করার প্রস্তাব করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ সে-চিন্তাও করেন নি। তিনি বললেন—

"সকল দিক পর্যালোচনা করিয়া রাজাপ্রজার বিদ্বেষভাব শমিত রাখিবার প্রকৃষ্ট উপায় এই দেখা যাইতেছে ইংরেজ হইতে দূরে থাকিয়া আমাদের নিকট কর্তব্যসকল পালনে একান্ত মনে নিযুক্ত হওয়া। কেবল মাত্র ভিক্ষা করিয়া কখনোই আমাদের মনের যথার্থ সন্তোষ হইবে না। আজ আমরা মনে করিতেছি ইংরেজের নিকট হইতে কতকগুলি অধিকার পাইলেই আমাদের সকল দুঃখ দূর হইবে।…আমাদের অন্তরের শূন্যতা না পুরাইতে পারিলে কিছুতেই আমাদের শান্তি নাই। আমাদের স্বভাবকে সমস্ত ক্ষুদ্রতার বন্ধন হইতে মুক্ত

১৪ জে. এন. গুপ্ত-প্রণীত *Life and Works of Romesh Chunder Dutt* (1911) গ্রন্থে উদ্ধৃত। p 380।

করিতে পারিলে তবেই আমাদের যথার্থ দৈন্য দূর হইবে এবং তখন আমরা তেজের সহিত, সম্মানের সহিত রাজ সাক্ষাতে যাতায়াত করিতে পারিব।"[১৫]

এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের যে পন্থা নির্দেশ করেছেন, বস্তুত সেটা সমাধানই নয়। তিনি সমস্যার কোনো নির্দিষ্ট সমাধান না দিয়ে পরামর্শ দিয়েছেন নিজেদের চারিত্রিক দোষত্রুটিগুলি সংশোধন করতে। বঙ্কিমচন্দ্র ব্যঙ্গ করে, ভৎর্সনা করে, সমালোচনা করে বাঙালিকে বলেছিলেন তার চরিত্রধর্মকে গঠন করতে। স্বামী বিবেকানন্দের রচনার মূল বক্তব্য ছিল ত্যাগ বীর্য সেবার দ্বারা চরিত্রগঠন। এজন্য সেকালের সাহিত্যে নীতির প্ররোচনা যেন বেশি বলেই মনে হয় আজ আমাদের কাছে।

ইংরেজ সম্বন্ধে বাঙালির মনোভাব আধুনিক যুগের প্রারম্ভকাল থেকে ধীরে ধীরে কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে, প্রধানত সাহিত্য থেকে তার পরম্পরাগুলি বোঝা যায়। কিন্তু আমাদের বাস্তব ক্ষেত্রে এই পরিবর্তমান মনোভাবের যে কারণ নিহিত ছিল, তার জলন্ত তথ্যসমৃদ্ধ ইতিহাস দিয়েছেন রমেশচন্দ্র ডিগবি দাদাভাই নৌরোজি প্রভৃতি। সখারাম 'দেশের কথা'র উপকরণ এঁদের বই থেকেই সংগ্রহ করেছিলেন। এছাড়া নানা রিপোর্ট ও গ্রন্থের প্রভূত সাহায্য নিয়ে সখারাম ইংরেজ শাসনের কুফল বর্ণনা করেছিলেন। শুধুমাত্র দেশীয় ঐতিহাসিক ও পণ্ডিতের অভিমত দিয়ে তিনি বই রচনা করেন নি। সরকারের পক্ষে বিশেষ অসুবিধাজনক হয়েছিল বিদেশীদেরই স্বীকৃতি। সখারাম গভর্নর এবং ভাইসরয়দের অর্থপূর্ণ মন্তব্যগুলি উদ্‌ধৃত করেছিলেন, যার ভিতর দিয়ে ইংরেজের রাজনৈতিক অভিপ্রায় প্রকাশ পেয়েছে। মেকলে লিটন নর্থব্রুক মনরো টাউনসেণ্ড কটন প্রভৃতির উক্তিগুলি সখারাম বর্ণিত দেশের শোচনীয়তাকে আরও উজ্জ্বল করে তুলেছে। বিদেশী রাজপুরুষেরা ভবিষ্যৎ কালের জন্য স্বজাতির উদ্দেশ্যে যে সতর্কতার বাণী উচ্চারণ করেছিলেন, সেদিন ইংরেজ সে-কথায় কর্ণপাত করে নি। সখারাম যখন লিখেছেন তখন অবস্থা চরমে পৌঁছে গিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক প্রবন্ধগুলিতে 'ছোট ইংরেজ' এবং 'বড়ো ইংরেজে'র শ্রেণী-নির্দেশ পাওয়া যায়,[১৬] উনিশ শতকের বাঙালি বড়ো ইংরেজেরই ভরসা করেছিল, কিন্তু দেখা গেল ছোটো ইংরেজ সে-ভরসাকে চূর্ণ করেছে।

১৫ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজাপ্রজা, 'ইংরেজ ও ভারতবাসী' (১৮৯৩)।

১৬ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর. কালান্তর, 'ছোটো ও বড়ো' (১৯১৭)।

সখারাম বড়ো ইংরেজের মন্তব্য দিয়ে ছোটো ইংরেজের কুকীর্তিকে উদ্‌ঘাটিত করেছিলেন।

'দেশের কথা' রচিত হয়েছিল জাতীয় মহাসমিতির আরব্ধ কাজে সহায়তা করবার উদ্দেশ্যে— এ কথা সখারাম বইয়ের ভূমিকাতেই বলেছেন। ডিগবীর The Prosperous British India— A Revelation from official Records (London 1901), দাদাভাই নৌরোজির Poverty and un-British Rule in India (London 1876-1901), রমেশচন্দ্র দত্তের The Economic History of India (1901) প্রভৃতি বই সাধারণ পাঠকেরা হয়তো পড়ে নি ইংরেজি ভালো করে না জানার জন্যই। 'দেশের কথা'য় সখারাম তাদের সংগৃহীত তথ্যগুলিই সর্বসাধারণের উপযোগী করে প্রকাশ করেছেন।[১৭] ভূমিকায় তিনি স্পষ্টই বলেছেন রাজশক্তির যথেচ্ছাচারের বাধা প্রজার তরফ থেকেই আসা উচিত। 'আমাদের আন্দোলন ভিক্ষুকের আবেদন মাত্র। আমাদিগকে দাতার করুণার উপর একান্তই নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকিতে হয়'— সখারামের এই কথাগুলি ইঙ্গিতপূর্ণ। তিনি মডারেটপন্থী ছিলেন না, ছিলেন তিলকপন্থী। বঙ্কিম-কথিত বৃষজাতীয় পলিটিক্‌সের তিনি ছিলেন ভক্ত। সখারাম প্রত্যক্ষভাবেই রাজনৈতিক আন্দোলনে সাহায্য করেছিলেন, বিপ্লবীদের ক্লাশ নিয়ে। শ্রীঅরবিন্দের নির্দেশে 'দেশের কথা' রচিত বলে শোনা যায়। বইটি নিস্পৃহ ইতিহাস নয়, এর পিছনে সচেতন উদ্দেশ্য ছিল। যুগসঞ্চিত কারণে এই বইয়ের জন্ম। এতে ইংরেজ শাসনের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক কুফলের সঙ্গে নৈতিক অধোগতির বিবরণও ছিল।

বইয়ের শেষ অধ্যায়টি (সম্মোহন— চিত্তবিজয়) বিশেষভাবেই প্রণিধানযোগ্য। আমাদের মূল্যবোধের ক্ষেত্রে, ধ্যানধারণা ভালোমন্দ বিচারবোধের ক্ষেত্রে ইংরেজ শাসন যে গুরুতর পারিবর্তন এনেছিল, এই অধ্যায়টিতে তার

১৭ 'দেশের কথা'র সূচীটি (১৯০৪ সং) উদ্‌ধৃত করছি: আমাদের দেশ ; ইংরাজ শাসনের দোষ গুণ : দেশের অবস্থা ; মানসিক অবনতি ; কৃষকের সর্বনাশ ; রেল ও খাল ; বঙ্গীয় শিল্পিকুলের সর্বনাশ ; দেশীয় শিল্পের ধ্বংস ; দেশের আয়-ব্যয় ; সম্মোহন—চিত্তবিজয়। পরিশিষ্টে : বিনিময়ে ক্ষতি ; আদমসুমারির তালিকা ; শিক্ষার তালিকা ; ভারতীয় কৃষকের অবস্থা ; দেশীয় রাজ্যের উত্তমর্ণ ; বঙ্গে পাশ্চাত্য বর্গী ; কৃষকের অবস্থা ; মিশনারিদিগের কুসংস্কার ; সামরিক ব্যয় ; দেশীয় রাজন্যবৃন্দ ; স্বাধীন হিন্দুরাজ্য নেপাল ; লবণে রাজস্ব ; দেশের আয় ব্যয়। মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৪২।

বিস্তৃত আবেগপূর্ণ আলোচনা আছে। এককালে ইংরেজি শিক্ষার মহত্ত্বে মুগ্ধ বাঙালির আজ প্রয়োজন ষাট বছর পরে সেই শিক্ষার ফল বিচার করে দেখা। পাশ্চাত্য শিক্ষার একটি প্রধান ফল 'বুদ্ধিবৃত্তিকে মোহাভিভূত' করেও 'আত্মাভিমান এবং আত্মশক্তির প্রতি বিশ্বাস' নষ্ট করা।[১৮] বিজয়ী জাতির প্রতি সম্ভ্রমে বিজিত জাতি নিজের প্রতি শ্রদ্ধাকে হারিয়েছে; শিক্ষিত-অশিক্ষিতের মধ্যে প্রভেদ বেড়েছে। পরাধীনতার ফলে চিত্তবৃত্তির অবনতি ঘটেছে পরস্পরে সংশয় ও ঘৃণা বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরা স্বার্থপর ও দায়িত্বজ্ঞানশূন্য হয়েছি। ইংরেজ শাসনে ভারতবাসী সভ্য হয়েছে, এই মিথ্যা কিংবদন্তির অন্তঃসারশূন্যতা দেখিয়ে সখারাম বলেছেন, "এই তত্ত্ব ইংরাজী শিক্ষার মোহে আমরা সকল সময়ে উপলব্ধি করিতে না পারিয়া আপনাদিগকে পাশ্চাত্যদিগের অপেক্ষা স্বভাবতঃ হীন বলিয়া মনে করি।" ইংরেজি শিক্ষার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার। সখারাম বলছেন, শাসক কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞান প্রচারে নানা প্রতিকূলতাই করেছেন। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের লক্ষ্যই বা কি? বিশ্বের ঐক্যকে বিশ্লেষণ করে অনৈক্যকে উদ্ঘাটিত করা। পক্ষান্তরে অদ্বৈতবাদের অপ্রতিরোধ্য প্রভাবে ভারতবাসীর লক্ষ্য বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান। বিরোধকে গ্রাস করে ঐক্যাভিমুখী করে তোলাই ভারতবর্ষীয় বৈশিষ্ট্য।[১৯] সখারাম বিস্তৃতভাবে দেখাবার চেষ্টা করেছেন আমাদের দেশের দুই প্রধান সম্প্রদায় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিরোধ সেভাবে কখনোই ছিল না। ইংরেজের ভেদনীতিই বিরোধ সৃষ্টি করেছে। হিন্দু-মুসলমান সম্বন্ধে সখারামের মৈত্রীসূচক দৃষ্টিভঙ্গির মূল্য এবং তাৎপর্য অনেকখানি। তিলকপন্থী সখারামের জাতীয়তাবোধ উদারতাচিহ্নিত। তিনি বলেছেন, "হিন্দু ধর্মের এই 'বিরোধগ্রাসিতা' বা সামঞ্জস্যসাধনী শক্তির জন্য ইসলামভক্ত মুসলমানও হিন্দুর চিরবিদ্বেষের পাত্র হন নাই।" এই প্রসঙ্গে তিনি হিতবাদী পত্রিকার একটি মন্তব্য তুলেছেন, "মুসলমান শাসনপ্রণালী কষ্টকর ছিল, একথা আমরা স্বীকার করি না। যখন অল্প আয়ে এত অভাব হইত না,

১৮ বস্তুত ঐতিহাসিকদের মত এই যে, ইংরেজী শিক্ষা পেয়ে বশংবদ কেরানীকুল সৃষ্টি হবে—শাসন-কর্তৃপক্ষের মনে এই অভিসন্ধি থাকলেও ফল হয়েছিল বিপরীত। জ্ঞানবিজ্ঞান এবং মুক্তবুদ্ধির সাধনাকে ইংরেজি শিক্ষাই প্রশস্ত করেছিল। রবীন্দ্রনাথ 'শিক্ষার মিলন' প্রভৃতি প্রবন্ধে পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে সহযোগিতা বর্জন করাকেই বলেছিলেন অজ্ঞতা।

১৯ রবীন্দ্রনাথ 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' (১৯০২) প্রবন্ধে এই তত্ত্বের কথা বলেছিলেন।

দেশের লোকে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে রাজসরকারে সর্বোচ্চ পদ পর্যন্ত প্রাপ্ত হইত, দেশের টাকা দেশেই থাকিত, একখানা বড় ছোরা রাখিতে হইলে 'পাশ' লইতে হইত না, এত লোক অনাহারে কষ্ট পাইত না, তখনকার অবস্থা যে বর্তমান অবস্থা অপেক্ষা অধিকতর শোচনীয় ছিল একথা কেমন করিয়া বলিব? হিন্দুরাজ্যে মুসলমান গুণীর আদর ছিল, মুসলমান রাজ্যে হিন্দু গুণবানের উন্নতি হইত। এ সকল কথা আমরা ইংরাজের কল্পিত কথায় ভুলিতে পারি না।"[২০]

মুসলমান রাজত্ব সম্বন্ধে এই পরিবর্তিত মনোভাব নিশ্চয়ই লক্ষ্য করবার যোগ্য। অবশ্য ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মতো আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ পূর্বেই এই নতুনতর দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা করে গিয়েছিলেন। এক্সট্রিমিষ্টদের হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রসঙ্গে সখারাম এবং হিতবাদীর এই চিন্তাধারা নিশ্চয়ই বিশেষভাবে বিবেচ্য। মুসলমানরা নয়, খ্রীষ্টানরাই ছিল নিপীড়ন-পারদর্শী, এমন কথা সখারাম বলেছিলেন, সেটা কতটা ইতিহাসসম্মত কতটা দেশাত্মবোধক প্রয়োজনসম্মত বলতে পারি না। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'মিথ্যাময়ী ইতিবৃত্ত কথা'। সখারাম রবীন্দ্রনাথের 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' প্রবন্ধ থেকে উদ্‌ধৃতি দিয়ে বলেছেন বিদেশি প্রয়োজনেই ইতিহাস হয়েছে মিথ্যাময়। আমরা যে দেশের সত্যকার ইতিহাস জানতেও পারি না ইংরেজি শিক্ষার বহু কুফলের মধ্যে এটি একটি। নিজেদের সম্বন্ধে এমন অজ্ঞতা সৃষ্টির আয়োজন আর নেই। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর 'সামাজিক ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার' প্রবন্ধ থেকে উদ্‌ধৃতি দিয়ে গ্রন্থ সমাপ্ত করতে গিয়ে সখারাম যা বলেছিলেন সেটিই 'দেশের কথা'র মর্ম : "রাজনীতিক উদ্দেশ্য সৃষ্ট এই মোহের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভের পক্ষে স্বদেশপ্রীতিই একমাত্র মহৌষধ। পাশ্চাত্য সংস্রবে আমাদিগের সমাজ-শরীরে যে বিষ প্রবিষ্ট হইয়াছে, যে জাতীয় ও নৈতিক অধঃপতনের বীজ সর্বত্র উপ্ত হইয়াছে তাহার অনিষ্টকারিতা দূর করিবার পক্ষে স্বজাতি-প্রেমই একমাত্র উপায়।"

'দেশের কথা' স্বদেশপ্রীতির শিখাকে নভোস্পর্শী করেছিল। সেকালের দেশব্রতী যুবকেরা এই বইখানিকে প্রায় ধর্মগ্রন্থের মর্যাদা দিয়েছিল। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে বইটি বাজেয়াপ্ত হল; কিন্তু গান্ধীজির আন্দোলনকাল পর্যন্ত বইটির প্রেরণা ছিল অক্ষুণ্ণ। এতে দেশের যে শোচনীয় সর্বনাশের দিকটি উদ্‌ঘাটিত,

২০ দেশের কথা, ১৯০৪, পৃ ৩০৩।

তাতে ইংরেজ-বিদ্বেষ প্রবলতা লাভ করেছিল। সখারাম এই আগুন মহারাষ্ট্রের প্রাচীন ইতিহাস এবং সমকালীন রাজনীতি থেকেই সংগ্রহ করেছিলেন। বাংলা দেশেও বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন বাঙালি মনকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিয়েছে। বঙ্গভঙ্গকে ঠিক রাজনৈতিক আন্দোলন যেন বলা যায় না। এ অনেকটা একান্নবর্তী পরিবার ভাঙার সামাজিক ঘটনার মতো। অন্তত রবীন্দ্রনাথ রামেন্দ্র-সুন্দর প্রভৃতি ব্যক্তিগণ একে বাঙালি সৌভ্রাত্রের উপর আঘাত বলেই ভেবেছিলেন। তাঁরা যে সব পরিকল্পনা করলেন এই সন্ধিক্ষণে সে সবই হল গঠনমূলক— ইংরেজের মুখাপেক্ষী না থেকে চিন্তায় ও কর্মে নিজেদের সংগঠিত করা। সখারাম বঙ্গভঙ্গের অসন্তোষের মধ্যে দেশপ্রেমের অভিপ্রকাশ দেখলেন, তাতে তিনিও যোগ দিলেন। বাংলাদেশের এই আন্দোলনকে মহারাষ্ট্রের সমাজ সংস্কারক দলের মুখপাত্রেরা বিদ্রূপ করেছিল। বয়কট পন্থাকেও তারা নিন্দা করেছে। তখন সখারামের গুরু তিলক বাঙালির পক্ষ সমর্থনে সপ্তাহের পর সপ্তাহ প্রবন্ধ লিখেছেন। একমাত্র তাঁরই চেষ্টায় মহারাষ্ট্রের গ্রামাঞ্চলে বিলাতি পণ্য বর্জন ও পঞ্চায়েৎ প্রতিষ্ঠা হয়েছে। বন্দেমাতরমকে মরাঠা যুবকরাও গ্রহণ করে নিয়েছে।[২১] বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের মধ্যেই সখারামের বই বেরিয়েছে। এই উত্তেজনায় 'দেশের কথা' ঘৃতাহুতি দিলেও রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ জননেতারা আন্দোলনকে যে গঠনমূলক কর্মপন্থায় চালিত করতে চেয়েছিলেন 'দেশের কথা'য় তার নির্দেশ ছিল না। এই বইতে আঁকা হয়েছিল একটা প্রচণ্ড শূন্যতার দিক, শতাব্দীব্যাপী ইংরেজ শাসনের ফলে দেশের ভগ্ন দলিত ধ্বংসদশা। দীনেশচন্দ্র সেন এ বই পড়ে লিখেছিলেন—

"কোনো সাধুপুষ্পিত সুন্দর উদ্যান দাবদগ্ধ হইয়া গেলে কিংবা কোন সুদর্শন পরিচিত বন্ধুর হঠাৎ কঙ্কাল দেখিলে মনের যেরূপ অবস্থা হয় বর্তমান চিত্রে অঙ্কিত ভারতীয় শিল্প বাণিজ্যাদির অবস্থা দর্শনে সেইরূপ একটা ভাবের উদয় হইবে অথচ দেউস্কর মহাশয় কোন উত্তেজিত বক্তৃতা প্রদান করেন নাই। কতকগুলি সংখ্যাবাচক অঙ্ক এবং সেন্সাস ও ষ্ট্যাটিসটিক হইতে সমুদ্ধৃত কথা নিঃশব্দে একটি মর্মচ্ছেদী দৃশ্য উদ্‌ঘাটন করিয়া দেখাইবে। এই দৃশ্য একটি বিয়োগান্ত নাটকের ন্যায়— প্রভেদ এই যে ইহাতে কাল্পনিক দুঃখের কথা নাই, ইহা আমাদের নিজেদের দুঃখ দারিদ্র্য ও মৃত্যুর চিত্র প্রদর্শন করিতেছে।"[২২]

২১ সখারাম গণেশ দেউস্কর 'তিলকের মোকদ্দমা ও সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত' (১৩১৫), পৃ ৫১।
২২ বঙ্গদর্শন (নবপর্যায়) শ্রাবণ ১৩১১, পৃ ২১০।

এ দৃশ্য পাঠককে গভীর অসন্তোষে ও ক্ষুব্ধ বিদ্রোহে তপ্ত করে। সখারাম আমাদের দেশাত্মবোধে আগুন ধরাতে চেয়েছেন। এই উত্তেজনার মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথ দাবানলের শিখা থেকে গৃহকোণের দীপটি জ্বালতে পরামর্শ দিলেন—

"একথা যেন মনে না করি, জাতীয় স্বার্থতন্ত্রই মনুষ্যত্বের চরম লাভ। তাহার উপরেও ধর্মকে রক্ষা করিতে হইবে। মনুষ্যত্বকে ন্যাশনালত্বের চেয়ে বড়ো বলিয়া জানিতে হইবে। ন্যাশনালত্বের সুবিধার খাতিরে মনুষ্যত্বকে পদে পদে বিকাইয়া দেওয়া, মিথ্যাকে আশ্রয় করা, ছলনাকে আশ্রয় করা, নির্দয়তাকে আশ্রয় করা প্রকৃতপক্ষে ঠকা। সেইরূপ ঠকিতে ঠকিতে অবশেষে একদিন দেখা যাইবে, ন্যাশনালত্ব-যুদ্ধ দেউলে হইবার উপক্রম হইয়াছে।"[২৩]

রবীন্দ্রনাথের এই পরামর্শ 'ইংরেজ ও ভারতবাসী' প্রবন্ধে আলোচিত আদর্শ থেকে আলাদা ছিল না। কিন্তু তখন দেশে বিপ্লব-আন্দোলন গড়ে উঠেছে। অরবিন্দের মামলা, তিলকের মামলা নিয়ে দেশ উত্তেজিত। সখারামের পরবর্তী বই 'তিলকের মোকদ্দমা ও সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত' (১৩১৫) এই উত্তেজনাকে বাড়াল ছাড়া কমাল না। এতে মোকদ্দমার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দেওয়া হল। কেশরীর প্রবন্ধগুলি উদ্ধৃত হল, তার স্বকৃত অনুবাদ দিলেন সখারাম। সংবাদ-পত্রের সংবাদ, প্রতিদিনের মামলার বিবরণ, তিলকের নিজের বক্তৃতা কিছুই বাদ পড়ে নি। তাছাড়া তিলকের দণ্ডের সংবাদে সংবাদপত্র ও বিভিন্ন ব্যক্তির মন্তব্যও সংযোজিত হয়েছে। তিলককে নিয়ে হিতবাদীর সঙ্গে সখারামের মত-ভেদ হয়েছিল, হিতবাদীও তিলকের দণ্ডে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল। সখারাম এর পূর্বেই হিতবাদীর কর্ম ত্যাগ করেছিলেন। তিলকের মোকদ্দমা উপলক্ষে সখারাম আর একবার তীব্র জাতীয়তাবাদের ঢেউ তুলে দিলেন। এই বইটি সেই মুহূর্তে রচিত। ফলে 'দেশের কথা'র সেই অনিবার্য পরিণতি এল 'তিলকের মোকদ্দমা ও সংক্ষিপ্ত জীবনচরিতে'র ক্ষেত্রেও। বইটি বাজেয়াপ্ত হল। কিন্তু সখারাম গণেশ দেউস্কর দেশের চিত্তে লাভ করলেন স্থায়ী আসন।

এক্ষণ, ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৭৭।

---

২৩ বঙ্গদর্শন (নবপর্যায়) শ্রাবণ ১৩১১, পৃ ২১০। প্রবন্ধটি দীনেশচন্দ্র সেনের মন্তব্যসহ রবীন্দ্ররচনাবলী ১০ (বিশ্বভারতী সং) পরিশিষ্টে সংকলিত হয়েছে।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও বাংলার ইতিহাস

'বাঙ্গালী একটী আত্মবিস্মৃত জাতি'[১] এ কথা বলেছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী হরপ্রসাদের এই কথাটি আজকাল আমাদের মধ্যে প্রবাদে পরিণত হয়েছে। যে যুগে তিনি এই বিখ্যাত উক্তিটি করেছিলেন সে যুগ ছিল ইতিহাস সন্ধানের যুগ। বাঙালির পুরনো ইতিহাস উদ্ধারের যে প্রয়াস আরম্ভ হয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্রের যুগে, সে প্রয়াস হরপ্রসাদের উদ্যমে অধিকতর সিদ্ধিলাভ করেছিল বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই। হরপ্রসাদের পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানচর্চার পরিধি বিচার করলে বলা যায় যে তিনি ভারতবর্ষের সংস্কৃতির মূল মর্মেরই সন্ধান করে ফিরেছেন, কেবল বাংলার ইতিহাস বা বাংলার সংস্কৃতিই তাঁর প্রধান আলোচনা-ক্ষেত্র ছিল না। তথাপি বাংলার ইতিহাস তাঁর বৃহত্তর প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার অন্তর্গত ছিল। সে-ক্ষেত্রে তাঁর দান বস্তুতই ছিল মৌলিক।

বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন পত্রিকাতে বাংলার ইতিহাসের জন্য বিশেষ ব্যাকুলতা আমরা সকলেই দেখেছি। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস' (১৮৭৪) পেয়ে বঙ্কিমচন্দ্র কতখানি উৎফুল্ল হয়েছিলেন, তাও আমাদের অবিদিত নেই। তিনি নিজে নানা উপলক্ষে যে অনুসন্ধিৎসা ও আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন 'বিবিধ প্রবন্ধে'র (১৮৯২, দ্বিতীয় ভাগ) ভূমিকায় তার নির্যাসটুকু পাই এইভাবে—

"অন্যকে প্রবৃত্ত করিবার জন্য বঙ্গদর্শনে বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম।...যেমন কুলি মজুর পথ খুলিয়া দিলে, অগম্য কানন বা প্রান্তরমধ্যে সেনাপতি সেনা লইয়া প্রবেশ করিতে পারেন, আমি সেইরূপ সাহিত্যসেনাপতিদিগের জন্য সাহিত্যের সকল প্রদেশের পথ খুলিয়া দিবার চেষ্টা করিতাম। বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে আমার সেই মজুরদারির ফল এই কয়েকটি প্রবন্ধ!"

বঙ্কিমচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে যাঁর ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠেছে তিনি যে তাঁর ভাবগুরুর এই ঐকান্তিক বাসনার স্পর্শ থেকে মুক্ত থাকবেন তা নয়। এজন্যই

১ হরপ্রসাদ এই বিখ্যাত উক্তিটি করেন সপ্তম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের (১৩২০) অভিভাষণ-প্রসঙ্গে।

মনে হয়, হরপ্রসাদের যে উক্তিটি দিয়ে এই রচনাটি আরম্ভ হয়েছে সেটি যেন হরপ্রসাদের কণ্ঠে বঙ্কিমেরই উক্তি। তবু বঙ্কিমের ব্যাকুলতার সঙ্গে হরপ্রসাদের প্রয়াসের একটা পার্থক্য ছিল। বঙ্কিম প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার চেয়েও চেয়েছেন ইতিহাসের পূর্ণাঙ্গ মূর্তি। তাঁর ইতিহাস-সন্ধানের অনুপ্রেরণা জাগিয়েছিল দেশধ্যান ও স্বজাতিপ্রীতি। বঙ্কিম যখন বাংলার ইতিহাস বিষয়ক প্রবন্ধগুলি লিখেছেন, তখনও বস্তুত বাংলার ইতিহাসের উপাদান সংকলন যথোপযুক্ত হয় নি। বিশেষত তুর্কি বিজয়ের পরে বাংলার ইতিহাসের কাঠামো পাওয়া গেলেও তুর্কি বিজয়ের পূর্বেকার ইতিহাস তখনও অন্ধকারে প্রচ্ছন্ন। অথচ বঙ্কিমচন্দ্র কমলাকান্তের দপ্তরে 'কে গায় ওই' সন্দর্ভটিতে এবং মৃণালিনীতে তুর্কি বিজয়ের পরেই বাঙালির একটি গৌরবোজ্জ্বল যুগের অধ্যায়ন্তর ঘটল বলে মনে করেছেন। কিন্তু যে প্রাচীন কালটির গৌরব কল্পনা করে বঙ্কিম স্বপ্নমুগ্ধ, সেই কালটির সম্বন্ধে তখনও পর্যন্ত জানা গিয়েছে অল্পই। বঙ্কিম-চন্দ্র একদা আক্ষেপ করে বলেছিলেন রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বইয়ের সমালোচনা উপলক্ষে—

"বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র মনে করিলে স্বদেশের পুরাবৃত্তের উদ্ধার করিতে পারিতেন। কিন্তু এক্ষণে তিনি যে এ পরিশ্রম স্বীকার করিবেন, আমরা এত ভরসা করিতে পারি না।"

বঙ্কিমচন্দ্র এই কথাগুলি লিখেছিলেন ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে। এই আক্ষেপ বঙ্কিম করেছেন বিশেষ করে তুর্কি-পূর্ব যুগের বাংলার ইতিহাসের অভাব বোধ করে। রাজকৃষ্ণের বইতে 'আর্য্যশাসনকাল' নামে প্রথম অধ্যায়টি ছিল মাত্র দশ পৃষ্ঠার। এর পরিশিষ্টে 'পাল রাজবংশ' নামে একটি অধ্যায় ছিল (পৃ ৯৭-১০২)।[২] এই পরিশিষ্ট সম্ভবত প্রথম সংস্করণে ছিল না। এটি যুক্ত হয়েছিল রাজেন্দ্রলাল মিত্রের *On the Pala and the Sena Dynasties of Bengal* প্রবন্ধটি প্রকাশের পর।[৩]

অবশ্য তার পূর্বেই পাল রাজাদের সম্পর্কে অনুসন্ধানের সূচনা হয়েছে, কিন্তু উপাদানের অভাবে সে-সূচনা ছিল ক্ষীণ। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে সার চার্লস উইলকিন্স দিনাজপুরের গরুড়স্তম্ভের গায়ে উৎকীর্ণ লিপির সন্ধান পান। ১৭৮৮

---

২ 'প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস'-এর এই পৃষ্ঠাসংখ্যা নেওয়া হয়েছে ১৮৮৬-র সংস্করণ থেকে। এটি চতুস্ত্রিংশ সংস্করণ।

৩ রাজেন্দ্রলালের এই প্রবন্ধটি ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে *Indo Aryan* দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হয়।

খ্রীষ্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকার প্রথম খণ্ডে এর অনুবাদ তিনি প্রকাশ করলেন। ১৮০৭ সালে কোলব্রুক তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের আমগাছি লিপির অনুবাদ করলেন। এই দুই প্রত্নলিপি থেকেই পাল রাজাদের সম্পর্কে একটি ধারণা তৈরী হয়। এর থেকেই বাংলার প্রথম ইতিবৃত্তকার চার্লস স্টুয়ার্ট ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর ইংরেজিতে লেখা বাংলার ইতিহাসে বলেছিলেন—

"Although the Hindus of Bengal have an equal claim to antiquity and early civilisation with the other nations of India, yet we have not any authentic information respecting them during the early ages of their progress; nor is there any other positive evidence of the ancient existence of Bengal, as a separate kingdom, for any considerable period, than its distinct language and peculiar written character."

স্টুয়ার্টের বইতে তুর্কি-পূর্ব যুগ কিছুই ছিল না। ১৮৩৮-এ লেখা মার্শ-ম্যানের বাংলার ইতিহাসে ওই যুগ সম্বন্ধে একটি ছোট অধ্যায় যুক্ত হয়েছে। কিন্তু তাতেও পাল রাজাদের কথা তখনও গুরুত্ব পায় নি। মার্শম্যানের বইয়ের এই অধ্যায়ে প্রাচীন বাংলার তিনটি রাজধানী গৌড়, সোনারগাঁ এবং সাতগাঁকে কেন্দ্র করে আলোচনা আবর্তিত হয়েছে। আদিশূর এবং সেন রাজারা বাংলার ইতিহাসে দেখা দিয়েছেন, কিন্তু পাল রাজারা নেই। বস্তুত সেন রাজাদের সম্পর্কে একটা কিংবদন্তী চিরকালই চলে এসেছে কৌলীন্য প্রথার অনুবর্তনের সঙ্গে এবং কুলশাস্ত্রের প্রমাণে। সেইভাবে আদিশূরের কোনো ঐতিহাসিক পাথুরে প্রমাণ পাওয়া না গেলেও লোকস্মৃতিতে তিনি ইতিহাসেরই রূপ লাভ করেছেন। সেন রাজাদের কিছু বিবরণ মীনহাজউদ্দিনের কাহিনী থেকেই জানা যায়। মুসলমান জাতি ইতিহাস-সচেতনা ছিলেন, অতএব তুর্কি বিজয়ের পর থেকে বাংলার ইতিহাসের কাঠামো দাঁড় করানো অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল। তাঁদের লিখিত গ্রন্থই পাওয়া যায়। লক্ষ্মণসেনের সঙ্গে তুর্কি সংঘর্ষ হওয়ার ফলে সেন রাজারাও উজ্জ্বলতর হয়েছেন, কিন্তু পাল রাজাদের কাহিনী কী করে উদ্ধার হবে?

বস্তুত ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে বিনায়কপালদেবের বংশতালিকাযুক্ত একটি তাম্রলিপির অনুবাদ করতে গিয়ে রাজেন্দ্রলাল মিত্র পাল রাজাদের ইতিহাস উদ্ধারে আগ্রহী হন। অবশ্য ইতিপূর্বে সেন রাজাদের সম্পর্কেও তিনি অনুসন্ধান করছিলেন।

পরবর্তীকালে রহস্যসন্দর্ভ পত্রিকাতে (তৃতীয় পর্বে) 'সেন রাজাদিগের বংশাবলী' নামে একটি প্রবন্ধ তিনি লিখেছিলেন। কিন্তু পাল রাজাদের সম্বন্ধে জানবার একমাত্র উপায় তখন ছিল তাম্রলিপি। মহেন্দ্রপাল সম্বন্ধে রাজেন্দ্র লাল মিত্রের তাম্রলিপিনির্ভর প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান বেরিয়েছিল ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে। এই মহেন্দ্রপাল ছিলেন ভোজরাজের পুত্র।

এই সময়ের কিছু আগে থেকেই রাজেন্দ্রলালের সঙ্গে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হয়। হরপ্রসাদ রাজেন্দ্রলালের গবেষণা-সহকারীরূপে মাঝে মাঝে কাজ করতেন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে রাজেন্দ্রলালের ***The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal*** প্রকাশিত হয়। এর ভূমিকাতে রাজেন্দ্রলাল সস্নেহচিত্তে হরপ্রসাদের ঋণের উল্লেখ করেছিলেন। রাজেন্দ্রলালের কাছেই হরপ্রসাদের পুথি সংগ্রহের দীক্ষা হয়। তারপর নানাসূত্রে সারা জীবনই তিনি এই কাজে কাটিয়েছেন। এ কথাও বলা যায়, সংস্কৃত কলেজের ছাত্র হরপ্রসাদ আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণাপদ্ধতিও রাজেন্দ্রলালের কাছেই শিক্ষালাভ করেন।[৪] রাজেন্দ্রলালের উপর ভার ছিল এশিয়াটিক সোসাইটির পুথি সংগ্রহের। ১৮৭০ সাল থেকেই সোসাইটির আনুকূল্যে পুথির বিবরণ প্রকাশিত হতে থাকে। ১৮৯১-তে রাজেন্দ্রলালের মৃত্যু হলে হরপ্রসাদ সোসাইটির পুথি সংগ্রহের কাজে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন। এই দায়িত্ব-ভার নিয়ে তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে বেড়ান। এই কার্যোপলক্ষে হরপ্রসাদ চার বার নেপালে গিয়েছিলেন। আর সেই সূত্রেই আবিষ্কৃত হল বাংলার ইতিহাস ও বাংলা সাহিত্যের দুর্লভ উপাদান যার মূল্য অসীম— একটি সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত আর একটি চর্যাপদ।

সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত-এর একটি প্রধান গুরুত্ব এই যে কহ্লণের রাজতরঙ্গিনী ছাড়া এই বইটিই সম্ভবত সংস্কৃত ভাষায় লেখা সত্যকার ইতিহাস মর্যাদার অধিকারী। সংস্কৃতে 'ইতিবৃত্ত'-র গুণগান থাকলেও ইতিহাস নামক বস্তুটির বিশেষ অভাব আমাদের বিস্মিতই করে। অবশ্য সংস্কৃতে রাজাদের

৪ দ্রষ্টব্য "চল্লিশ বৎসর পূর্বে: রাজেন্দ্রলাল মিত্র", হরপ্রসাদ শাস্ত্রী স্মারকগ্রন্থ (সত্যজিৎ চৌধুরী, দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত সম্পাদিত, ১৯৭৮)।

জীবনচরিতবর্ণনা-মূলক কাব্যের অভাব নেই। হর্ষচরিত, গৌড়বহো, নবসাহসাঙ্কচরিত, বিক্রমাঙ্কদেবচরিত, কুমারপালচরিত, পৃথ্বিরাজ বিজয় প্রভৃতি যে সব বইয়ের ধারা পাই, রামচরিত সেই ধারাতেই লেখা। কিন্তু ঐতিহাসিক বলছেন—

"Among these, Rama-carita (twelfth century A. D.) is undoubtedly the best from the historical point of view."[৫]

আমাদের বিশেষ তৃপ্তির কথা এই যে রামচরিত বাংলাদেশের একজন অনন্যকর্মা রাজারই কাহিনী এবং সে কাহিনী লিখেছিলেন প্রায় প্রত্যক্ষদর্শী একজন বাঙালি কবি। রামচরিতের এই একটিই পুথি। হরপ্রসাদ ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে এটি নেপাল থেকে নিয়ে আসেন। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটির কার্যবিবরণীতে এর একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করেন। অতঃপর ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে *Memoirs of the Asiatic Society of Bengal* Vol. III রূপে এই দুর্লভ পুথিখানি সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন।[৬]

রামচরিত একটি শ্লিষ্ট কাব্য। সন্ধ্যাকর নন্দী নিজেকে বলেছেন কলিকালের বাল্মীকি—

অবদানং রঘুপরিবৃঢ়-গৌড়াধিপ-রামদেবয়োবেতৎ।
কলিযুগরামায়ণমিহ কবিরপি কলিকালবাল্মীকিঃ ॥

—রামচরিত, কবিপ্রশস্তি।

এই কাব্যখানিকে রামায়ণ এবং নিজেকে বাল্মীকি বলার কারণ আছে। এর প্রতি শ্লোকের দুটি করে অর্থ। এক অর্থে এটি রামায়ণের রামচরিত, অন্য অর্থে পালরাজবংশোদ্ভূত রামপালের কাহিনা। এই দুরূহ শ্লিষ্ট কাব্য-খানির অর্থোদ্ধার করা খুবই কঠিন। এই পুথির সঙ্গে দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঁয়ত্রিশটি শ্লোকের টীকাও পাওয়া যায়। ওই টীকাতেই রামপালের রাজত্বকালের

---

৫ R. C. Majumdar, *'Ideas of History in Sanskrit Literature'*. C. H. Phillips ed. *Historians of India, Pakistan and Ceylon*, Oxford University Press 1961, p 19.

৬ ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে রমেশচন্দ্র মজুমদার, রাধাগোবিন্দ বসাক, ননীগোপাল মজুমদার দ্বারা সম্পাদিত হয়ে বরেন্দ্র-অনুসন্ধান সমিতি থেকে আবার প্রকাশিত হয়। ১৯৫৩-তে রাধাগোবিন্দ বসাক এর একটা বাংলা সংস্করণ প্রকাশ করেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সংস্করণটিই রাধাগোবিন্দ আবার ইংরেজিতে চতুর্থ সংস্করণ রূপে প্রস্তুত করেছেন।

প্রধান ঘটনার বিবরণ দেওয়া আছে। রামচরিতের প্রথম তিন অধ্যায়ে রামপালের রাজ্যকালের ঘটনা, চতুর্থ অধ্যায়ে কুমারপাল, তৃতীয় গোপাল এবং মদনপালদেবের রাজ্যকালের বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে। রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের মতো রামচরিতের চতুর্থ অধ্যায়টিও 'রামোত্তরচরিত' নামে পরিচিত।

তুর্কি-পূর্ব যুগের বাংলাদেশের রাজবৃত্তে দুটি গৌরবপূর্ণ অধ্যায় আছে। একটি ধর্মপালের আর-একটি রামপালের। তেমনি আছে দুটি বিপ্লবের চমকপ্রদ ঘটনা। একটি গোপালের রাজপদে মনোনয়ন, আর-একটি দিব্যোকের বিদ্রোহ দমন করে রামপালের রাজ্য উদ্ধার। দেশে যখন প্রচণ্ড অরাজকতা, বার বার বিদেশী রাজার আক্রমণে জনসাধারণ বিপর্যস্ত, সেই সময় প্রজারা দয়িতবিষ্ণুর পৌত্র এবং বপ্যটের পুত্র গোপালদেবকে রাজা নির্বাচন করে। এই অসাধারণ সংবাদটি জানা যায় খালিমপুর তাম্রশাসনে আর তিব্বতীয় লামা তারনাথের 'বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে'। এই নির্বাচনের সময় ছিল অষ্টম শতাব্দীর মধ্য ভাগ। এই সময় থেকে পালবংশের রাজারা গৌড় শাসন করতে থাকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত। এই চারশ বছরের ইতিহাস বাঙালির পক্ষে গৌরবের, যদিও এর মধ্যে উত্থান-পতন, যুদ্ধ-বিগ্রহ ছিল। দুঃখের বিষয় পাল রাজ্যকালের পূর্ণাঙ্গ বিশদ ইতিহাস জানা সম্ভব নয়। যেটুকু জানা যায় তা তাম্রশাসন ও শিলালিপির অমোঘ প্রমাণের সাহায্যে। কিন্তু সেই দূর অতীতের মধ্যে এই প্রমাণের আলো ফেলে মাঝে মাঝে পথরেখা আলোকিত হলেও আমাদের আকাঙ্ক্ষার তুলনায় তা নেহাৎই স্বল্প। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর গবেষণা অবশ্য শিলালিপির চেয়েও পুথি-প্রমাণকেই বেশি করে অবলম্বন করেছিল। কিন্তু পালরাজগণের ইতিহাস 'পাথুরে প্রমাণ' ছাড়া জানবার উপায় নেই। বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি (১৯১০) এই যুগের ইতিহাস উদ্ধারে ব্রতী হয়ে হরপ্রসাদ-কথিত 'পাথুরে প্রমাণ' সংকলন করে প্রকাশ করেছিলেন 'গৌড়-লেখমালা'। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির সদস্যগণ বিংশ শতকের প্রথম দিকে পাল ও সেন রাজবংশের ইতিহাস উদ্ধারে নিযুক্ত হয়েছিলেন। দুয়ের মধ্যে কিছু রেষারেষিও ছিল।[৭] শিলালিপি ও তাম্রশাসন ছাড়া আর যে উপকরণ সেকালে ব্যবহৃত হয়েছে, তা হচ্ছে নগেন্দ্রনাথ বসুর বহু

---

৭ এই বিবরণ দ্রষ্টব্য রমেশচন্দ্র মজুমদার-প্রণীত 'হরপ্রসাদ শাস্ত্রী', পূর্বোক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী স্মারকগ্রন্থ।

ব্যবহৃত কুলশাস্ত্র। হরপ্রসাদ নেপাল থেকে যে সব প্রাচীন পুথি নিয়ে এসেছিলেন, তাতে যে সব দুর্লভ উপকরণ সংগৃহীত আছে তার মূল্যও আজ অসাধারণ। কুলশাস্ত্রের প্রমাণ আজকাল ঐতিহাসিকেরা নির্বিচারে গ্রহণ করেন না। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাঙ্গালার ইতিহাস'-এর ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের পরিশিষ্টে দীর্ঘ আলোচনা করে 'বঙ্গদেশীয় কুলশাস্ত্রের ঐতিহাসিক প্রমাণের অসারতা প্রতিপন্ন' করতে চেষ্টা করেছেন।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির উপর সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট না থাকলেও তিনি যে প্রাচীন পুথি অবলম্বনে তাঁর গুরু রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতোই গবেষণা সূত্রে বাংলার ইতিহাস উদ্ধার করতে চেয়েছিলেন, তাঁর সেই প্রয়াসের মূল্য আজ সর্বজনস্বীকৃত। রামচরিত পালযুগের ইতিহাস রচনার প্রধানতম উপকরণ। বঙ্কিমচন্দ্র যে যুগের ইতিহাসের জন্য হাহাকার করেছেন, হরপ্রসাদ সেই যুগেরই উপকরণ এনে দিয়েছেন। পাল রাজারা অন্তত তিনবার তাঁদের রাজ্যের সীমা সম্প্রসারণ করে সাম্রাজ্যে পরিণত করেছিলেন,— ধর্মপালের সময়, মহীপালের সময় এবং রামপালের সময়। রামপালের সময় আনুমানিক ১০৭৭ থেকে ১১২০ খ্রীষ্টাব্দ। রামপালের রাজত্বকালেই রাঢ়ে সেন রাজবংশের পত্তন হয়েছে।

তৃতীয় বিগ্রহপাল (আ ১০৫৫-১০৭০) যখন গৌড়-মগধের রাজা, তখনই বৈদেশিক আক্রমণ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। বিগ্রহপালের তিন পুত্র— দ্বিতীয় মহীপাল, দ্বিতীয় শূরপাল ও রামপাল। দ্বিতীয় মহীপাল রাজা হয়ে, তাঁর দুই ভাই রাজ্যের অন্তর্বিপ্লবে যুক্ত এই সন্দেহে, দুজনকেই কারারুদ্ধ করেছিলেন। এদিকে বরেন্দ্রভূমির সামন্তরা প্রকাশ্যে বিদ্রোহী হল। সেই যুদ্ধে মহীপাল নিহত হলেন। এই বিদ্রোহের নায়ক ছিলেন কৈবর্তজাতীয় নায়ক দিব্য। তিনিই হলেন রাজা। রামচরিতে দিব্যকে বলা হয়েছে দস্যু। সেখানে 'দিব্য'-র নাম দিব্বোক। মহীপালের মৃত্যুর পর তাঁর ভাই দ্বিতীয় শূরপাল কিছুকাল রাজত্ব করেন। শূরপালের পর রাজা হন রামপাল। রামপাল যখন রাজা হন তখন পালরাজ্য ছিন্নভিন্ন। তাঁর অধিকারসীমা সম্ভবত তখন খুবই সংকীর্ণ— রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুমান, সেটুকু ছিল ভাগীরথী ও পদ্মার মধ্যস্থিত ব-দ্বীপ মাত্র। রামপাল রাজা হয়ে তাঁর পিতৃভূমি উদ্ধারে উদ্যোগী হলেন। সন্ধ্যাকর নন্দী বরেন্দ্রভূমিকেই বলেছেন পালরাজাদের পিতৃভূমি— 'জনকভূ'। রামপালের পিতৃভূমি উদ্ধারই রামচরিতের মূল বিষয়। তাঁর এই

যুদ্ধোদ্যম মহাকাব্যেরই উপযুক্ত বিষয়। এতে রামপালের যে সংগঠনক্ষমতা, ধৈর্য, রণনৈপুণ্য প্রকাশ পেয়েছে তা বাঙালিমাত্রেরই গর্বের বস্তু।

কৈবর্তগণ অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল। রামপাল তাদের প্রথমে এঁটে উঠতে পারেন নি। তারপর তিনি সামন্তদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য বেরিয়ে পড়লেন। যাদের সৈন্যসাহায্য নিয়ে রামপাল বরেন্দ্র আক্রমণ করেছিলেন রামচরিতে তাদের নাম আছে। মোটামুটি তারা মগধ ও রাঢ় দেশের। রামপালকে বিশেষ সাহায্য করেছেন তাঁর মামা রাষ্ট্রকূট-তিলক মথন। তাঁর দুই পুত্র কাহ্নরদেব ও সুবর্ণদেব এবং ভ্রাতুষ্পুত্র মহাপ্রতীহার শিবরাজ ছিলেন রামপালের প্রধান সহায়ক। অতঃপর রামপাল দক্ষিণ দিক থেকে গঙ্গা পার হয়ে বিপুল সৈন্যসহ কৈবর্তরাজ ভীমকে আক্রমণ করলেন। ভীম দিব্বোকের ভাই রুদোকের পুত্র। তখন উত্তরবঙ্গের রাজা ভীম। এই যুদ্ধে পরাজিত ভীমকে বন্দী ও পরে নিহত করা হয়।

বহুদিন পর রামপাল পিতৃভূমি ফিরে পেলেন। রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠা করলেন। তিনি একটি নতুন নগরীর প্রতিষ্ঠাও করেছিলেন, তার নাম রামাবতী। রামপাল সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে নানা রাজ্য জয় করলেন। পূর্বদিকে বঙ্গ ও কামরূপ, দক্ষিণে উৎকল ও কলিঙ্গ। রামপালের রাজত্বকালে কর্ণাটকদের প্রভুত্ব ছড়িয়ে পড়তে থাকে, কিন্তু রামপালই তাকে বাধা দেন। অবশ্য তাঁর মৃত্যুর পর সে বাধা আর ছিল না। ওদিকে বর্তমান উত্তরপ্রদেশে গাহড়বাল বংশীয় রাজাদের সঙ্গেও রামপালের যুদ্ধ হয়েছে। এই যুদ্ধে রামপালেরই জয় হয়েছিল বলে মনে হয়। গাহড়বালরাজ গোবিন্দচন্দ্রের রানী কুমারদেবী রামপালের মামা মথনের দৌহিত্রী। সম্ভবত মথনই বিবাহ-সম্পর্ক ঘটিয়ে দুই রাজ্যের মধ্যে মিত্রতা স্থাপন করিয়েছিলেন। মথন শুধু রামপালের মামা নন, তাঁর এতবড় শুভানুধ্যায়ী আর কেউ ছিল না। বৃদ্ধ বয়সে রামপাল তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র রাজ্যপালদেবের হাতে রাজ্যভার সমর্পণ করে রামাবতীতেই বাস করতেন। একবার তিনি যখন মুদ্গগিরি বা বর্তমান মুঙ্গেরে ছিলেন, তখন মামা মথনের মৃত্যুসংবাদ এসে পৌঁছল। এই সংবাদে শোকার্ত হয়ে রামপালদেব ব্রাহ্মণদের ধন দান করে গঙ্গাসলিলে আত্মবিসর্জন দিলেন। রামপাল বিয়াল্লিশ বছরেরও বেশি রাজত্ব করেন।

সত্যসত্যই রামপালের জীবনকাহিনী বড় বিচিত্র। এই বিচিত্র কাহিনীর সঙ্গে জড়িত আমাদের বাংলাদেশের এক বিপুল বিশাল রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠার

রোমাঞ্চকর ইতিহাস। এই ইতিহাসে আমাদের শিক্ষণীয়তা, গৌরববোধ করবার মতো ঘটনাসমাবেশ, স্মরণীয় চরিত্র-মাহাত্ম্য, বাঙালির রাজনৈতিক দক্ষতা, আত্মত্যাগ, সাংগঠনিক ক্ষমতার দৃষ্টান্ত যেমন আছে, তার তুলনা খুব বেশি নেই। এই কাহিনী যিনি কাব্যে গেঁথেছেন সেই সন্ধ্যাকর নন্দী বরেন্দ্র পুণ্ড্রবর্ধনের কাছে বাস করতেন। তাঁর পিতা প্রজাপতি নন্দী রামপালদেবের সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন। রামচরিত তাই পাথুরে প্রমাণের মতোই গ্রাহ্য।

তিন

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর আবিষ্কৃত রামচরিতখানা বাংলার একটি যুগের রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন অধ্যায়কে আলোকিত করেছে। কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয় মূলত ছিলেন ধর্ম-সমাজ-সংস্কৃতির অনুসন্ধিৎসু গবেষক। তুর্কি বিজয়ের পূর্বেকার বাংলার জনজীবনের একটা ইতিহাস মোটামুটি আমরা তাঁর হাত থেকেই পাই। নেপাল যাত্রার ফলে তিনি বৌদ্ধ সহজিয়াতন্ত্রের যে পুঁথি আবিষ্কার করে এনেছিলেন, সেটা বাংলা ভাষা-সাহিত্যের ইতিহাসে শাশ্বত দান। কিন্তু ভাষা-সাহিত্য ছাড়াও পালযুগের জীবনের যে নিবিড় পরিচয় তিনি উদ্ধার করেছেন, তাকে নতুন করে জীবন্ত করে তুলেছেন 'বেণের মেয়ে' উপন্যাসে।[৮] একাদশ শতাব্দীর গৌড়বঙ্গে ও বরেন্দ্রভূমির রাজনৈতিক আবহাওয়া, ধর্ম ও সমাজীবনের অত্যন্ত খুঁটিনাটি বিবরণ রাস্তাঘাট জনপদ ও অন্যান্য ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক তথ্যগুলি ঔপন্যাসিক কাহিনী গ্রন্থনে প্রত্যক্ষবৎ হয়ে উঠেছে।

'বেণের মেয়ে' উপন্যাসের 'মুখপাতে' লেখক বলছেন—

"'বেণের মেয়ে' ইতিহাস নয়, সুতরাং ঐতিহাসিক উপন্যাসও নয়। কেন না, আজকালকার 'বিজ্ঞান-সঙ্গত' ইতিহাসের দিনে পাথুরে প্রমাণ ভিন্ন ইতিহাসই হয় না। আমাদের রক্তমাংসের শরীর, আমরা পাথুরে নই, কখন হইতেও চাই না। 'বেণের মেয়ে' একটা গল্প। অন্য পাঁচটা গল্প যেমন আছে, এও

---

৮ "সেই চলমান মানব প্রবাহের জীবন্তরূপ সমসাময়িক কোনো সাহিত্যে কেহ ধরিয়া রাখেন নাই : অন্ততঃ তেমন উপাদান আমাদের সম্মুখে উপস্থিত নাই। তবু তথ্যগত ইতিহাসের উপর নির্ভর করিয়া আধুনিক সাহিত্য রচয়িতারা সেদিকে কিছু কিছু সার্থক চেষ্টা করিয়াছেন। রাখাল-দাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ঐতিহাসিক উপন্যাস শশাঙ্ক ও ধর্মপাল, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের 'বেণের মেয়ে' সে চেষ্টার উৎকৃষ্ট নিদর্শন"।—নীহাররঞ্জন রায়, 'বাঙ্গালীর ইতিহাস', ১৩৫৬, পৃ ৫৩৩।

তাই। তবে এতে এ-কালের কথা নাই। সব সেই কালের, যে কালে বাঙ্গলার সব ছিল। বাঙ্গলার হাতী ছিল, ঘোড়া ছিল, জাহাজ ছিল, ব্যবসায় ছিল, বাণিজ্য ছিল, শিল্প ছিল, কলা ছিল।…”

এই কথাগুলির মধ্যে লেখকের ক্ষোভ যাই ব্যক্ত হোক না কেন, এতে বাংলার অতীতের ইতিহাসজ্ঞানের যে অটলতা ধ্বনিত হয়েছে, হরপ্রসাদের ব্যক্তিত্ব তাতেই ফুটে উঠেছে। যে জীবন তিনি এঁকেছেন সম্ভবত তার কোথাও মিথ্যা কল্পনা নেই। ‘ধান ভানতে মহীপালের গীত’ কিংবা ‘আগডোম বাগডোম ঘোড়াডোম সাজে’— এসব প্রবাদ প্রবচনকে তিনি সেই ইতিহাস-কল্পনার কাজে লাগিয়েছেন। সত্যই এর সবকিছুই পাথুরে প্রমাণ নয়, কিন্তু এর মধ্য দিয়ে একটি যুক্তিসঙ্গত অনুমান আমাদের অতীত ইতিহাসের শূন্যতাকে পূর্ণ কবে দেয়। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন—

“কোন দেশের ইতিহাস লিখিতে গেলে সেই দেশের ইতিহাসের যে প্রকৃত ধ্যান তাহা হৃদয়ঙ্গম করা চাই।”

হরপ্রসাদ বস্তুত বাংলার সেই ধ্যানকেই হৃদয়ঙ্গম করেছেন। এই ধ্যান দেশের রাজনৈতিক জীবন নয়, সাংস্কৃতিক জীবন দিয়েই তৈরি হয়। ‘বেণের মেয়ে’ উপন্যাস বটে কিন্তু এই উপন্যাস থেকে হিন্দু এবং বৌদ্ধসমাজের প্রকৃষ্ট চিত্র পাওয়া যায়। তখন দেশে বৌদ্ধ সহজিয়া তন্ত্রের প্রভাব, পালরাজারা ছিলেন বৌদ্ধ, কিন্তু হবপ্রসাদ দেখিয়েছেন তখনকার বৌদ্ধমত যাদের মধ্যে বিশেষ প্রচলিত, তারা সমাজের নিম্নতব শ্রেণী। এই বৌদ্ধ সমাজের সম্বন্ধে ধারণা গড়ে উঠেছিল চর্যাপদ এবং সিদ্ধাচার্যদের সম্বন্ধে জানতে গিয়ে। হরপ্রসাদের আবিষ্কৃত চর্যাপদ এই উপন্যাসে নিপুণভাবে কাজে লাগানো হয়েছে। তখন বুদ্ধ প্রচাবিত ধর্ম আস্তে আস্তে বাংলাদেশে যে লৌকিক রূপ নিচ্ছিল, তার নিদর্শন বাংলার নানা বিচিত্র আচার অনুষ্ঠান, গুরুসম্প্রদায় প্রভৃতিতেই প্রমাণিত। বৌদ্ধধর্মের এই অন্তিম অধ্যায়টি সম্বন্ধে হরপ্রসাদের কৌতূহলের সীমা ছিল না। পালরাজাদের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম এদেশ থেকে বিদায় নেয়। তুর্কি বিজয়ের ফলে দেশে যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হল সেই কারণেই বৌদ্ধধর্ম আর এদেশে স্বাভাবিক বিকাশ লাভ করতে পাবল না। ধর্মঠাকুর প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ দেবতা হরপ্রসাদের এই মতটি সর্বজনস্বীকৃত নয় বটে, কিন্তু বাঙালির আচার অনুষ্ঠান লৌকিক ধর্ম-কর্মের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে অনেক পূর্বতন ইতিহাসের ধারাকে হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে। হরপ্রসাদ সেদিকে আমাদের দৃষ্টি ফেরাতে চেয়েছেন।

বাঙালির সমাজ একটা মিশ্রসমাজ, বাঙালির ইতিহাস রচনা করতে এর সূক্ষ্ম পর্যালোচনা করা দরকার।

আজকালকার প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিতেরা হরপ্রসাদের গবেষণার মূল্য সম্বন্ধে সন্দিহান। কিন্তু বোধহয় হরপ্রসাদের ব্যক্তিত্বের মূল মর্মটি আমরা ঠিক নির্ধারণ করতে পারি নি বলেই একথা মনে হয়। হরপ্রসাদের প্রত্নতাত্ত্বিক কাজ প্রচুর। কিন্তু তাঁর চেতনা বস্তুত নিবদ্ধ ছিল বাংলার ইতিহাসের তথ্যনির্ণয়ে মাত্র নয়, রাজবৃত্ত রচনাতেও নয়— জনসংস্কৃতির পূর্ণাঙ্গ রূপ রচনায়। আজকাল দেশে লোকসংস্কৃতির চর্চা শুরু হয়েছে। নৃতাত্ত্বিক-ভাষাতাত্ত্বিক নানা পদ্ধতিও অবলম্বিত হচ্ছে। দেশের ইতিহাস লিখতে গিয়ে রাজবৃত্তের চেয়ে লোকবৃত্তের উপরেই ঝোঁক দেওয়া হচ্ছে। হরপ্রসাদ বাংলার ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গিয়ে ঠিক এই পদ্ধতি না হলেও এই লক্ষ্য দ্বারাই চালিত ছিলেন।[৯] প্রাচীন যুগের নানা পুথিতে প্রাপ্ত টুকরো তথ্যগুলি জোড়া দিয়ে তিনি বাঙালি জাতির ইতিহাসের রূপ গড়ে তুলতে চেয়েছেন। রমাই পণ্ডিতের ধর্মমঙ্গল লেখার আগে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে নেপাল থেকে ফিরে এসে তিনি লিখলেন তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ '*Discovery of Living Buddhism in Bengal.*' বোঝা যায় মধ্যযুগে বাংলার দেবদেবী-সমাকীর্ণ লোকধর্মের উৎস-সন্ধানে তিনি বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্মের সেই প্রাচীন সংঘাতের যুগেই ফিরে গেছেন।

শাস্ত্রীমশায়ের এই প্রবণতাটি বোঝা যায় তাঁর 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা' (১৯১৬) সম্পাদন-সূত্রেই। সরহ, কৃষ্ণাচার্য, শান্তির সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বাঙালি সমাজের সঙ্গে কীভাবে তাকে মিলিয়েছেন তার একটি দৃষ্টান্ত—

"তেঙ্গুরের যতটুকু ক্যাটালগ বাহির হইয়াছে, তাহাতে লেখা আছে, লুই বাঙ্গালা দেশের লোক, তাহার আর একটি নাম মৎস্যান্ত্রাদ। রাঢ়দেশে যাহারা ধর্মঠাকুরের পূজা করে,. তাহারা এখনও তাঁহার নামে পাঁঠা ছাড়িয়া দেয়। ময়ূরভঞ্জেও তাঁহার পূজা হইয়া থাকে।"

---

৯ এই লোকবৃত্তমূলক ইতিহাস রচনার পরবর্তী নিদর্শন দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য', নীহাররঞ্জন রায়ের 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' এবং সুকুমার সেনের 'প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী'। শাস্ত্রী মহাশয়ের চর্যাপদ থেকে প্রাপ্ত তথ্য নীহাররঞ্জন ও সুকুমার সেন ব্যাপকভাবে কাজে লাগিয়েছেন। কিন্তু দীনেশচন্দ্র হরপ্রসাদের ঘনিষ্ঠ হয়েও বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের কোনো সংস্করণেই চর্যার উল্লেখমাত্র করেন নি। এটা বিস্ময়কর।

নাথগুরু গোরক্ষনাথ আগে বৌদ্ধ ছিলেন। নেপালীরা গোরক্ষনাথকে ধর্মত্যাগী বলে ঘৃণা করে, কিন্তু মীননাথকে পূজা করে। অথচ মীননাথ নাকি মাছ মেরে জীবিকা নির্বাহ করতেন। মীননাথের পুত্রের নামও মৎস্যেন্দ্রনাথ। বাংলার লোকধর্মের বিচিত্র ইঙ্গিত হরপ্রসাদের লেখায় ছড়িয়ে আছে। তিনি চেয়েছিলেন এইসব উপাদান সংগ্রহ করে বাঙালির পরিচয় উদ্ধার করতে। চর্যার ভূমিকাশেষে তিনি বলছেন—

"সুতরাং মুসলমান-বিজয়ের পূর্বে বাঙ্গালা দেশে একটা প্রবল বাঙ্গালা-সাহিত্যের উদয় হইয়াছিল। তাহার একটি ভগ্নাংশ মাত্র আমি বাঙ্গালী পাঠকের কাছে উপস্থিত করিতেছি। ভরসা করি, তাঁহারা যেরূপ উদ্যম সহকারে বৈষ্ণব-সাহিত্য ও অন্যান্য প্রাচীন সাহিত্যের উদ্ধার করিয়াছেন, ঐরূপ উৎসাহে বৌদ্ধ ও নাথ-সাহিত্যের উদ্ধার সাধন করিবেন। ইহার জন্য তাঁহাদিগকে তিব্বতীভাষা শিখিতে হইবে, তিব্বত ও নেপালে বেড়াইতে হইবে, কোচবিহার, ময়ূরভঞ্জ, মণিপুর, সীলেট প্রভৃতি প্রান্তবর্তী দেশে ও প্রান্তভাগে ঘুরিয়া গীতি, গাথা ও দোঁহা সংগ্রহ করিতে হইবে।"

চার

পালরাজাদের সময়ে বাংলাদেশে সমাজে সংস্কৃতিতে যেসব পরিবর্তন চলেছিল হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সে-সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বাংলার ইতিহাসের সেই অজ্ঞাত দিকটি সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহল জাগিয়ে দিলেন। রাজনৈতিক ইতিহাস এবং সামাজিক ইতিহাস— দুই দিকই হরপ্রসাদ স্পষ্টতর করে দিলেন। এই সময়ের সামাজিক ও ধর্মীয় ইতিহাস নিয়ে তাঁর অনুগামী গবেষকদের দল আরও কাজ করেছেন। পালরাজ্য ভেঙে পড়বার সময়ে পুথিপত্র নিয়ে বাঙালি ও মৈথিলিরা নেপালে চলে যান। ফলে বাংলার ইতিহাসের সমৃদ্ধ উপকরণ সেখানেই সঞ্চিত হয়ে গেছে। এই ইতিহাসেই যে হরপ্রসাদের ঔৎসুক্য ছিল সবচেয়ে বেশি, তার প্রমাণ আছে সপ্তম ও অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনে পঠিত অভিভাষণ দুটিতে। সপ্তম সম্মেলনের অভিভাষণে তিনি বলেন—

"তাই বলিতেছিলাম বাঙ্গালার গৌরব রাজনীতিতে নহে, যুদ্ধবিগ্রহেও নহে। বাঙ্গালার গৌরব শিল্পে, বাণিজ্যে, কৃষিকার্যে এবং উপনিবেশ সংস্থাপনে।"

হরপ্রসাদ তাই প্রাচীনতরকালে দৃষ্টি ফিরিয়েছেন। কালানুক্রমিক বাংলার ইতিহাস রচনা না করে তিনি বাঙালির এই গৌরবপূর্ণ কীর্তি ও কর্মের

বিবরণ দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের মতোই আমাদের জাতি-সচেতন করে তুলতে চেয়েছেন।

বাঙালি জাতির উৎপত্তি সন্ধান করে একদা বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তখন আর্যগৌরব নিয়ে সকলে চঞ্চল। বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু ভাষাবিজ্ঞানের রীতি প্রয়োগ করেছেন, তারপর করেছেন সমাজ-বিন্যাস বিশ্লেষণ। তাঁর সিদ্ধান্ত ছিল, বাঙালি বিশুদ্ধ আর্য নয় তবে ব্রাহ্মণরা আর্যই। আর্যেরা বাইরে থেকে বাংলায় এসেছে। এসে এখানে আদিম কয়েকটি অনার্য জাতির সান্নিধ্যে তাদের রক্তে মিশ্রণ ঘটল। এখন বাঙালি সমাজের উপরের স্তরে বিশুদ্ধ আর্যরক্ত; নিম্নতর স্তরে বাঙালি অনার্য, মিশ্রিত আর্য ও বাঙালি মুসলমান। উনিশ শতকে ধারণা ছিল আদিশূরের পূর্বে এদেশে আর্যাধিকার ছিল না। 'আদিশূরের পূর্বে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণপ্রণীত কোন গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায় না'।[১০] বঙ্কিমের পর এ বিষয়ের অনুসন্ধান আরও এগিয়েছে। নগেন্দ্রনাথ বসু কুলশাস্ত্র থেকে 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' লিখেছেন, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সে ইতিহাস নির্দোষ নয়। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে হর্নলে এ বিষয়ে একটি মত দিয়েছিলেন। আর্যরা ভারতে প্রবেশ করে দুই পর্যায়ে। প্রাচীনতর অভ্যাগতকে নবীনতর অভ্যাগতের দল বিতাড়িত করে ভারতের দূর অঞ্চলে হটিয়ে দেয়। বৈদিক সভ্যতা নবীনতর আর্যদের মধ্যেই জন্ম নেয়। এই তত্ত্বের নাম বহির্বর্তী আর্য ও অন্তবর্তী আর্যজাতির তত্ত্ব। গ্রীয়ারসন সাহেব এই তত্ত্বকে মেনে নেন। বহির্বর্তী আর্যরাই বাংলাদেশে এসে পড়ে। গ্রীয়ারসন যেটা ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে স্থির করেছিলেন, নৃতত্ত্ববিৎ রমাপ্রসাদ চন্দ নৃতত্ত্বের বিচারে তাকেই মোটামুটি মেনে নেন।[১১]

হরপ্রসাদ বাঙালির উৎপত্তি এবং আর্যত্ব সম্বন্ধে আধুনিক সিদ্ধান্তকে অস্বীকার করেন নি। রমাপ্রসাদ চন্দের বই তখনও বের হয় নি। হর্নলে এবং গ্রীয়ারসনের অনুমানকে তিনি সমাজসংস্কৃতির দৃষ্টান্ত দিয়ে সমর্থন করেছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের সপ্তম অধিবেশনে পঠিত অভিভাষণে তিনি বলেছেন আর্যরা 'আবর্তে আবর্তে সরস্বতী তীর হইতে সমুদ্রের উপকূল পর্যন্ত' এসে উপস্থিত হয়েছে। 'আর্য আবর্ত সমুদ্রের উপকূল বঙ্গদেশে অতি অল্পই প্রভাব

১০ 'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা'।

১১ Ramaprasad Chanda, *Indo-Aryan Races, Part I*, 1916.

বিস্তার করিয়াছিল' বলে তিনি মনে করেন। ৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে কনৌজের রাজা যশোবর্মদেবের কাছে পাঁচজন ব্রাহ্মণকে চেয়ে পাঠানো হয় বঙ্গদেশ থেকে। তখন থেকেই এখানে ব্রাহ্মণধর্মের ভিত্তি স্থাপন হল। তারপরে প্রবল পাল রাজারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হলেন। তারপর হল মুসলমান বিজয়। মুসলমানরা বৌদ্ধ-মঠগুলি ধ্বংস করে ফেললে সমাজে আবার ব্রাহ্মণদের প্রভাব শুরু হল।

আর্য প্রভাব এদেশে ছড়িয়ে পড়বার আগেই বাঙালি একটি শক্তিশালী সভ্যতা গড়ে তুলেছিল। এই সভ্যতার খণ্ড খণ্ড বিবরণ শাস্ত্রীমশায় দিয়েছেন তাঁর সপ্তম এবং অষ্টম সাহিত্য সম্মেলনের অভিভাষণে। অষ্টম সম্মেলনের দীর্ঘ অভিভাষণটি 'প্রাচীন বাংলার গৌরব' নামে বিশ্বভারতীর বিশ্ববিদ্যাসংগ্রন্থমালায় প্রকাশিত হয়েছে পরবর্তী কালে। এই নিবন্ধটি বাংলাদেশ এবং বাঙালি জাতি সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয়ের এক অভিনব ধারণাকে ফুটিয়ে তোলে। তিনি বাঙালির কয়েকটি নিজস্ব সভ্যতা-নিদর্শনের বিবরণ দিয়েছেন। এগুলি আর্যদের দান নয়। তিনি তো মনে করেন জৈনধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, আজীবক ধর্ম এবং তৈর্থিক মতগুলি আর্যজাতির ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। ঋগ্বেদের যে আদর্শ আমরা পাই, তার সঙ্গে এইসব বৈরাগ্যমূলক ধর্মের পার্থক্য আছে। বঙ্কিম বলেছিলেন, আদিশূরের পূর্বে বাঙালির লেখা কোনো বই পাওয়া যায় না; হরপ্রসাদ বলেছেন, পালকাপ্যের হস্ত্যায়ুর্বেদ পূর্বের রচনা। আর্যরা হাতি চিনত না, বাঙালিরা চিনত। এমনি করে হরপ্রসাদ বস্ত্রশিল্প, নৌ-চালনা, নাট্যকলা প্রভৃতি নানা দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। আবার অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালের বাঙালি কীর্তিরও নানা কাহিনী তিনি শুনিয়েছেন।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে নানা কাল্পনিক কিংবদন্তীকেও হরপ্রসাদ ইতিহাসের মর্যাদা দিয়েছেন। যেমন তিনি বলছেন, এখন যারা সিংহলে বাস করে এক কালে তারা ছিল বাঙালি। সিংহলের কিংবদন্তী দ্বীপবংসর সাক্ষ্য মেনে তিনি মনে করেছেন বুদ্ধদেবেরও আগে বঙ্গনগরের রাজার ছেলে বিজয় নানা দেশ ঘুরে সিংহলেই অবতরণ করে বাঙালিকে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করে। সেই সূত্রে বাঙালির নৌ-শিল্প ও বাণিজ্য-বিস্তারেও তিনি গর্ববোধ করেছেন। দশকুমার-চরিতে উল্লিখিত তাম্রলিপ্ত বন্দরটি বাঙালির নিজস্ব পরিণত সভ্যতার দৃষ্টান্ত। তিনি মনে করেন, তাম্রলিপ্ত কোনো সংস্কৃত শব্দ নয়, প্রাচীন শব্দ দামলিপ্ত। বাংলায় এক সময় দামল বা তামল জাতির প্রাধান্য ছিল। আধুনিক নৃতাত্ত্বিকদের মতের সমর্থন যেন এতে মেলে। তামল হচ্ছে কোনো অনার্য

জাতি। তারাই আর্যরা আসবার আগে এই নগরের প্রবর্তন করেছিল। এই তমলুক থেকেই জনৈক রাজকুমার জাহাজে এক রাক্ষসের দেশে উপস্থিত হন। সেখানে 'রামেষু নাম্নো যবনস্য' এক রাজার সঙ্গে তার যুদ্ধ হয়। এই রাম বোধহয় ইজিপ্টের রামেসিসের স্মৃতিবহ।[১২] বাঙালিরা যে সমুদ্রযাত্রা করে বহির্ভারতে বাণিজ্য ও উপনিবেশ স্থাপনে লিপ্ত ছিল, এটা হরপ্রসাদের কাছে বিশেষ গৌরবের বিষয় ছিল। তমলুক থেকেই বাঙালিরা পূর্ব উপদ্বীপ চীন ও ভারত-সাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে যেত। যখন লোকে লোহার ব্যবহার জানত না তখন বেতে বাঁধা নৌকায় চড়ে বাঙালিরা নানা দেশে ধান চাল বিক্রি করতে যেত। সেই নৌকার নাম বালাম নৌকা। সেই নৌকায় যে চাল আসত তার নাম বালাম চাল। শাস্ত্রীমশায় বলছেন, 'বালাম বলিয়া কোন ভাষার কথা আছে কিনা জানি না, কিন্তু তাহা সংস্কৃতমূলক নহে'।

বাংলার প্রাচীন ইতিহাস সন্ধানে হরপ্রসাদ নানা আভাস অনুমানকে অনেক সময়েই সত্যের মর্যাদা দিয়েছেন। তার কিছু কিছু হয়তো প্রমাণনিষ্ঠ ঐতিহাসিক গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করবেন। তাঁর ভক্ত-শিষ্য যেমন বলছেন—

"হরপ্রসাদ ইতিহাসকে গল্পের মত চিত্তাকর্ষক করিতে পারিতেন সত্য, কিন্তু তাঁহার কল্পনা গল্পকেও ইতিহাসে পরিণত করিতে কুণ্ঠিত হইত না।"[১৩]

বস্তুত হরপ্রসাদের এই কল্পনাশক্তি আর-এক দিক দিয়ে দেখলে তাঁর চরিত্রের একটা বড় গুণ। এই কল্পনা স্বল্পপ্রাপ্য উপকরণকে বাংলার ইতিহাসের রূপ-সৃষ্টিতে কাজে লাগাতে চেয়েছিল। পালযুগ পর্যন্ত মোটামুটি চিত্র রচনা করা তখন পর্যন্ত সম্ভব হলেও প্রাচীন বাংলার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লেখা তখনও সম্ভব ছিল না। কিন্তু তার পূর্বেকার বাংলার ইতিহাস তখনও অসংলগ্ন, বিচ্ছিন্ন, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। হরপ্রসাদ তার কয়েকটি সূত্র নির্দেশ করতে চেয়েছিলেন। তিনি বড় স্পষ্ট করেই বলেছিলেন—

১২ এই ধরনের অনুমান অবশ্য আরও নানারকম হতে পারে। ডক্টর অমূল্যচন্দ্র সেনের *The Hindu Avatars* (1966) পুস্তিকাখানিতে রামেসিসের সঙ্গে ভারতবর্ষের নানা যোগ শব্দ সাদৃশ্যে অনুমিত হয়েছে।

১৩ সুশীলকুমার দে, হরপ্রসাদ-রচনাবলী, ২য় খণ্ড, ইষ্টার্ন ট্রেডিং কোম্পানী ১৯৬০, ভূমিকা।

"সমবেত বাঙ্গালী লেখকমণ্ডলী সেই সাহিত্যকে সৎপথে চালিত করিয়া বাঙ্গালার পূর্ব গৌরব যাহাতে পুনরুদ্ধার করিতে পারেন, তাহার চেষ্টা করুন। পূর্বগৌরবের প্রধান উপায় ইতিহাস। বাঙ্গালার ইতিহাস অতি অদ্ভুত পদার্থ। এই ইতিহাসের মূলতত্ত্ব আবিষ্কারের জন্য শুদ্ধ ঘরে বসিয়া পুথি পড়িলে হইবে না। নিকটবর্তী সকল দেশেই যাইতে হইবে। Burma, Cambodia, Anam, মালয় উপদ্বীপ, শ্যামদেশ, যবদ্বীপ, তিব্বত, মঙ্গোলীয়া এমনকি চীনদেশ অবধি যাইতে হইবে, এবং যতই অন্বেষণ হইবে ততই বাঙ্গালীর গৌরবের নূতন নূতন কথা জানা যাইবে। বাঙ্গালীর স্বভাবের পরিবর্তন হইবে। বাঙ্গালী বুঝিতে পারিবে যে, তাহাদের পূর্বপুরুষেরা নিতান্ত ভীরু এবং অলস ছিলেন না।"

এই উদাত্ত কথাগুলি হরপ্রসাদ বলেন ১৯১৩-তে। সেই বছরেই রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পেয়ে বাঙালিকে আনন্দচঞ্চল করে তুলেছেন। হরপ্রসাদের এই ভাষণেই তার সোচ্ছ্বাস বর্ণনা আছে। স্বভাবতই বাঙালির কীর্তিগৌরবের প্রাচীন ঐতিহ্যের দিকে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি পড়ল। হরপ্রসাদের স্বাভাবিক অনুসন্ধিৎসার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নতুনতর প্রেরণা। সম্ভবত তাঁরই আগ্রহে সেই সময়ে একটি বাংলার ইতিহাস রচনার আয়োজন হয়েছিল। ১৯১৬ সালে বাংলার তৎকালীন গভর্নর লর্ড রোনালড্‌সের সচিব গুরলে সাহেব তিনখণ্ডে একখানি বাংলার ইতিহাস সংকলন করাতে উদ্‌যোগী হন।[১৪] এই উদ্দেশ্যে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নিখিলনাথ রায়, দীনেশচন্দ্র সেন প্রভৃতিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। প্রাথমিক কাজ অনেক দূর অগ্রসর হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রচেষ্টা অর্ধপথে স্তব্ধ হয়ে যায়। কেন তখন হয় নি জানি না, কিন্তু হরপ্রসাদের কল্পিত বাংলার ইতিহাস বাঙালি পায় নি।

১৪ প্রবোধচন্দ্র সেন, "বাংলার ইতিহাস-সাধনা", ১৯৬০, পৃ ৭১।

আধুনিকতার পূর্বসূরী কবি সত্যেন্দ্রনাথ

প্রমথ চৌধুরী একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন, "নবীন কবিদের রচনার সহিত হেমচন্দ্রের 'কবিতাবলী' কিংবা নবীনচন্দ্রের 'অবকাশরঞ্জিনী'র তুলনা করলে নবযুগের কবিতা পূর্বযুগের কবিতার অপেক্ষা আর্ট অংশে যে কত শ্রেষ্ঠ তা স্পষ্টই প্রতীয়মান হবে। শব্দের সম্পদে এবং সৌন্দর্যে, গঠনের সৌষ্ঠবে এবং সুষমায়, ছন্দে ও মিলে, তালে ও মানে এ-শ্রেণীর কবিতা সাহিত্যের ইভলিউশনের এক ধাপ উপরে উঠে গেছে।"

বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের বহু ব্যাপক এবং বিচিত্র দানের সঙ্গে বাংলা কবিতার রূপসজ্জা-পরিকল্পনাও একটি মহৎ স্মরণীয় দান। বলতে গেলে এটা রবীন্দ্রনাথের প্রায় একারই সৃষ্টি। যখন বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্র-যুগের আরম্ভ হয় নি, যখন সাহিত্যে হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র এবং তাঁদের অনুগামীদের যুগ চলছে, তখন উনিশ শতকের শেষ দশকে রবীন্দ্রনাথ 'সোনার তরী' এবং 'চিত্রা'র প্রসাধন-পরিপাট্যে ঝলমল করা কবিতাগুলি লিখলেন। সেই কবিতাগুলিতে অন্য বাঙালী পূর্বসূরীর কোনো অনুকরণ ছিল না। রবীন্দ্রনাথ এই অপূর্বতা সৃষ্টির আদর্শ পেয়েছিলেন সম্ভবত বিদেশী কবিতা থেকে। বাংলায় রবীন্দ্রনাথের এই প্রবর্তন সহজেই বহু অনুগামীকে আকর্ষণ করে নিয়ে এল। এঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিলেন কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

তবু বাংলা সাহিত্যে সত্যেন্দ্রনাথের স্থান একটু বিশিষ্ট। তাঁকে কোনো একটি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করে রাখলেই চলে না। রবীন্দ্রানুগামী নামে পরিচিত কবিরা রবীন্দ্রনাথের প্রভাবকে যেমন স্বীকার করেন তেমনি সত্যেন্দ্রনাথের প্রভাবকেও তাঁরা শিরোধার্য করেছেন। আবার রবীন্দ্রনাথের মোহময় প্রভাব থেকে সজ্ঞানে মুক্ত হবার চেষ্টা যে সব আধুনিক কবি করেছিলেন তাঁরাও কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথকে অস্বীকার করেন নি। সত্যেন্দ্রনাথ যদিও স্পষ্ট জীবনবোধের কবি ছিলেন, তথাপি রবীন্দ্রকল্পনার সূক্ষ্ম ভাবময় অরূপ চেতনার প্রতিও তাঁর অনুরাগ ছিল। রবীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত অশরীরী সৌন্দর্যবোধ তাঁকেও অভিভূত করেছিল। রূপের আড়ালে

অরূপের নিত্যসঞ্চরণ তিনিও বুদ্ধি দিয়ে বুঝতেন যদিও তার পুনরাবৃত্তি করা তাঁর সাধ্য ছিল না। এই বিস্ময়-মুগ্ধতা ও সৌন্দর্যচেতনা অন্যান্য রবীন্দ্রপন্থী কবিদের আচ্ছন্ন করেছে, আর সেই সঙ্গে ভাষা ও ছন্দের সাঙ্গীতিক সুষমা। এ দিক দিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ স্বভাবতই রবীন্দ্রযুগের শ্রেষ্ঠ কবি হয়ে দাঁড়ালেন। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ও মূল্যবোধ, কল্যাণ ও আশাবাদিতা, প্রকৃতি এবং মানবজীবনের সহজ সৌন্দর্য সত্যেন্দ্রনাথের মাধ্যমেই এঁদের মধ্যে সঞ্চারিত হল। কিন্তু অনুপ্রেরণা খুব প্রত্যক্ষ ছিল ছন্দের ক্ষেত্রে। সত্যেন্দ্রনাথের বিচিত্র ছন্দপরীক্ষা— দলমাত্রা এবং কলামাত্রা ছন্দের নানা রূপ এবং আয়তন প্রচুর পরিমাণেই প্রযুক্ত হতে লাগল এইসব কবিদের রচনায়।

কিন্তু যাঁরা রবীন্দ্রপন্থার অনুবর্তন করেন নি, তাঁরা সত্যেন্দ্রনাথের কাছে কতটুকু ঋণ নিয়েছিলেন? আমাদের তো মনে হয় রবীন্দ্রপন্থীদের চেয়ে ভিন্নপন্থীদের ঋণ সত্যেন্দ্রনাথের কাছে নেহাৎ কম নয়, যদিও সর্বাংশে উভয় গোত্রের ঋণের প্রকৃতি ঠিক এক রকমের নয়। সত্যেন্দ্রনাথ বিচিত্রমনা কবি। নানা আইডিয়াকে তিনি গ্রহণ করতে পারতেন ; নানা আপাতবিপরীত বৈশিষ্ট্য তাঁর মধ্যে সহাবস্থান করত। তাই বিভিন্ন গোষ্ঠী বিভিন্ন প্রকৃতির উত্তরাধিকার পেয়েছিলেন সত্যেন্দ্রনাথের কাছ থেকে।

রবীন্দ্র-কাব্যের রূপসজ্জার কথা বলছি। কিন্তু রবীন্দ্র-কাব্যের ভাব-প্রকৃতিটিও মনে রাখতে হবে। এই প্রকৃতি থেকেই বাংলা কবিতার যুগান্তরের অন্যতম উৎসার। রবীন্দ্রনাথের কবিতা উনিশ শতকের প্রচলিত কাব্যধারা থেকে জাতেই আলাদা মনে হয়। এক বিহারীলালকে বাদ দিলে সেকালের সমাদৃত কবিতা সামাজিক উদ্দেশ্য সাধনেই নিয়োজিত। সর্বজনগ্রাহ্য করবার জন্য স্পষ্ট বক্তব্য দিয়ে কবিতা লেখা হয়েছে। যে আবেগ থেকে কবিতার উদ্ভব, সে আবেগ নিভৃত আত্মমুগ্ধ স্বপ্নসঞ্চরণের আবেগ নয়, বরং সকলের কথা বলে প্রতিধ্বনি তোলার প্রয়াসে সে চিহ্নিত। তখন সমাজ-গঠনের সময়। নানা সামাজিক আশা-আকাঙ্ক্ষা উৎসাহ-উদ্দীপনা এসে ঢেউ তুলেছে কবিতায়। কবিতা কখনও অবলম্বন করেছে ইতিহাসকে, কখনও করেছে পুরাণকে। প্রেমের কবিতাও কবিরা লিখছেন। হেমচন্দ্রের 'আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে' খুবই জনপ্রিয় কবিতা ছিল। তাতে আবেগ ছিল, কিন্তু রহস্য ছিল না। প্রেমের করুণ মাধুর্য, নিভৃত আত্মগুঞ্জন

ছিল না। ফলে রবীন্দ্র-পূর্ব বাংলা কবিতা সমাজ-কল্যাণ কিংবা কোনো সহজবোধ্য নৈতিক আবেদন নিয়েই লেখা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ বাংলা কবিতার ধর্মই দিলেন বদলে। কেমন করে এই পরিবর্তন এল সে ঘটনা পরম কৌতূহলপূর্ণ। জীবনস্মৃতিতে তিনি তাঁর কবিহৃদয়ের জাগরণ বর্ণনা করেছেন। একটি অবারিত প্রসন্ন বিশ্বসৌন্দর্যের মধ্যে তাঁর কিশোর হৃদয় জেগে উঠল। যা কিছু দেখলেন, সব কিছুই এক আপার্থিব মাধুর্যে এবং স্নিগ্ধতায় ছেয়ে গেল। এতদিন তাঁর চিত্ত আত্ম-প্রকাশের পথ খুঁজে পায় নি, এখন দেখা গেল পথ করে নিতে হয় সহজ সংবেদনশীলতা দিয়ে। এজন্য সমাজের চিন্তা-ভাবনার বাঁধাপথ ধরবার দরকার নেই। যার চিত্ত স্বাধীনভাবে জেগে উঠতে পারে, নিজের চোখ দিয়েই সে বিশ্বকে দেখে। সেখানেই তার মুক্তি, তার আনন্দ। সে আনন্দ কবির, সে মুক্তি শিল্পীর। এই মুক্তির আনন্দেই বিহারীলাল একদিন বলেছিলেন 'হোক গে এ বসুমতী যার খুশী তার'।

প্রভাতসঙ্গীতে রবীন্দ্রকবিচেতনার আনন্দ ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বে। তার প্রধান লক্ষণ ছিল আত্মগত দৃষ্টি। তার পরেই এল বিশুদ্ধ সৌন্দর্য-চেতনা। রবীন্দ্রনাথ এ সময়ে লেখা বিভিন্ন প্রবন্ধে বার বার সৌন্দর্যের প্রয়োজনবিরহিত স্বমহিমার কথা বলেছেন। বলা বাহুল্য, শিল্প যে সৌন্দর্যের সৃষ্টি সেই কথাটি একেবারেই অভিনব শোনাল আমাদের সাহিত্যে। 'বিচিত্র প্রবন্ধে'র একটি রচনায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

"কাব্য' দেখিলেই ইঁহারা প্রশ্ন করেন ইহার মধ্যে লাভ করিবার বিষয় কী আছে, গল্প শুনিলে অষ্টাদশ সংহিতার সহিত মিলাইয়া ইঁহারা ভূয়সী গবেষণার সহিত বিশুদ্ধ ধর্মমতে দুয়ো বা বাহবা দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া বসেন। যাহা অকারণ, যাহা অনাবশ্যক, তাহার প্রতি ইঁহাদের কোন লোভ নেই।"

এই পটভূমিতে রবীন্দ্রনাথ কবিতায় নিয়ে এলেন শুদ্ধ সৌন্দর্যের প্রেরণা। 'সোনার তরী'তে সেই সৌন্দর্যদেবীই এলেন, 'চিত্রা'য় তিনি বিশ্ব-প্রকৃতিতে বহু বৈচিত্র্যে অপরূপ হয়ে দেখা দিলেন। শুধু তাই নয়, সৌন্দর্যের একটি রোমান্টিক তত্ত্বকেও রূপ দিলেন নানা কবিতায়। বাংলা কবিতা নতুন রূপ গ্রহণ করল। রবীন্দ্রনাথের কাব্যরীতি অনুসরণ করে এলেন ভারতী, নবপর্যায় বঙ্গদর্শনের রবীন্দ্রানুরাগী কবিরা নিসর্গ-সৌন্দর্য-

বিন্যাসে, সামান্য বস্তুতে অসামান্যকে খুঁজে নেওয়ার আগ্রহে, সহজের মধ্যে মগ্ন হয়ে যাওয়ার আনন্দে, এবং ছন্দের কারুকলায় ভাষার লাবণ্য রচনায় তাঁরা রবীন্দ্রনাথের আদর্শকে ফলবান করে তুললেন।[১]

এই সময়েই এলেন কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রা' রচনার সময় থেকেই তাঁর কবিতা লেখার সূত্রপাত। 'সবিতা' নামে তাঁর প্রথম কবিতার বইটি বেরোয় ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে। তার ভূমিকায় তিনি লেখেন—

"জীবন সংগ্রামে যোগ্যতমেরই সমাদর— প্রকৃতির নিয়ম। তাই যদি স্বজাতীয়ের বিলোপ বাঞ্ছিত না হয়, তবে এখনও দার্শনিক নিশ্চেষ্টতা পরিহার করিয়া বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানোন্নত শিল্পশিক্ষা কর্তব্য। সত্য বটে, দর্শনই বিজ্ঞানের ভিত্তি, তাহা হইলেও অভিব্যক্তি হিসাবে বিজ্ঞান দর্শন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। তাই উৎসাহ চাই— বল চাই— জ্ঞান ও সত্যের সমাদর চাই। তৃষ্ণার সময় কঠোর সংযম প্রকৃতিবিরুদ্ধ। তাই আমাদের দুর্দশা। এখন কিসে সকল সময় শীতল সলিল সুলভ হয়— অকাল মৃত্যুর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ হয়, তাহাই দেখিতে হইবে।"

কবিতার বইয়ের এ ধরনের ভূমিকা আজ আমাদের কৌতুকের উদ্রেক করে। জ্ঞান-সত্য, জাতির কল্যাণ-ভাবনা কবিকে অনুপ্রেরিত আজ আর করে না। স্বাদেশিক কবিতার জাতই আলাদা। কিন্তু বিশুদ্ধ কবিতায় এ সব যুক্তি-প্রদর্শন বিশুদ্ধ কাব্যপ্রেরণার অভাবই সূচিত করে। সত্যেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রযুগের প্রারম্ভে কবিতা লিখতে আরম্ভ করলেও রবীন্দ্রনাথের কাব্যবৈশিষ্ট্য সর্বস্বীকৃত হওয়ার আগেই উনিশ শতকীয় কাব্যরীতিতে দীক্ষা নিয়েছিলেন। তাই তাঁর কবিতায় ডারুইনের ক্রমবিকাশবাদ এসেছে, প্রাচীন ভারতীয় আর্য সংস্কৃতির গর্ব দেখা দিয়েছে, আবার প্রতীচ্য বিজ্ঞান-চর্চার প্রতি অনুরাগে কবিচিত্তের যুক্তি তথ্য ও স্পষ্ট চিন্তাপ্রবণতার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। 'হোমশিখা' কবিতায় তিনি বললেন—

সৌন্দর্য—কবিতা—আভরণ!
অবশেষে তীব্র, শুভ্র, সত্যের কিরণ।

---

১ পূর্বতন কাব্য ও রবীন্দ্রকাব্যের পার্থক্যের বিস্তৃততর আলোচনা করেছি আমার 'কাব্যবাণী' (১৯৬৭) বইতে। ওই বইতে 'সৌন্দর্যবাদের প্রতিষ্ঠা' অধ্যায়টি কৌতূহলী পাঠক দেখতে পারেন।

এই সত্য পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের অভীষ্ট, যেমন দ্বিজেন্দ্রলাল একটি কবিতায় বলছেন—

দিব সত্য যত চাহো ;—উনবিংশ শতাব্দীর
শেষ ভাগে সভ্যতার তীব্রালোকে জানি স্থির
অন্য গান লাগিবে না ভালো !

—'স্বপ্নভঙ্গ', মন্দ্র।

এই সত্য ধ্যানগম্য উপলব্ধির সত্য নয়। জীবনের রূপের আড়ালে যে অরূপের সত্য রবীন্দ্র-কাব্যকে জ্যোতিষ্মান করেছে, সে সত্য অবশ্য দ্বিজেন্দ্রলাল বা সত্যেন্দ্রনাথের নয়। বস্তুত, রবীন্দ্রনাথ উনিশ শতকের শেষ দশকে সত্যের পূর্ণ উপলব্ধিতে পৌঁছোন নি, যদিও তার আভাস এসে গেছে কোনো কোনো কবিতায়।[২] কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ যে সত্যের কথা বলেছেন, সে হচ্ছে মানুষের বিচারবুদ্ধি-প্রত্যয়জাত। তাই বিজ্ঞান-ইতিহাস সমাজতত্ত্বের সঙ্গেই এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক— অধ্যাত্ম বা অতীন্দ্রিয় সত্যোপলব্ধির সঙ্গে এর যোগ নেই। সত্যেন্দ্রনাথের কবিমনকে গড়ে দিয়েছে উনিশ শতকীয় যুক্তিবাদী প্রবণতা। পিতামহ অক্ষয়কুমার দত্ত এই যুক্তিবাদী যুগমানসের প্রতিনিধিকল্প। পিতামহের প্রভাব সত্যেন্দ্রনাথের কবিমনকে বিশিষ্ট রূপ দিতে কম সাহায্য করে নি। রবীন্দ্রনাথের মতো ধ্যানী মন্ময়ী কবির নিত্য সান্নিধ্যও সত্যেন্দ্রনাথকে মনের সেই মৌলিক বৈশিষ্ট্য থেকে বিচ্যুত করতে পারে নি।

'সবিতা' সত্যেন্দ্রনাথের পঠদ্দশায় গোপনে প্রকাশিত হয়েছিল ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে। 'সবিতা'র পর তাঁর সুপরিচিত কাব্যগ্রন্থগুলি বেরোল— 'বেণু ও বীণা', 'হোমশিখা', 'তীর্থসলিল', 'তীর্থরেণু', 'ফুলের ফসল', 'কুহু ও কেকা', 'তুলির লিখন', 'মণিমঞ্জুষা' 'অভ্র আবীর'। ১৯২২-এ সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর বেরিয়েছে 'বেলাশেষের গান' ও 'বিদায় আরতি'।

তখন পুরোপুরি রবীন্দ্রযুগ শুরু হয়ে গিয়েছে। কবিতায় রবীন্দ্রানুগামিতা ব্যাপকতা অর্জন করেছে। ভাষায় ছন্দে ভাবে— সবদিক দিয়ে রবীন্দ্রানুসরণ পরম চরিতার্থতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথের কবিতাতেও তার চিহ্ন ফুটে উঠল। নিছক বস্তুগত বর্ণনা ছাড়াও এবং বিবরণাত্মক ভাব ছাড়াও আত্ম-দৃষ্টিতে দেখা জীবনচেতনা— রূপোল্লাস ও মগ্নতা সত্যেন্দ্রনাথের কবিতাকেও বিশুদ্ধ কাব্যরসে ভরে তুলল। বিশেষ করে 'ফুলের ফসল' বইখানি নানা

২ 'চিত্রা' কবিতাটি তুলনীয়।

ফুলের বর্ণ ও রূপভোগে কবির প্রীতির ভাণ্ডারটি খুলে দিল। কবিমানসের বিভোরতা এবং সুকুমার কল্পনাবিলাস সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় একটি নূতন উপভোগ্যতা নিয়ে এসেছে—

এত কাছে থেকে হায় তবু এতদূর।
নয়নে নয়ন রেখে পরাণ বিধুর
কাছে আসি ভালোবেসে,—
নিশাসে নিশাস মেশে
নাগাল না পাই তবু পরাণ-বঁধুর।

এই অনির্বচনীয় সুদূরতা রবীন্দ্রকাব্যেরই সুর। এমনি অনেক কবিতা সত্যেন্দ্রনাথের অজস্র কবিতার মধ্যে প্রচুর।

সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যসৃষ্টির সমৃদ্ধির যুগে বহু বৈচিত্র্য ফুটে উঠল। রোমান্টিক স্বপ্নচারিতার সঙ্গে বাস্তব-সচেতনতা, মানব-সভ্যতার মহত্ত্ব নির্ণয়ের সঙ্গে ভবিষ্যৎ আশাবাদিতা, অতীত-গৌরববোধের সঙ্গে সমকালীন আশাবেদনা, ক্ষুদ্র ও দীন জীবনের সার্থকতাবোধের সঙ্গে মহামানবের অনুপম মহিমা; সাধু ও গম্ভীর ভাষাশৈলীর সঙ্গে চলিত বুলি; গম্ভীব ধীরগতি ছন্দের সঙ্গে চটুল দ্রুতগতি ছন্দ— কত বিভিন্ন কল্পনা সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যজগৎকে আমাদের এই বহুবর্ণা পৃথিবীর মতোই শব্দে-গন্ধে-গানে-কোলাহলে পূর্ণ করে দিয়েছে। এটা সত্যেন্দ্রনাথের যেমন গুণ তেমনি আবার দোষ বলেও গণ্য। গুণ এইজন্য যে, কবিচিত্ত একটি অসাধারণ গ্রহণক্ষমতার পরিচয় দেয়, জীবনের সবগুলি দিককেই গ্রহণ করতে পারে। সত্যেন্দ্রনাথ গম্ভীর হতে জানতেন, আবার শিশুর মতো খেয়ালীও হতে পারতেন। তাঁর ভাষার একটি স্টাইল—

বিস্ময়ে বিহ্বল চিত্ত ভগীরথ ভগ্ন মনোরথ
বৃথা বাজাইল শঙ্খ, নিলে বেছে তুমি নিজপথ;
আর্যের নৈবেদ্য, বলি, তুচ্ছ করি হে বিদ্রোহী নদী।
অনাহুত—অনার্যের ঘরে গিয়ে আছ সে অবধি!

আবার আর একটি স্টাইল—

ডালপালাতে বৃষ্টি পড়ে, শব্দ বাড়ে ঘড়িক-ঘড়ি,
লক্ষ্মীদেবীর সামনে কারা হাজার হাতে খেলছে কড়ি!
হঠাৎ গেল বন্ধ হয়ে মধ্যিখানে নৃত্যখেলা,
ফেঁসে গেল মেঘের কানাৎ উঠল জেগে আলোর মেলা।

এই বিচিত্ররূপা কল্পনা বিভিন্নরুচি পাঠককে স্বভাবতই আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসে। তাঁর বহু কবিতা শিশুচিত্তকে খুশিতে ভরে দেয়; স্বদেশপ্রাণকে উদ্দীপিত করে; রূপরসের সৌন্দর্যপ্রেমিককে মুগ্ধ করে; ভাবুক দার্শনিক মনকে মগ্ন করে। দুঃখবাদী সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় পাবেন জীবনের দুঃখরূপ; আনন্দবাদী পাবেন উল্লাস-স্নিগ্ধতা। সাহিত্যের পরিভাষায় এই শ্রেণীর কবিকে বলে অবজেকটিভ।

অবজেকটিভিটি সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ গুণ। নাট্যকারদের মতো কাব্যকারেরও এই গুণ থাকতে পারে। যেমন কীট্‌স। কীট্‌স-এর প্রসঙ্গে বিখ্যাত সমালোচকের একটি অবিস্মরণীয় উক্তি—He is with Shakespeare মনে পড়ে। শেক্‌স্‌পীয়রের সমধর্মিতা অবজেকটিভিটির সূত্রেই। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ কি সেই অর্থে অবজেকটিভ? অবজেকটিভিটি জীবনের গভীরতাদ্যোতক। সৃষ্টির বাইরের রূপটি কবিচিত্তকে আকৃষ্ট করলেও অন্তর্নিহিত একটি উদার সর্বসহিষ্ণু প্রশান্তি বিচিত্রকে ভাবৈকরসে সুস্থিত করে। এইজন্য কীট্‌স-এর কবিতায় জীবন ও মৃত্যুর দ্বন্দ্ব মিলিয়ে যায়। একটি গভীর অনুভূতিতে মৃত্যুও নির্বিকার প্রশান্তিতে জ্বালাহীন বেদনাহীন হয়ে যায়। সত্যেন্দ্রনাথ এই সৃষ্টিজিজ্ঞাসায় কখনই পীড়িত হন নি। অস্তিত্ব সম্বন্ধে, সত্তা সম্বন্ধে কোনো গভীর প্রশ্ন তাঁকে ব্যাকুল করে তোলে নি, শান্তও করে নি। তিনি চলতি আইডিয়া নিয়ে ছন্দ রচনা করতে ভালোবাসতেন। ভাষা ও ছন্দের উপর নিরঙ্কুশ অধিকারে, চতুর প্রকাশ ভঙ্গিতে, আন্তরিক উচ্চারণে, তাঁর রচনা উপভোগ্য এবং স্মরণীয়। তিনি অবজেকটিভ নন, তিনি আরটিস্‌ট এবং ক্রাফট্‌স্‌ম্যান।

এতে তাঁর প্রশংসা, এতে তাঁর সমালোচনা। যে-কোনো বিষয় নিয়ে যিনি পদ্য লিখে ফেলতে পারেন, তিনি জর্নালিস্ট-কবি, ঈশ্বর গুপ্তের মতো। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ তার চেয়ে অনেক বেশি। কারণ তিনি আলংকারিক বিন্যাসেই যে শুধু নিপুণ তা নয়, তাঁর জাগ্রত মন একটি সুস্থির চিন্তায় মগ্ন। মোহিতলাল ঠিকই বলেছেন—

"কাব্যের যে প্রবৃত্তিকে ক্ল্যাসিক্যাল বলা হইয়া থাকে, তাহার মূল প্রেরণা মানুষের স্বাভাবিক সমাজ ধর্মনিষ্ঠার মধ্যেই আছে; একটা কিছুকে স্থায়ী ও দৃঢ় বলিয়া বিশ্বাস, নিয়ত পরিবর্তনশীল সদ্যধ্বংসী জগতের একাংশে একটা স্থির-

সত্তার আশ্বাস— মানুষ চায়···সত্যেন্দ্রনাথের কবিতাও যদি এই জাতীয় হয়, তবে কবি হিসাবে তাঁহার অগৌরবের কারণ নাই।"

সত্যেন্দ্রনাথ নীতি-নিয়মকে ভালোবাসতেন, উচ্চ আদর্শকে শ্রদ্ধা করতেন, মানুষের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালোবাসা ছিল। জীবন বলিষ্ঠ হবে, সংকীর্ণতা থাকবে না, ঐতিহ্যকে সম্মান করবে, ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হবে— এমনি করেই সত্যেন্দ্রনাথ জীবনের দিকে তাকিয়েছিলেন। প্রকৃতির কবিতা লিখলেও তিনি বস্তুতই ছিলেন নাগরিক সমাজের কবি। প্রকৃতির সূক্ষ্ম সৌন্দর্য, তার রস-রহস্য, তার নিজস্ব লীলারূপে আত্মহারা তিনি হন নি। বরং মানুষকেই তিনি সুস্থ ও সুনিয়মিত জীবনচর্যায় প্রতিষ্ঠিত দেখতে চেয়েছেন। অন্যায়ের প্রতি অসহিষ্ণুতা ছিল প্রবল, কিন্তু প্রচলিত সমাজনীতির প্রতি বিদ্রোহ ছিল না। দরিদ্র, পতিত মানুষের প্রতি সমবেদনা ছিল সীমাহীন, সাম্যের কবিতা তিনি লিখেছেন, তথাপি সমাজকে ভেঙে নিরাকার সমাজ গড়বার কথা তিনি ভাবেন নি। তিনি সংস্কার চাইতেন সমাজের মধ্যেই। সর্বোপরি তাঁর বিশ্বাস ছিল শেষ শুভ পরিণামে। দুঃখবাদ প্রসঙ্গক্রমে কোনো কোনো কবিতায় এসে গেলেও তিনি সুস্থ বলিষ্ঠ আনন্দবাদেরই কবি ছিলেন। এ রকম কবি সমাজ ও জাতির হৃদয়-তন্ত্রীতে সহজেই অনুরণন তুলতে পারেন। সেকালে যেমন ছিলেন হেমচন্দ্র, একালে তেমনি সত্যেন্দ্রনাথ জাতির আশা আকাঙ্ক্ষাকে ভাষা দিয়ে চারণ-কবি রূপে দেখা দিয়েছেন।

তবু বাংলা কবিতায় এটাই সত্যেন্দ্রনাথের একমাত্র পরিচয় নয়। হেমচন্দ্র চারণ-কবি বলে শ্রদ্ধেয় হলেও বাংলা কবিতার স্থায়ী সঞ্চয়ে তাঁর দান কোথায় সেটা নিশ্চয়ই আর-একটা বিচার। সত্যেন্দ্রনাথ আমাদের জাতীয়তাবোধের দিনে জাতীয় চেতনাকে রূপ দিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমানবিকতার উদার পরিবেশে তিনিও মানবতার বাণী শুনিয়েছিলেন, কিন্তু কবিতার শব্দ জগতে ধ্বনিমন্ত্রে সত্যেন্দ্রনাথের উপস্থিতি আজও ভোলবার নয়। তিনি নিজে যাদু সৃষ্টি করেন নি, কিন্তু যাদু রচনার উপকরণ তিনি দিয়েছিলেন। বাংলা কবিতার শব্দ এবং ছন্দের ক্ষেত্রে তাঁর নিঃসংশয় দান অবিস্মরণীয়। ব্রাউনিঙ যেমন বলেছিলেন Out of three sounds he did not create a fourth but a star —সত্যেন্দ্রনাথ নক্ষত্রের আলো জ্বালেন নি, কিন্তু ধ্বনির সমারোহ রচনা করেছেন। সত্যেন্দ্রনাথের ভাষা এবং শব্দসম্পদ বাংলা কবিতার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেছে।

ভাষা এবং শব্দের উপর এমন নিরঙ্কুশ অধিকার সত্যই দুর্লভ। বিদগ্ধ মার্জিত বহু পঠনশীল কবি ছিলেন তিনি। কবিরা শব্দেরই কারবারী। সত্যকার কবিই শব্দ ব্যবহার নিয়ে ভাবেন। যাঁরা আয়ত্তাধীন সদাপ্রচলিত শব্দে সন্তুষ্ট, তাঁদের মানসিক জগৎও সীমাবদ্ধ। তাঁদের অভিজ্ঞতায় অনন্যতা নেই। মাইকেল মধুসূদনকে যদি ভারতচন্দ্র-কবিওয়ালাদের ব্যবহারের বাইরে পা বাড়াতে না হত, তাহলে তিনি নতুন স্বাধীন কাব্য অভিজ্ঞতার কোনো পরিচয়ই রক্ষা করতে পারতেন না। তাঁকে নিয়ে আসতে হয়েছে অপ্রচলিত দুরূহ শব্দ সংস্কৃত কাব্যজগৎ থেকে। তারই ফলে তাঁর কবিতায় একটি ভিন্নতর জগৎ নির্মিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, শব্দ-ব্যবহারে এবং শব্দসৃষ্টিতে নানা বিবেচনাই কাজ করে থাকে। সবচেয়ে বড়ো বিবেচনাই হচ্ছে প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা। বিশিষ্ট আবেগ ও অনুভূতি নিরুপম প্রকাশে শব্দময় হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এমন অসাধারণ শব্দশিল্পী। অজস্র শব্দ তিনি রচনা করেছেন। কিন্তু কচিৎ অপ্রচলিত দুরূহ বা শ্রুতিবিষম শব্দ তিনি এনেছেন। শব্দ ব্যবহারে তাঁর নিজস্ব প্রয়োজনীয়তাবোধ ছিল— চিত্রকল্প-রচনা। তিনি শুধু শব্দই ব্যবহার করেন নি, তিনি শব্দ দিয়ে কবিতার আলো জ্বালিয়েছেন। সে সামর্থ্য ভিন্নতর এবং উচ্চতর। সত্যেন্দ্রনাথ সেই মহিমায় পৌছতে পারেন নি। কিন্তু তিনি পরবর্তী কবিদের হাতে তুলে দিয়েছেন উপকরণ। এই প্রসঙ্গে আমি আর-একটি সমর্থক বক্তব্য একালের কবিসমালোচকের কথায় উদ্‌ধৃত করছি অন্য আর-একজন শক্তিশালী কবিকীর্তির সূত্রে।— সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসু বলছেন—

"সুধীন্দ্রনাথের কবিতা দুর্বোধ্য নয়, দুরূহ; এবং সেই দুরূহতা অতিক্রম করা অল্পমাত্র আয়াস সাপেক্ষ। অনেক নতুন শব্দ, বা বাংলায় অচলিত সংস্কৃত শব্দ তিনি ব্যবহার করেছেন: তাঁর কবিতার অনুধাবনে এই হলো একমাত্র বিঘ্ন। বলা বাহুল্য, অভিধানের সাহায্য নিলে এই বিঘ্নের পরাভবে বিলম্ব হয় না। এবং অভিধান দেখার পরিশ্রমটুকু বহুগুণে পুরস্কৃত হয় যখন আমরা পুলকিত হয়ে আবিষ্কার করি যে আমাদের অজানা শব্দসমূহের প্রয়োগ একেবারে নির্ভুল ও যথাযথ হয়েছে। পরিবর্তে অন্য কোনো শব্দ সেখানে ভাবাই যায় না।"

সত্যেন্দ্রনাথের দুরূহ শব্দ প্রয়োগ যথাযথ হয়েছে কিনা সেটা কাব্যপাঠকের অবশ্য বিচার্য কিন্তু কাব্যলেখকদের পথ যে তিনি প্রশস্ত করে দিলেন এটা স্বীকার করতেই হবে। রবীন্দ্রযুগের অগণিত অনুগামীদের অতিব্যবহার বাংলা

কবিতার ভাষাকে জীর্ণ করেছিল, সম্ভাবনাকে নিঃশেষ করে ফেলেছিল, এটা তো সাহিত্য ঐতিহাসিকেরা মেনেই নিয়েছেন। সত্যেন্দ্রনাথই বাংলা কবিতায় নতুন শব্দব্যবহারের সম্ভাবনা উন্মোচিত করে ছিলেন। তিনি লিখলেন—

কুক্কুর তুলে বুক্কন ধ্বনি
ঘুৎকার করে উলুক অমনি

এই বিচিত্র শব্দগুলির ব্যবহারের আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনীয়তা যাই থাক বাংলা কবিতার কবিদের যে সাহস জুগিয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। মোহিতলালের কবিতায় এবং আরও পরবর্তী সুধীন্দ্রনাথ বা বিষ্ণু দের কবিতার দুর্বোধ্য শব্দ প্রয়োগের অভিযোগ অর্থহীন হয়ে যায়। হয়তো তাঁরা দুরূহ শব্দ প্রয়োগের অনিবার্যতা উত্তম রূপেই প্রমাণ করেছেন। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের শব্দ-প্রয়োগই বাংলা কবিতার ধ্বনিকে অনেকটাই পরিবর্তিত করতে সহায়তা করেছিল। যার কান আছে তিনিই বুঝবেন, এ ধ্বনি রবীন্দ্রকাব্যের প্রতিধ্বনি নয়। আর একটি বড়ো কথা মনে হয়। সত্যেন্দ্রনাথ শব্দ-প্রয়োগে কল্পনার চেয়েও যুক্তি দ্বারাই চালিত হয়েছেন। ফলে বাংলা কবিতার কল্পনার অতিচার বা নিরবয়ব শূন্যতা দূর করতেও তিনি সাহায্য করেছেন।

যুক্তিবোধ এবং মানসিক সতর্কতা ছিল বলেই সত্যেন্দ্রনাথ ভিন্নজাতের শব্দকেও প্রয়োজন মতো কাজে লাগিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ বাংলা কাব্যভাষায় যে সমৃদ্ধ শব্দসম্পদ দান করেছিলেন মূলত তার প্রকৃতি ছিল সংস্কৃত। 'কল্পনা'র পূর্ব থেকেই রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃত কাব্যভাষার ধ্বনি-গাম্ভীর্যে ও শব্দসঙ্গীতে ছিলেন আকৃষ্ট। 'কল্পনা'য় তিনি কালিদাসের যুগে 'পূর্ব জনমের প্রথম প্রিয়ারে' খুঁজতে বেরিয়েছিলেন। প্রথম প্রিয়াই বটে। লাবণ্যময়ী শব্দপ্রতিমার সন্ধানেই তিনি বেরিয়েছিলেন। প্রাচীন সাহিত্যের সেই অপূর্ব প্রবন্ধগুলির প্রধান আকর্ষণ তার শব্দজগৎ, গদ্যও আবৃত্তিযোগ্য মাধুর্যে অভিসিঞ্চিত। কাব্যের তো কথাই নেই। কবি যখন বলেন—

মুখ খানি তার
নতবৃন্ত পদ্মসম এ বক্ষে আমার
নমিয়া পড়িল ধীরে।

তখন এর চিত্রগুণ একটা আলাদা উপভোগ্য হয় না। ওই ভাষার সঙ্গেই সে জড়িয়ে থাকে। 'নতবৃন্ত' শব্দটির ধ্বনিসৌকুমার্য এবং অর্থসৌকুমার্য এক হয়ে যায়। এই শব্দের পরিচ্ছন্নতা ও শুচিতা কালিদাস-বাণভট্টের রোমান্টিক

কাব্যসৌরভ বহন করে নিয়ে আসে। এই ভাষা অতি চমৎকার বটে, কিন্তু এর একটা অসুবিধাও সম্ভবত অস্বীকার করা যায় না।

সত্যেন্দ্রনাথের—

বাদশাজাদা দেখল তোমায়—দেখল প্রথম নওরোজে,
খুসী দিলের খুসরোজে তার জীবন মরণ দুই যোজে !

কিংবা মোহিতলালের—

গুলনার-বাগে ফুল বিলকুল
নাশপাতি
গালে গাল দিয়ে লালে—লাল হল
বোসতানে !
ঘাসের সবুজ সাটিনে নীলের
আবছায়া।
সরাইখানায় মেতেছে মাতাল
খোশগানে !

—এর মধ্যে দিয়ে যে ভিন্নতর স্বাদ এবং অভিজ্ঞতার জগৎ গড়ে উঠেছে তারও তো প্রকাশের ভাষা চাই। কালিদাসীয় সংস্কৃতমূলক শব্দে তাকে প্রকাশ করা যায় কিনা সন্দেহ।[৩] সত্যেন্দ্রনাথের অভিনবত্ব সাধনের ফলে বাংলা কবিতা একটা নতুন শব্দবাহন লাভ করল। সত্যেন্দ্রনাথের প্রয়োগের পর থেকেই বাংলা কবিতায় এই শ্রেণীর শব্দব্যবহারের পথ সুগম হয়ে গেল। বিষয় হিসাবে তিনি যে বিস্তৃততর ক্ষেত্র পরিক্রমণ করলেন তার প্রেরণা এসেছিল বাস্তব যুক্তিবাদী মনোভঙ্গি থেকে ; যেমন—

বকেয়া হিসাব চুকিয়ে দে রে বছর-শেষের শেষ দিনেতে
মজ্জাগত গোলাম-সমঝ শেষ করে দে, শেষ করে দে।
কেউ কারো দাস নয় দুনিয়ায়, এই কথা আজ বলব জোরে ;
মিথ্যা দলিল তাদের, যারা জীবকে দ্যাখে তুচ্ছ করে !

৩ প্রসঙ্গত উল্লেখ করি, অসাধারণ ভাষাশিল্পী রবীন্দ্রনাথ ইসলামী শব্দ চয়নের দিকে ঝোঁকেন নি কারণ তাঁর মানসজগৎই ছিল অন্য রকম। মোগলাই বা ফারসি পরিবেশ সৃষ্টি করতে তিনি যান নি। 'ক্ষুধিত পাষাণে' আশ্চর্য স্বপ্নজগৎ তৈরী করেছেন, কিন্তু তাতে ইসলামী স্বাদ নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহে'র মোগল অন্তঃপুরের বর্ণনা ফারশি শব্দ ব্যবহারে বাস্তবানুগ ; এখানেও সেই শিরাজী শরাব, তাতারী প্রহরিণী, ছুরির ঝলক সবই আছে।

—এ কবিতায় রোমান্স নেই, সমাজ ও যুগসচেতন বাস্তবানুরাগী যুক্তিবোধ আছে। নজরুল ইসলামের কবিতায় তার সরব অনুসরণ বাংলা কবিতাকে প্রাত্যহিকতার স্তরে নামিয়ে নিয়ে এসেছে। এতো স্বপ্নের জগৎ নয়, এ জগৎ ঊষর রুক্ষ ধূলিসমাকীর্ণ কঠিন মাটির। নজরুল ইসলাম বাংলা কবিতায় নতুন রক্ত সঞ্চালন করলেন। মোহিতলালের 'নাদিরশাহের জাগরণ' 'নাদিরশাহের শেষ' 'বেদুইন' 'শেষ শয্যায় নুরজাহান' প্রভৃতি অনেক কবিতাতেই গড়ে তোলা হল এক জীবন্ত কাব্যপ্রতিমা।

সত্যেন্দ্রনাথের ভাষার আর-একটি স্তর আছে যার প্রভাবও হয়েছে সুদূর-প্রসারী। কবিতার ভাষায় লৌকিক চল্‌তি শব্দ এবং ভাষাভঙ্গিকে স্থান দিয়ে তার অধিকারের ক্ষেত্র আরও বিস্তৃত করে দিলেন। বস্তুত সত্যেন্দ্রনাথের আগে বাংলা জীবন্ত ভাষার এমন কর্ষণ আর কেউ করেন নি। এখানেও রবীন্দ্রনাথের কথা মনে আসে। 'ক্ষণিকা'র ভাষাতে কবি লঘু পরিহাস-তরল ভঙ্গিমার দিকে ঝুঁকেছিলেন ফলে মুখের ভাষাভঙ্গি এসে গিয়েছে। এজন্য 'ক্ষণিকা'র সুর অন্য রকম। 'গীতাঞ্জলি'র কবিতাতে পরিহাস নেই অবশ্য কিন্তু পল্লী-পরিবেশ এবং জীবন ছবি আছে। তবু সত্যেন্দ্রনাথ দুঃসাহসভরে আরও এগিয়ে গেলেন। তিনি এমন সব শব্দ নিয়ে এলেন কবিতায় যা কখনও গ্রাম্য, কখনও আঞ্চলিক। সাহিত্যশিল্প বলতে আমরা স্বভাবতই একটি সর্বরুচিসম্মত শিক্ষিত জনবোধ্য নাগরিক বৈদগ্ধ্যের সৃষ্টিই বুঝে থাকি। এইজন্য যে-শব্দ শিষ্টজনের মধ্যে প্রচলিত, সংস্কৃত রীতির সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত সেই শব্দই সাহিত্যের বিশেষ করে কবিতার বাহন হয়ে এসেছে মধুসূদনের সময় থেকে। সত্যেন্দ্রনাথ একটি আশ্চর্য যুগান্তর ঘটালেন। লোকজীবনের শব্দ— যা কাব্যে ছিল অন্ত্যজ, তাকে তিনি পরিপূর্ণ মর্যাদা দিয়ে সাদর আহ্বান করে নিয়ে এলেন। তাতে বাংলা কবিতা আরও যেন জনরুচির কাছে গ্রহণীয় হয়ে উঠল। যাকে খাঁটি বাংলা বলে অর্থাৎ যে ভাষা নিজস্ব ব্যঞ্জনায় এবং প্রকাশক্ষমতায় মৌখিক বাংলাকে সতেজ অর্থবহ করে তুলেছে, সে-সম্বন্ধে তাত্ত্বিক আলোচনা অবশ্য আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের 'শব্দতত্ত্ব' বইখানি সবটাই তার দৃষ্টান্ত। কিন্তু কেউ কি ভেবেছিল গদ্যের বাইরে এই দেশজ ভাষাকে সম্মানিত স্থান দেওয়া যেতে পারে ?

তাকায় জগৎ বাক্যহারা ইয়োরোপের মাটির ক্ষুধা দেখে
ভব্যতা সে ভির্মি গেছে ভেপ্‌সে-ওঠা টাকার গেঁজেয় থেকে।

কবিতা বলতে আমরা যা বুঝি, এর মধ্যে তা হয়তো নেই। তথাপি এর ভাষার জোর আছে, মিলের এবং ছন্দের সহযোগিতায় সে ভাষা পাঠকচিত্তকে প্রভাবিত করে সন্দেহ নেই। সুতরাং মৌলিক বুলি কবিতার ক্ষেত্রে যে আপন স্বাভাবিক অধিকার নিয়ে আসছে তা অস্বীকার করা যাবে না।

কবিতা এই ভাষায় হয় কিনা এ নিয়ে কেউ যদি সন্দেহ করেন, তবে সত্যেন্দ্রনাথের চিত্রময় কবিতাগুলি নিশ্চয় সে সন্দেহ নিরসন করবে। যেমন—

কেয়াফুলে ঘুণ লেগেছে
পড়তে পরাগ মিলিয়ে গেছে,
মেঘের সীমায় রোদ জেগেছে,
আলতা পাটি শিম্।
ইলশে গুঁড়ি! হিমের কুঁড়ি
রোদ্দুরে রিম্‌ঝিম!

এর মধ্যে ছন্দের চপলতা আছে, ভাবেরও কোনো গুরুত্ব নেই কিন্তু রোদ বৃষ্টির এমন ছবিটিরও কি রস নেই? কিংবা কৃষক-বধূর এই গভীর চোখের চাউনির এমন বর্ণনা চলতি ভাষা ভঙ্গিমার মধ্য দিয়েই জীবন্ত হয়ে উঠেছে, আর কোনো সাধু বর্ণনাতেই তা সম্ভব হত না—

পান বিনে ঠোঁট রাঙা
চোখ কালো ভোমরা,
রূপশালি ধান-ভানা
রূপ দ্যাখো তোমরা।

এর নাম 'চিত্ররস' দিলে ক্ষতি কী? রসোপভোগের সেও তো একটা বৈচিত্র্য।

বাংলা ভাষার এই নিজস্ব বাক্‌রীতিতে এবং শব্দভাণ্ডারে সত্যেন্দ্রনাথ যেন ইচ্ছামতো পরিক্রমা করে বেড়িয়েছেন। একদিকে গদ্য ভাষায় প্রমথ চৌধুরীর চলতি ভঙ্গির দিকে ঝোঁক, আর-একদিকে সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় ব্যবহারিক প্রয়োগ—এই যুগল অভিযান বাংলা সাহিত্যের আভিজাত্যের দুর্গ ভেঙে আধুনিক রীতির প্রতিষ্ঠা করে দিল। তবু মনে হয় সত্যেন্দ্রনাথ এ বিষয়ে যতখানি সাহস দেখিয়েছিলেন পরবর্তী কবিরা তা দেখাতে পারেন নি। তা ছাড়া বাংলা ভাষাপ্রকৃতি সম্বন্ধে সত্যেন্দ্রনাথের স্পর্শকাতরতাও তুলনারহিত বলে মনে হয়। এই দক্ষতা নিয়েই তিনি বহু নতুন শব্দ তৈরি করতে এগিয়ে

এসেছিলেন। তাতে সংস্কৃত গাম্ভীর্যের সুদূরতা ছিল না, ছিল জনজীবনের তপ্ত স্পর্শ।

সত্যেন্দ্রনাথের কারুকলার (ক্রাফট্‌স্‌ম্যানশিপ) অনুপম উদাহরণ অবশ্যই ছন্দরচনায়। সত্যেন্দ্রনাথ তো আমাদের মধ্যে ছন্দসম্রাট নামেই সুপরিচিত। তাঁর অন্যান্য বিশিষ্টতার কথা আমরা সব সময়ে ভেবে দেখি না, কিন্তু ছন্দ শিল্পে তাঁর নৈপুণ্যকে কখনোই ভুলি না। সত্যেন্দ্রনাথের এ দিকটা যখন আমরা স্মরণ করি, তখন কি আমরা তাঁর শিশুসুলভ ক্রীড়ার জন্যই তাঁকে বাহবা দিই অথবা ছন্দসৃষ্টিতে তাঁর গভীর গুরুত্বের জন্যই সশ্রদ্ধ হই, এ কথা তেমন ভাবি না। তাঁর বহু ছন্দনিদর্শন আমাদের কানকে খুশি করে সত্য, কিন্তু এর পেছনে ছন্দরহস্য সম্বন্ধে কতখানি চিন্তা কাজ করেছে সেটা ভেবে দেখি না। তিনি ছন্দের কারুশিল্পী হতে পারেন কিন্তু শিল্পীকেও ধ্বনি বৈশিষ্ট্য ও ছন্দগঠনের নানা উপকরণ-উপাদানকে বিচার করে দেখতে হয়। কারণ ছন্দকে ভাষার সঙ্গে একাঙ্গ হয়ে যেতেই হবে, তা না হলে সেটা ভাষার ভারই হয়ে থাকে, শ্রী হয়ে ওঠে না। সত্যেন্দ্রনাথ নানা সংস্কৃত ছন্দ এবং ইংরেজি ও আরবি ছন্দ বাংলায় নিয়ে এসেছেন। তা ছাড়া পড়তে উৎসাহবোধ হয় এমনি ধরনের নানা ছন্দও রচনা করেছেন। কিন্তু সত্য সত্যই নিছক খেলা সবগুলিই নয়। এদের গঠনের মধ্যে তাঁর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরীক্ষণ-প্রবৃত্তি আছে; বাংলা ভাষার ধ্বনি-প্রকৃতিকে বোঝবার চেষ্টা আছে। সেইজন্য সত্যেন্দ্রনাথের ছন্দ-সাধনায় বাংলার ধ্বনিসৃষ্টির নতুন সম্ভাবনাও দেখা দিয়েছে।

সত্যেন্দ্রনাথের ছন্দকৌতূহলের সূচনা অবশ্য করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। বাংলা ভাষার তিনটি ছন্দরীতি তিনিই নির্দিষ্ট করে দিলেন; শুধু তাই নয়, প্রতি ছন্দপদ্ধতির নানা পর্বভাগ, যতিবিন্যাস, পদ ও পঙক্তির সজ্জার আদর্শ ঠিক করে দিয়েছেন। কলামাত্রিক এবং দলমাত্রিক ছন্দের নিয়ম বলতে গেলে রবীন্দ্রনাথই আবিষ্কার করেন। মিশ্র কলামাত্রিক পুরানো, সংস্কৃত রীতির মাত্রাবৃত্তও পুরানো কিন্তু মাত্রাবৃত্ত রীতির আধুনিক রূপ (যার নাম সরল কলামাত্রিক) এবং সেকালে ধামালী নামে প্রচলিত আধুনিক স্বরবৃত্ত ছন্দ (যার নাম দলমাত্রিক)— দুইই রবীন্দ্রনাথের দ্বারাই প্রচলিত হয়ে রবীন্দ্রানুগামী কবিদের প্রধান উপজীব্য হয়ে দাঁড়াল। সরল কলামাত্রিকের চার থেকে আট মাত্রার পর্ব এবং দলমাত্রিকের চার দলের পর্ব দিয়ে অপূর্ব ছন্দোমাধুর্য

রচিত হল রবীন্দ্রযুগে। অন্যান্য কবিদের মতোই সত্যেন্দ্রনাথও বিভিন্ন পর্বের সরল কলামাত্রিক এবং চারদলমাত্রার দলমাত্রিক ছাঁদ দিয়ে কবিতা লিখেছেন। সত্যেন্দ্রনাথ কিন্তু তাতেই সন্তুষ্ট ছিলেন না। এর মধ্যে আরও নতুন কিছু গড়ে তোলবার সম্ভাবনা আছে কিনা দেখতে চাইলেন।

এই প্রয়োজনীয়তাবোধ তাঁর বিশেষ করে মনে এসেছিল ইংরেজি ও সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে কৌতূহলী পরিচয়ের ফলে। সংস্কৃত ভাষার ধ্বনিবৈশিষ্ট্য হচ্ছে উচ্চারণের হ্রস্ব-দীর্ঘতা। হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণকেই বিশেষ বিশেষ প্রণালীতে সাজিয়ে বিভিন্ন সংস্কৃত ছন্দ তৈরী হয়। আবার এই উচ্চারণকালকে মাত্রা হিসাবে ধরে নিয়ে পর্বে পর্বে সমান মাত্রা রক্ষা করেও সংস্কৃতে (এবং প্রাকৃতে) আর-এক জাতের ছন্দ হয়। প্রথমটির নাম বৃত্তচ্ছন্দ, দ্বিতীয়টির নাম জাতিচ্ছন্দ। সংস্কৃত ছন্দ মূলতই উচ্চারণকালনির্ভর। উচ্চারণকালনির্ভর মাত্রামূলক জাতিচ্ছন্দের বিবর্তনেই সৃষ্টি হয়েছে বাংলা সরল কলামাত্রিক ছন্দ।

আবার ইংরেজি ছন্দের রীতি সম্পূর্ণ অন্য রকম। উচ্চারণকাল তার নিয়ামক নয়, তার নিয়ামক প্রস্বর। প্রস্বরিত-অপ্রস্বরিত ভেদে ইংরেজি ছন্দের বৈচিত্র্য আসে। প্রস্বর পড়ে সিলেবলে, পরিভাষা দিয়ে বলতে গেলে, দলে। বাংলার মৌখিক ভাষার ধ্বনি প্রকৃতির সঙ্গে এর একটা সাদৃশ্য আছে। লিখিত রূপে নয়, মৌখিক রূপে দল এবং প্রস্বর বাংলা ভাষারও বৈশিষ্ট্য। এই মৌখিক ভাষার ধ্বনি-প্রকৃতি অবলম্বনে গড়ে উঠেছে দলমাত্রিক ছন্দ। বাংলায় যে তৃতীয় আর-একটি প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত ছন্দ আছে যার নাম বিশিষ্ট কলামাত্রিক, পূর্বে যাকে বলা হত অক্ষরবৃত্ত ছন্দ— সেই ছন্দে দল এবং মাত্রা দুয়েরই মর্যাদা থাকায় একটি 'ব্যালান্সড' সংযত ধীর ছন্দের সৃষ্টি হয়েছে— সেটি সাধারণ সংলাপ গদ্যের নিকটবর্তী।

অতএব ছন্দের মূল উপাদান তাহলে কলামাত্রা অথবা দলমাত্রা। সত্যেন্দ্রনাথ বাংলা ছন্দের এই গোড়ার উপকরণ থেকেই নানা ছন্দোবৈচিত্র্য সৃষ্টির সম্ভাবনা দেখলেন। তিনি যে সংস্কৃত ছন্দ বাংলায় নিয়ে আসতে চাইলেন বাংলা উচ্চারণে অবিচ্ছেদ্য দল এবং প্রস্বরের সঙ্গে মিলিয়েই তাকে আনতে হয়েছে। নইলে বাংলা নিজস্ব ধ্বনি-স্বভাবের সঙ্গে তার মিল হবে না। আবার ইংরেজি ছন্দের প্রস্বরিত দল বিন্যাসকেও আনতে হয়েছে কলামাত্রাসূচক উচ্চারণকালের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ যেমন বাংলা ছন্দকে নির্দিষ্ট তিনটি রীতিতে স্বাভাবিক ভাবেই বিন্যস্ত করে দিয়ে

গেলেন, সত্যেন্দ্রনাথ ভেদরেখা তুলে দিয়ে কলামাত্রা ও দলমাত্রা মিলিয়ে নতুন রীতির ছন্দ সৃষ্টি করলেন। এই ছন্দে ইংরেজি এবং সংস্কৃতের ছন্দোধ্বনিকে বাজিয়ে তোলা গেল বাংলার বীণায়।

এবার দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। প্রচলিত দলমাত্রিক ছন্দের একটি সত্যেন্দ্রনাথ-কৃত রচনা—

কল্‌কে ফুলের . কুঞ্জবনে . জল্‌ছে আলো . খাস্‌গেলাসে,
অভ্র-চিকণ টিকলি জলের ঝলমলিয়ে যায় বাতাসে ;
টোকার টোপর মাথায় দিয়ে নিড়েন হাতে কে ওই মাঠে ?
গুড়-চালেতে মিলিয়ে কারা ছিটায় গায়ে জলের ছাটে ?

এর প্রতি পঙক্তিতে চারটে পর্ব ; প্রতি পর্বে চারটে দল (সিলেবল্)। প্রত্যেক পর্বের গোড়ার দলে পড়ছে প্রস্বর (অ্যাক্‌সেণ্ট)। দলমাত্রিক ছন্দের এটাই আদর্শ গঠন। 'ক্ষণিকা'তে রবীন্দ্রনাথ এর এই গঠনটি স্থির করে দেন! কোনো কোনো ক্ষেত্রে শেষ পর্বটি অপূর্ণ অর্থাৎ দুই দলেও থাকে।

সরল কলামাত্রিক ছন্দের সত্যেন্দ্রনাথ-কৃত রচনা—

মৃত্যু হেথায় অমৃতের সেতু, শব নাই—শুধু . শিব।
মনে লয় মোর হেথা একদিন মিলিবে নিখিল জীব।
আত্মার সাথে হবে আত্মার নবীন আত্মীয়তা।
মিলন ধর্মী মানুষ মিলিবে ; এ নহে স্বপ্নকথা।

এর প্রতি পঙক্তিতে চারটি পর্ব ; শেষের পর্বটি অপূর্ণ। এখানে প্রতি পর্বের সমতা (ছয় কলামাত্রা) রক্ষা করা হয়েছে উচ্চারণকাল-পরিমাণ দিয়ে, দলসংখ্যা দিয়ে নয়। সেইজন্য এখানে উচ্চারণ একটু ধীরগতি। যুগ্মধ্বনিগুলি একটু টেনে পড়তে হয় অর্থাৎ তাতে দুই কলামাত্রার প্রয়োজন হয়। এই পদ্ধতিটি রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তন করেন 'মানসী' কাব্য থেকে। প্রাকৃত এবং বৈষ্ণব পদাবলীতে যুগ্মধ্বনি ছাড়াও দীর্ঘস্বরও টেনে পড়া হত, এবং সেইভাবে মাত্রাসংখ্যা সমান রাখা হত ; যেমন জয়দেবের—

অহহ কল . য়ামি বল . -য়াদি মণি . ভূষণং

এতে আছে প্রতি পর্বে পাঁচ কলামাত্রা। কিন্তু এই দীর্ঘ উচ্চারণ বাংলা উচ্চারণ-বিরোধী। সেজন্য এই ছন্দ বাংলায় পরিবর্তিত হয়ে শুধু যুগ্মধ্বনির দ্বিমাত্রিকতায় রূপান্তরিত হয়েছে।

দলমাত্রিক ছন্দ মৌখিক উচ্চারণভঙ্গিকে আশ্রয় করে থাকে। সেজন্য এতে হসন্তধ্বনির প্রাধান্য। এই দলমাত্রিকের কাঠামো ধরেই সত্যেন্দ্রনাথ কলামাত্রাকেও বিন্যস্ত করে একটি অভিনব ছন্দ উদ্ভাবন করলেন। 'ছন্দ-সরস্বতী' প্রবন্ধে তার নাম তিনি দিয়েছেন 'বুলবুল গুলজার ছন্দ'। এর নানা রকম বৈচিত্র্য। এই শ্রেণীর ছন্দে কলামাত্রার রীতিতে দলের প্রসারণ ঘটে বলেই দুই পদ্ধতির মিশ্রণ। কখনও দুটি দল অথচ চার কলামাত্রা। যেমন—

ছিপখান . তিন দাঁড় .
তিনজন . মাল্লা .
চৌপর . দিনভর .
দ্যায় দূর . পাল্লা।

কখনও তিন দল চার কলামাত্রা—

রূপশালি . ধান বুঝি .
এই দেশে . সৃষ্টি .
ধূপছায়া . যার শাড়ী .
তার হাসি . মিষ্টি।

আবার কখনও তিন দল পঞ্চকলা—

শালিক শুক . বুলায় মুখ .
থল ঝাঁঝির . মখমলে।

এমনি করে তিন দল— ছয় কলামাত্রা এবং চার দল— ছয় কলামাত্রা, দুই দল— তিন কলামাত্রা, চার দল— চারকলা, চার দল— আটকলার উদাহরণও আছে। এসব ছন্দকে সোজাসুজি সরল কলামাত্রিক বলার বাধা আছে, কারণ দলবিন্যাসের নির্দিষ্টতা এবং প্রস্বর-প্রভাবের ফলে এদের ছন্দের ধ্বনি ঠিক সরল কলামাত্রিকের মতো টানা হয় না। এক-দল শব্দ দিয়ে গড়া টানা পদ্ধতির ছন্দটিও এই প্রসঙ্গে কৌতূহলজনক—

শিষ কে দ্যায় গো আজ
তার কি ভিন্ গাঁ ঘর ?
দুখ সে তার কি পর
চাঁদ সে তার কি তাজ ?

দলবিন্যাস এবং কলামাত্রিক পদ্ধতি মিলিয়ে সত্যেন্দ্রনাথের এই ছন্দ অনুবাদগুলিই বেশি করে আমাদের বিস্ময় আকর্ষণ করে। তার কারণ সংস্কৃতের

দীর্ঘস্বর বাংলায় নেই বলে হসন্ত ধ্বনি দিয়ে যুগ্মধ্বনির প্রতিভাস রচনা করতে হয়। তাই তাতে দলবিন্যাসের নির্দিষ্টতা আসে! পঞ্চচামর ছন্দের অনুবাদ—

মহৎ ভয়ের . মুরৎ সাগর .
বরণ তোমার . তমঃ শ্যামল।

এখানে প্রতি পর্বে দুটি দল এবং প্রত্যেক দ্বিতীয় দলটি ব্যঞ্জনান্ত। সংস্কৃত ছন্দের দীর্ঘ উচ্চারণ ব্যঞ্জনান্ত দলের দুই কলামাত্রা দিয়ে পূরণ করা হয়েছে। ফলে এটা ছয় কলামাত্রার সরল কলামাত্রিক ছন্দ হয়েও দল প্রস্বরের আধিপত্যযুক্ত। এমনি করে তাঁর আছে মন্দাক্রান্তা—

বন্ধুর মুখ চাও . সখা হে সেথা যাও . দুঃখ দুস্তর . তরাও ভাই

এর কলামাত্রিক ভাগ আট-সাত-সাত-পাঁচ। পূর্বে উদ্‌ধৃত 'ছিপখান তিন দাঁড়' ছন্দেও নির্দিষ্ট স্থানে হসন্তযুক্ত দল ব্যবহার করা হয়েছে এবং এটা সংস্কৃতের দীর্ঘ উচ্চারণেরই স্থলবর্তী। বস্তুত এটা 'বিদ্যুন্মালা' ছন্দেরই অনুবাদ। মূল সংস্কৃতের ছন্দধ্বনি এই রকম—

বাসোবল্লী . বিদ্যুন্মালা . বহুশ্রেণী . শাক্রশ্চাপঃ।

সংস্কৃতের আরও নানা ছন্দ সত্যেন্দ্রনাথ দল-কলামাত্রিক রীতিতে অনুবাদ করেছিলেন— মালিনী, রুচিরা, শার্দুল বিক্রীড়িত, তোটক, গায়ত্রী।

আবার, ইংরেজির প্রস্বর বিন্যাস দ্বারা সত্যেন্দ্রনাথ গড়লেন বাংলা ছন্দ, তাতেও কলামাত্রার হিসাবও রইল। বাংলায় প্রস্বর সৃষ্টি হয় হসন্তের দ্বারাই যেমন—

দুষ্টু সেই লোকটা

সত্যেন্দ্রনাথ ইংরেজীর এই প্রস্বর রক্ষা করেই অনুবাদ করলেন সিংহল কবিতাটি—

ওই সিংহল দ্বীপ সুন্দর শ্যাম নির্মল তার রূপ
তার কণ্ঠের হার লঙ্গর ফুল কর্পূর কেশ ধূপ।

আয়াম্‌বিক এবং অ্যানাপিস্ট মিশ্রিত সেই ইংরেজি কবিতার সঙ্গে এর তুলনা করা যেতে পারে—

O young Lochinvar is come out of the west
Through all the border his steed was the best.

তাঁর 'পিয়ানোর গান' কবিতাটি ইংরেজির 'ট্রোকী'র অনুসরণেই করা।

সত্যেন্দ্রনাথের ছন্দকারুকলা বিস্তৃত আলোচনার যোগ্য। তাঁর মৌলিক দান হচ্ছে দল-কলা মিশিয়ে এক চতুর্থ শ্রেণীর ছন্দ উদ্‌ভাবন। এতে বাংলার উচ্চারণ ভঙ্গিমাকে পুরোপুরি কর্ষণ ও কাজে লাগানো হয়েছে। এক সময়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন এই হসন্ত-ধ্বনিত ছন্দই বাংলা ভাষার স্বাভাবিক ছন্দ। সত্যেন্দ্রনাথ যেন সেই ইঙ্গিত দিয়েই হসন্ত-আশ্রিত দল নিয়ে তার চূড়ান্ত পরীক্ষা করলেন। কিন্তু কোথায় যেন একটা ত্রুটি থেকেই গেল। ছন্দের চপলতাই যেন বড়ো হয়ে ওঠে। এর সঙ্গীত বড়ো তরল। সত্যিকারের সঙ্গীত গহন সংযত এবং ধ্বনিত। সে বস্তু তো সত্যেন্দ্রনাথের এই নূতন পরীক্ষায় পাই না। এই সংযম মিশ্র কলামাত্রিক (অক্ষরবৃত্ত নামে পূর্ব পরিচিত) ছন্দেই সহজ। এটি বুঝতে পেরেছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। তিনি মেলাতে চেয়েছিলেন দলমাত্রিককে মিশ্র-কলামাত্রিকের সঙ্গে। এই পরীক্ষা কবি সত্যেন্দ্রনাথ যে একেবারেই করেন নি তা নয় কিন্তু কতটুকু সার্থক হয়েছিলেন বলা যায় না।

তোমার শুভদিনে জন্মদিনে প্রণাম তোমায় করছে অখৃষ্টান
ভগবানের ভক্ত ছেলে! ঋষির ঋষি! খৃষ্ট মহাপ্রাণ!

এটা পড়তে হয় ধীরগতিতে দলমাত্রিকের প্রস্বর-তীক্ষ্ণতাকে কমিয়ে এনে। ছন্দটা অবশ্য দলমাত্রিকই।

একালের দিনে হসন্তধ্বনি নিয়ে নতুনতর পরীক্ষা হয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'পরিশেষ' কাব্যে এবং আধুনিকতর কবিদের রচনায়।[৪] সত্যেন্দ্রনাথ ছন্দকে ছকে বাঁধতে চেয়েছেন; এঁরা ছকে না বেঁধে হসন্তধ্বনিকে শব্দের মধ্যে এবং প্রান্তে নানাভাবে সংকুচিত প্রসারিত করে সংলাপ-গদ্য-ভঙ্গিমার দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন।

অন্যদিন, শীত সংখ্যা, ৮ম সংকলন,
(শিশির ভট্টাচার্য-সম্পাদিত)।

৪ দ্রষ্টব্য প্রবোধচন্দ্র সেনের প্রবন্ধ 'বাংলা ছন্দের নূতন সম্ভাবনা', পরিচয় ১৩৩৮ ফাল্গুন।

বাক্‌শিল্পী প্রমথ চৌধুরী

বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্র-যুগ বলে একটা কথা চলতি আছে। ঠিক কোন সময় থেকে এর ব্যাপ্তি, কোন পর্যন্তই বা এর সীমা— তা নিয়ে বিতর্ক হতে পারে ; কিন্তু সাহিত্যের কোনো সময়ে রবীন্দ্রনাথের প্রখর প্রভাব এসে পড়েছে —এটা অস্বীকার করবার নয়। তেমনি সেকালে ছিল বঙ্কিম-যুগ যখন বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস-রচনার ছাপ এবং প্রবন্ধ-রচনার রীতি বাংলার লেখকদের মধ্যে বেশ স্থায়িভাবেই পড়েছিল। এসব নামকরণ নিয়ে কোনো সংশয়ের অবকাশ কখনোই ঘটে নি।

প্রমথ-যুগ বলে কোনো শব্দ বাংলা সাহিত্যে এখনও পর্যন্ত গড়ে উঠেছে বলে শোনা যায় নি। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের উপর প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের যে প্রভাব পড়েছে, তাতে এরকম একটা শব্দ প্রচলিত হলে বিস্ময়ের বিষয় হত না। উপন্যাস এবং নাটক বাদ দিয়ে এ সাহিত্যের গল্প কবিতা এবং প্রবন্ধের বৃহৎ অংশে প্রমথ চৌধুরীর সুস্পষ্ট ছাপ আছে। আর-কিছু না হোক বাংলা ভাষারীতির পরিবর্তনে তাঁর দান তো বাঙালি সাহিত্যপাঠক নিত্যই স্মরণ করবেন। এ প্রভাব এমনই যে রবীন্দ্রনাথও একে স্বীকার করেছিলেন, অনুবর্তন করেছিলেন এবং পরিণতি দিয়েছিলেন। সাহিত্যের যে-তিনটি দিকের চর্চা প্রমথ চৌধুরী করেছিলেন, সেই তিনটিতেই তিনি যে অভিনবত্ব দেখিয়ে গিয়েছেন তা বিস্ময়জনক। এই তিনটি দিকেই রবীন্দ্রনাথের অকুণ্ঠ প্রশস্তি তিনি অর্জন করেছিলেন— সে সময়ে প্রমথ চৌধুরীর মৌলিকতায় অন্য সকলে সংশয়মুক্ত হতে পারে নি। তার পরে সবুজপত্র প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে গড়ে উঠল এক লেখকগোষ্ঠী। তাঁরা প্রমথ চৌধুরীকে গুরু বলে মান্য করতেন। এই-সব সাহিত্যশিষ্যের মধ্যে দিয়ে এবং নিজেও প্রায় চল্লিশ বৎসর ধরে লিখে তিনি সাহিত্যের এক নতুন রুচি এবং রীতি তৈরি করতে পেরেছিলেন। সুতরাং বাংলা সাহিত্যের একটি পর্যায়কে 'প্রমথ-যুগ' বললে হয়তো অনুচিত হত না।

কিন্তু তা যে হয় নি, তার কারণ প্রমথ চৌধুরীর ব্যক্তিত্ব ও রচনাবৈশিষ্ট্যের মধ্যেই নিহিত। আমরা যখন 'বঙ্কিম-যুগ' বা 'রবীন্দ্র-যুগ' বলি তখন আমরা সাহিত্যের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গভীরতর প্রবণতাকেই বুঝি। সাহিত্যের বহিরঙ্গ রীতি

দিয়ে যুগকে চিহ্নিত করি না। 'বঙ্কিম-যুগ' বলতে জীবন ও সাহিত্যের একটা দৃঢ় এবং গভীর মূল্যবোধকে বোঝায়। গভীর স্বদেশপ্রীতি, অটল সমাজকল্যাণবোধ, কঠোর মনুষ্যত্বসাধন— বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালিকে এই-সব মূল্যবোধে দীক্ষিত করেছিলেন। এই আদর্শ নিয়ে উনিশ শতকে তাঁর সময়ে কেউ প্রশ্ন তোলে নি। বঙ্কিমচন্দ্রের এই-সব ভাবনা অন্যান্য মনীষীরাও জ্ঞাত বা অজ্ঞাত -সারে অনুসরণ করে এসেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র হয়তো নিজে এই আদর্শকে একা তৈরি করেন নি কিন্তু তাঁর সময়ের ভাবনাকে তিনি সংহত রূপ দিয়েছিলেন। রবীন্দ্র-যুগে রবীন্দ্রনাথ গড়ে তুললেন নতুনতর মূল্যবোধ— সৌন্দর্যবোধ, বিশ্বতোমুখিনতা এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ। প্রবন্ধে গল্পে কবিতায় এই আদর্শ সমসাময়িকদের প্রভাবিত করেছে। 'সোনার তরী' 'চিত্রা'-যুগের সৌন্দর্যচর্চা দীর্ঘকাল, কল্লোল-পর্ব পর্যন্ত, কবিদের আকর্ষণ করেছে। গল্পগুচ্ছের পল্লীচিত্রও তেমনি অনুকৃত হয়ে এসেছে; চোখের বালির উপন্যাসরীতি তো আজও অব্যাহত; চিন্তার ক্ষেত্রে বাঙালিকে বিশ্বতোমুখী করে তুলতে রবীন্দ্রনাথের দান অপরিসীম। 'রবীন্দ্র-যুগ' কথাটা যে সার্থক তাতে কি আর সন্দেহ আছে?

এ দিক দিয়ে দেখলে প্রমথ চৌধুরী কি আমাদের মনের জগতে কোন স্থায়ী মূল্যমান সৃষ্টি করে গিয়েছেন? তাঁর অপ্রতিহত ব্যক্তিত্ব সাহিত্যের বাহির-মহল ছাড়িয়ে অন্দর-মহলে পৌঁচেছে কি— যেখানে অন্তঃপুরলক্ষ্মী তাঁর স্নেহ দিয়ে হৃদয় দিয়ে সন্তানকে গড়ে তোলেন, যেখানে কল্যাণময়ী শ্রী সংসার ও সমাজকে আড়াল থেকে প্রভাবিত করে রূপ দেয়? প্রমথ চৌধুরীর রচনাকে এ দিক দিয়ে যাচাই করে মূল্য নির্ধারণ করবার সময় এসেছে। হয়তো এই গভীরতর নিশ্চয়াত্মক আদর্শের অভাবেই 'প্রমথ-যুগ' কথাটি অপ্রচলিত থেকে গিয়েছে।

দুই

ম্যাক্‌স বীয়ারবোম সম্বন্ধে ভারজিনিয়া উল্‌ফ বলেছিলেন তিনি সাহিত্যে এনেছেন ব্যক্তির উপস্থিতি। প্রমথ চৌধুরী যখন বীরবল নাম নিয়ে বর্তমান শতকের গোড়ার দশকে মাসিকপত্রে আবির্ভূত হলেন তখন তাঁর সম্বন্ধে এই কথা বলাও খুবই স্বাভাবিক হত। সাহিত্যসৃষ্টির সঙ্গে ব্যক্তিরূপের যে অচ্ছেদ্য সম্পর্ক সে তত্ত্ব নতুন করে আলোচনার দরকার নেই। বঙ্কিমের আগের বাংলা গদ্যের সঙ্গে বঙ্কিমের গদ্যের তুলনা করলেই সেটা আপনা থেকেই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। বীরবল লিখতে আরম্ভ করার আগেই বাংলায় সাহিত্যিক গদ্য প্রতিষ্ঠিত

হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-রামেন্দ্রসুন্দর-হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর লেখা বাংলা সাহিত্যে গদ্যের ঐশ্বর্য সৃষ্টি করেছে। এঁদের গদ্য যে সাহিত্যসম্পদরূপে স্বীকৃত হয়েছে, তার অর্থ ব্যক্তিমনের ছাপ এই গদ্যরচনার মধ্যে আঁকা হয়ে গিয়েছে। তবু বীরবলের লেখায় ফুটে উঠল ব্যক্তিমনের আর-এক রূপ। এর বিশেষত্ব এই যে, এই ব্যক্তিত্ব নিজেকে প্রচ্ছন্ন করে নৈর্ব্যক্তিক ভাবে আত্মপ্রকাশ করে না, নিজেকে সশব্দে এবং সপ্রত্যয়ে ঘোষণা করে। অপ্রয়োজনের মধ্যে দিয়ে, খেয়ালি লেখাতেই যথার্থ সৃষ্টি— এই কথাটি বলতে গিয়ে বীরবল বলেছিলেন—

"খেয়ালী লেখা বড়ো দুষ্প্রাপ্য জিনিস। কারণ সংসারে বদখেয়ালী লোকের কিছু কমতি নেই, কিন্তু খেয়ালী লোকের বড়োই অভাব। অধিকাংশ মানুষ যা করে তা আয়াসসাধ্য ; সাধারণ লোকের পক্ষে একটুখানি ভাব অনেকখানি ভাবনার ফল। মানুষের পক্ষে চেষ্টা করাটাই স্বাভাবিক, সুতরাং সহজ। স্বতঃউচ্ছ্বসিত চিন্তা কিংবা ভাব শুধু দু-এক জনের নিজ প্রকৃতিগুণে হয়। যা আপনি হয় তা এতই শ্রেষ্ঠ ও এতই আশ্চর্যজনক যে, তার মূলে আমরা দৈবশক্তি আরোপ করি।"[১]

প্রায় একই ধরনের কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'বাজে কথা' প্রবন্ধে—

"অন্য খরচের চেযে বাজে খরচেই মানুষকে যথার্থ চেনা যায়। কারণ মানুষ ব্যয় করে বাঁধা নিয়ম-অনুসারে, অপব্যয় করে নিজের খেয়ালে।

যেমন বাজে খরচ তেমনি বাজে কথা। বাজে কথাতেই মানুষ আপনাকে ধরা দেয়। উপদেশের কথা যে রাস্তা দিয়া চলে মনুর আমল হইতে তাহা বাঁধা, কাজের কথা যে পথে আপনার গোযান টানিয়া আনে সে পথ কেজো সম্প্রদায়ের পায়ে পায়ে তৃণপুষ্পশূন্য চিহ্নিত হইয়া গেছে। বাজে কথা নিজের মতো করিয়াই বলিতে হয়।"[২]

বীরবলী ভঙ্গি যে তীক্ষ্ণ সে শুধু কথ্যরীতির জন্যই নয়, বলার ভঙ্গিতেই একটি উৎকেন্দ্রিক প্রত্যয় আছে। এই প্রত্যয় থেকেই একটি অহম্মন্য ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের উক্তিতে বক্তব্য নির্বিশেষ, তাতে লেখকের ব্যক্তিত্ব স্নিগ্ধ প্রচ্ছন্ন এবং শান্ত। এ যেন কবির নিজের কথা নয়, এ সকলেরই কথা। বিচিত্র প্রবন্ধের লেখা পড়লেই দেখা যায়, সাহিত্যে একটি নতুন তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে— সাহিত্য সমষ্টিমনের সৃষ্টি নয়, ব্যক্তিমনের সৃষ্টি।

---

১ 'খেয়ালখাতা', ১৩১২।

২ 'বাজে কথা', ১৩০৯, বিচিত্র প্রবন্ধ।

পঞ্চভূতের প্রবন্ধেও রবীন্দ্রনাথ এই কথার ইঙ্গিত দিয়েছেন। এই দুটি বইয়ের লেখাগুলির রচনাকাল গত শতাব্দীর শেষ দশক এবং বর্তমান শতকের প্রথম দশক। 'কেকাধ্বনি'তে বলেছেন রবীন্দ্রনাথ—

"আমাদের এই মায়াবী মনটিকে সৃজনের অবকাশ না দিলে সে কোনো মিষ্টতাকেই বেশিক্ষণ মিষ্ট বলিয়া গণ্য করে না। সে উপযুক্ত উপকরণ পাইলে কঠোর ছন্দকে ললিত, কঠিন শব্দকে কোমল করিয়া তুলিতে পারে। সেই শক্তি খাটাইবার জন্য সে কবিদের কাছে অনুরোধ প্রেরণ করিতেছে।"

এই সৃজনী মনটির কথা রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্যে'র এ-সময়ে লেখাতেও বলেছেন—

"জগৎ হইতে মন আপনার জিনিস সংগ্রহ করিতেছে, সেই মন হইতে বিশ্বমানবমন পুনশ্চ নিজের জিনিস নির্বাচন করিয়া নিজের জন্য গড়িয়া লইতেছে।"[৩]

সুতরাং সাহিত্যক্ষেত্রে প্রমথ চৌধুরীর পদার্পণের আগেই সাহিত্যের সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যক্তিমনের ভূমিকাকে স্বীকার করে নিয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যতত্ত্বের আলোচনায় সৃষ্টিশীল মনের কথা সেভাবে বলেন নি। রবীন্দ্রনাথের চিন্তাতেই ব্যক্তিমনের স্বীকৃতি। -চিন্তার ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্ববাদের এই উদ্ভব সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরীর উপস্থিতির পূর্বসূচনা মাত্র। কিন্তু প্রমথ চৌধুরীতে এই লেখকমনটি একটু উগ্র হয়েই দেখা দিল। বীরবলের রচনাতে প্রায়শই 'আমি' এবং 'আমার' শব্দ দুটির সাক্ষাৎ মেলে। এই প্রয়োগ সেই উগ্র ব্যক্তিত্ববাদেরই ইঙ্গিতবহ। রবীন্দ্রনাথ যে-মনটির কথা বলেন, লেখকের সৃষ্টিতে সেই মন থাকে প্রচ্ছন্ন— If the style be the man, in all the colour and intensity of a veritable apprehension, it will be in a real sense impersonal। রবীন্দ্রনাথের নিজের রচনাতে অনুগ্র ব্যক্তিত্বের মৃদু স্পর্শ সহজেই অনুভব করা যায়। সেটাই তাঁর লেখার বিশিষ্ট স্বাদ। প্রমথ চৌধুরী যেখানে সাহিত্যসৃষ্টির কথা বলেছেন সেখানে ব্যক্তিমনের সংজ্ঞা যেমন আলাদা তেমনি তাঁর নিজের লেখার ব্যক্তিস্বাদটিও আলাদা। 'সবুজপত্রের মুখপত্রে' তিনি বলছেন—

"সাহিত্য হচ্ছে ব্যক্তিত্বের বিকাশ। সুতরাং সাহিত্যের পক্ষে মনের ঐ

---

৩ 'সাহিত্যের সামগ্রী', ১৩১০।

পড়ে-পাওয়া-চৌদ্দআনার চাইতে ব্যক্তিবিশেষের নিজস্ব দুআনার মূল্য ঢের বেশি। কেননা ঐ দুআনা হতেই তার সৃষ্টি এবং স্থিতি, বাকি চৌদ্দআনায় তার লয়। যার সমাজের সঙ্গে ষোলোআনা মনের মিল আছে, তার কিছু বক্তব্য নেই। মন পদার্থটি মিলনের কোলে ঘুমিয়ে পড়ে, আর বিরোধের স্পর্শে জেগে ওঠে। এবং মনের এই জাগ্রত ভাব থেকেই সকল কাব্য সকল দর্শন সকল বিজ্ঞানের উৎপত্তি।"

প্রমথ চৌধুরী নিজের চিন্তায় এবং রচনায় এই বিরোধের ভাবটিকেই জাগিয়ে রাখতে চেয়েছেন। নিজের চিন্তা এবং অনুভূতিকে তিনি বিশিষ্ট এবং আলাদা করেই ফুটিয়ে রেখেছেন। যা প্রচলিত, যা অভ্যস্ত, যা নিয়ে কেউ প্রশ্ন করছে না কিংবা সমাজের চৌদ্দআনা লোক যা আলোচনা করে সুখ পায়, তিনি তাতে সুখ পান না। তিনি একটা ভিন্ন দৃষ্টিকোণ অবলম্বন করলেন, ভিন্ন সিদ্ধান্ত করলেন। সেইজন্য প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের চিন্তাপ্রকৃতি একটা ভিন্ন পথ বেছে নিয়েছে। বঙ্কিমের যুগ ছিল প্রাকৃতিক নিয়মে বিশ্বাসের যুগ। স্পেন্সার ডারউইন জগতের যে নিয়ম বোঝাবার চেষ্টা করেছেন, বাক্‌ল্ সভ্যতার ইতিহাসে সে-রকম নিয়মেরই পথ ধরেছিলেন, সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করতে টেন তেমনি নিয়মের অমোঘতায় বিশ্বাস করিয়েছিলেন। তাই বঙ্কিমচন্দ্রও সেকালে বলেছিলেন—

"সকলই নিয়মের ফল, সাহিত্যও নিয়মের ফল"[৪]

কিংবা—

"বৈজ্ঞানিক যখন Lawর মহিমা কীর্তন করেন আর আমি যখন হরিনাম করি দুইজনই একই কথা বলি। দুইজনে এক বিশ্বেশ্বরের মহিমা কীর্তন করি।[৫]

জগৎকে যখন 'নিয়মের রাজত্ব' বলে মনে করি তখন বস্তুত প্রাণের তত্ত্বটিকে আমরা উপেক্ষা করি, তেমনি সাহিত্যকে যখন নিয়মের ফল বলে মনে করি, তখন সৃষ্টিশীল মনটিকে আমরা ভুলে যাই। উনিশ শতকের চিন্তাধারার প্রতিক্রিয়ায় ডারউইনের পর এসেছিলেন বার্গসঁ, তেমনি আমাদের দেশেও ক্ষুদ্রতর পরিধিতে বঙ্কিম-যুগের পর রবীন্দ্রনাথ এবং প্রমথ চৌধুরী। প্রমথ চৌধুরী তো স্পষ্টতই

৪ বিদ্যাপতি ও জয়দেব।

৫ ধর্মতত্ত্ব, ৬।

বার্গসঁকে বলেছেন 'আমার দার্শনিক গুরু'। সবুজপত্রের প্রথম সংখ্যাতেই বার্গসঁ-শিষ্য লিখলেন—

"পাতা কখনও আর কিশলয়ে ফিরে যেতে পারে না। প্রাণ পশ্চাৎপদ হতে জানে না— তার ধর্ম হচ্ছে এগোনো। তার লক্ষ্য হচ্ছে হয় অমৃতত্ব নয় মৃত্যু। যে মন একবার কর্মের তেজ ও জ্ঞানের ব্যোমের পরিচয় লাভ করেছে, সে এ উভয়কে অন্তরঙ্গ করবেই,— কেবলমাত্র ভক্তির শান্তিজলে সে তার সমস্ত হৃদয় পূর্ণ করে রাখতে পারে না। আসল কথা হচ্ছে তারিখ এগিয়ে কিম্বা পিছিয়ে দিয়ে যৌবনকে ফাঁকি দেওয়া যায় না।"

এই অগ্রগতি কখনোই যান্ত্রিক নিয়ম-মাফিক যাত্রা নয়। এ হচ্ছে প্রাণের যাত্রা নতুন সৃষ্টির পথে, মনের যাত্রা চিন্তার ও কল্পনার পথে। এইজন্যই তিনি সব রকম জড়তার বিরোধী, স্থবিরের শাসননাশন যৌবনশক্তির প্রতীক।

তিন

প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধ গল্প ও কবিতা— এই তিনেরই মূলে ছিল সপ্রতিভ জাগ্রত মন। এইজন্যই তিনি প্রচলিত ভাষারীতি পরিবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন। চলতি ভাষাতে জাগ্রত সজীব মনটি সোজাসুজি নিজের কথা বলতে পারে— অন্য কোনো পূর্বনির্দিষ্ট রীতির ফরমে নিজেকে বদ্ধ করে না। চলতি ভাষার পক্ষে এই যুক্তি সর্বজনস্বীকার্য হবে কি না জানি না। সাধু গদ্যের একটা ব্যক্তিনিরপেক্ষ চেহারা আছে। অবশ্য সাধুগদ্যের মধ্যে ব্যক্তিরূপকে ফোটানো যায় না, এ কথা একেবারেই অগ্রাহ্য। তবু সাধু গদ্যের একটা সংযমের শাসন আছে, তাতে কোনো কোনো চলতি ইডিয়মকে স্ল্যাঙ্ মনে হতে পারে কিংবা চলতি বাক্যগঠন বা হসন্ত-উচ্চারণ তাতে অশোভন মনে হতে পারে। ফলে প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার জগতের সঙ্গে সাধু গদ্যাশ্রয়ী ভাবনার একটা ব্যবধান তৈরিও হতে পারে। এই ব্যবধান ঘোচাতে হলে ইডিয়ম-সম্মত চলতি গদ্যকেই স্বীকার করে নিতে হবে। কিন্তু চলতি গদ্যকে সহ্য করতে অনেকে পারেন নি, তার একটি কারণ তার উচ্চারণভঙ্গি, অন্য কারণ হচ্ছে 'অ-সাধু' ইডিয়ম-প্রয়োগ। 'ভদ্রলোকেরা প্রবাদ উচ্চারণ করেন না'— ইংরেজিতে প্রচলিত এই প্রবাদটির মূলে যে-রুচি আছে, সে-রুচি থেকে নব্য ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালি একেবারে মুক্ত ছিল না। প্রমথ চৌধুরী এখানেই বাংলা গদ্যভাষায় নতুনত্বের সৃষ্টি করলেন। হসন্তবহুল এবং প্রস্বরসমন্বিত বাংলা

উচ্চারণভঙ্গি তিনি দুঃসাহসিকতার সঙ্গেই সাহিত্যিক গদ্যে প্রবর্তন করলেন। একটি দৃষ্টান্ত দিই—

"বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচি— জিনিসটা এ দেশে একটা মস্ত ঠাট্টার সামগ্রী। কিন্তু বারো পাত বইয়ের তেরো পাত সমালোচনা দেখে কারোই হাসি পায় না। অথচ বীজ পরিমাণে এক হাত কমই হোক কি এক হাত বেশিই হোক, তার থেকে নতুন ফল জন্মায়; কিন্তু ঐরূপ সমালোচনায় সাহিত্যের কিংবা সমাজের কি ফললাভ হয়, বলা কঠিন।"[৬]

এ কথা বলাই বাহুল্য যে, চলতিরীতির প্রতি প্রমথ চৌধুরীর বিশেষ ঝোঁক ছিল বলে সাধারণ আলাপের ভাষার মতোই তাঁর গদ্যভাষা অসজ্জিত বা বিশৃঙ্খল— এ কথা অবশ্যই বলা যায় না। তিনি চলতি রীতির একটি সাহিত্যিক রূপ দিয়েছিলেন। শব্দনির্বাচনে তিনি কৃত্রিমভাবে সতর্ক ছিলেন না; তাঁর শব্দচয়ন অনায়াস-সাধু—

"দেহ ও মনের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধের উপর মানবজীবন প্রতিষ্ঠিত হলেও দেহ-মনের পার্থক্যের উপরেই আমাদের চিন্তারাজ্য প্রতিষ্ঠিত। দেহের যৌবনের সঙ্গে মনের যৌবনের একটা যোগাযোগ থাকলেও দৈহিক যৌবন ও মানসিক যৌবন স্বতন্ত্র। এই মানসিক যৌবন লাভ করতে পারলেই আমরা তা সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে পারব। দেহ সংকীর্ণ ও পরিচ্ছন্ন; মন উদার ও ব্যাপক।"[৭]

তাঁর চলতি গদ্যের আর-একটি ফল এই যে প্রস্বরবাহুল্য ঘটায় বাংলা গদ্যের এতকাল প্রচলিত মাত্রাগুণ কমে গেল। রবীন্দ্রনাথের 'প্রাচীন সাহিত্যে'র গদ্য পড়তে গেলে আপনা থেকেই একটা টানা সুর আসে। তার থেকেই বোঝা যায় সাধু শব্দ এবং সাধু ক্রিয়াপদের উচ্চারণে এই মাত্রাগুণ স্বভাবতই আসে। প্রমথ চৌধুরীর গদ্য মাত্রাগুণবর্জিত এবং প্রস্বরিত। ফলে বাংলা গদ্যের প্রকৃতিকেই তিনি যেন অনেকটা বদলে দিলেন। এটা তাঁর একটি বিশেষ স্মরণীয় কীর্তি।

প্রমথ চৌধুরী বাংলা গদ্যকে কৃত্রিমতামুক্ত করে লোকের মুখের ভাষার উপর প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন, এই প্রয়াসের মূলে ছিল তাঁর সাহিত্য সম্বন্ধে এক নতুন ধারণা। সেকালে তিনিই বুঝেছিলেন বাংলা সাহিত্যে গণধর্ম প্রসারের যুগ এসে গিয়েছে, বহুশক্তিশালী অল্পলেখকের জায়গায় অল্পশক্তিশালী বহু

৬ মলাট-সমালোচনা, ১৩১৯।

৭ 'যৌবনে দাও রাজটিকা', ১৩২১।

লেখকেরা আসতে আরম্ভ করেছেন ; সাহিত্য সংবাদপত্রাশ্রিত হয়ে উঠেছে ; অসাধারণ চরিত্র-সৃষ্টির পরিবর্তে সাধারণ চরিত্র-সৃষ্টির দিকে লেখকদের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছে। 'বর্তমান বঙ্গসাহিত্য' (১৩২২) এবং 'আধুনিক বঙ্গসাহিত্য' (১৩২০) প্রবন্ধ দুটিতে প্রমথ চৌধুরী বাংলা সাহিত্যের প্রকৃতির পরিবর্তনগুলি চমৎকার বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, তাতে অন্তর্দৃষ্টি এবং দূরদৃষ্টি দুইই অসাধারণ। অবশ্য এই যুগান্তরের ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল রবীন্দ্রনাথের পঞ্চভূতের অন্তর্গত 'মনুষ্য' প্রবন্ধটিতে। প্রমথ চৌধুরী প্রবল জোরের সঙ্গেই বলেছিলেন একাল হচ্ছে 'চুটকি' অর্থাৎ ক্ষুদ্রকায় সাহিত্য-সৃষ্টির কাল। আপাতদৃষ্টিতে এই তত্ত্বটিকে তাঁর নিজের লেখার সমর্থন বলে মনে হলেও কথাটি সাধারণভাবেই সত্য। প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধ যেমন সাময়িকপত্রেরই স্থানোপযোগী পরিমিতদেহ, তাঁর গল্প এবং কবিতাও তেমনি ক্ষুদ্রদেহ। তিনি উপন্যাস লেখেন নি, তেমনি ধর্মতত্ত্ব বা কৃষ্ণচরিত্রের মতো তত্ত্বগ্রন্থও লেখেন নি।

বস্তুত প্রমথ চৌধুরী মূলতই সাহিত্যিক, তাত্ত্বিক নন, দার্শনিক নন, কিংবা ঐতিহাসিক নন। তবে সাহিত্যিক বলতে আমরা সাধারণত বুঝি গল্প-কবিতার লেখক। গুরু-প্রবন্ধের লেখকরা হয় দার্শনিক না হয় ঐতিহাসিক। প্রমথ চৌধুরী সাহিত্য নিয়েও লিখেছেন কিন্তু তার চেয়েও বেশি লিখেছেন ইতিহাস সমাজ বা অন্যান্য বিষয় নিয়ে। তথাপি তাঁর পরিচয়, তিনি সাহিত্যিক। এর কারণ, নানা বিষয়ে প্রচুর পড়াশোনার ফলে তাঁর লেখায় সত্য ও তত্ত্বের চমক থাকলেও তত্ত্ব-রচনা ছিল তাঁর গৌণ উদ্দেশ্য। বিষয় যাই হোক, সেই বিষয়কে পরিবেষনের রীতিই প্রধানত পাঠকের চিত্তকে আকৃষ্ট করে রাখে। লেখার সঙ্গে জড়িয়ে আছে যে নিপুণ বাক্‌কুশলী বৈদগ্ধ্যপরায়ণ, বুদ্ধি-উজ্জ্বল পরিহাসনিপুণ লেখক ব্যক্তিটি, পাঠকদের মনে তারই ছাপ পড়তে থাকে। 'এসে' নামক বস্তুটি এই ভাবেই সাহিত্য-গুণান্বিত হয়ে পাঠকের পরম আস্বাদ্য হয়ে ওঠে। এই বিশিষ্ট অর্থে প্রমথ চৌধুরীর মতো 'এসেইস্ট' আমাদের সাহিত্যে কমই দেখা গিয়েছেন। এসেইস্ট যেমন অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর বিষয় নিয়ে কথার ফুলঝুরি তৈরি করতে পারেন তেমনি গুরুবিষয় নিয়েও পারেন কিন্তু বিষয়গৌরবটাকেই প্রধান না করে বচনভঙ্গিমাকেই আর্টে পরিণত করতে হয়— 'the charm of the essay depends upon the charm of the mind that has conceived and recorded the impression'.

চার

এত বড়ো শক্তিশালী গদ্যলেখক যিনি ব্যঙ্গে পরিহাসে ভাষার দ্যুতিতে বাঙালির চিন্তাজড়তা ঘোচাতে চেয়েছিলেন, সবুজপত্রের সম্পাদকরূপে দেখা দেবার আগে দু বছর তিনি কবিতাচর্চা করেছিলেন। তাঁর সনেট পঞ্চাশৎ ১৯১৩-তে বেরোয়। রবীন্দ্রনাথ তখন বিলেতে। বিলেতে থেকেই তিনি সনেট পঞ্চাশৎ পড়ে বিস্ময় প্রকাশ করে ইন্দিরাদেবী এবং প্রমথ চৌধুরীকে চিঠি লেখেন। রবীন্দ্রনাথের সেই মন্তব্যগুলি বর্তমানে সুপরিচিত হয়েছে। 'বীণাপাণির খড়্গপাণি মূর্তি' 'সরস্বতীর বীণায় ইস্পাতের তার' 'ভাবটুকু এক-একটি নিরেট মাণিকের মতো' 'কোথাও যেন কিছু কিছু রক্তের দাগ'— রবীন্দ্রনাথের এই-সব মন্তব্য প্রমথ চৌধুরীর কবিতা সম্বন্ধে অতিশয়োক্তি বলে পরিগণিত হয় নি। এতে প্রমথ চৌধুরীর কবিতার যে অভ্রান্ত বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করা হয়েছে তা বাংলা কবিতার স্মরণীয় দিক্‌পরিবর্তনের ইঙ্গিত। এই ইঙ্গিত যে রবীন্দ্রনাথের মুখেই পাওয়া গেল, এ ঘটনাও কম অর্থপূর্ণ নয়।

প্রমথ চৌধুরী তখনও পর্যন্ত বাংলা প্রবন্ধ কিছু কিছু লিখেছেন চলতি ভাষাতেই, তবু তাঁর আবির্ভাবে তখনও কেউ সুদূরপ্রসারী তাৎপর্যকে দেখে নি। 'বঙ্গভাষা বনাম বাবু বাংলা ওরফে সাধুভাষা' (পৌষ ১৩১৯) নামে রচনাটাই নতুন ভাষান্দোলনের সূত্রপাত করে প্রমথ চৌধুরীর খ্যাতিকে ভিন্নপথে চালিত করল। সেই বছরের ভারতী পত্রিকাতে তিনি কয়েকটি সনেট লিখেছিলেন, সমাজপতির সাহিত্য পত্রিকাতেও তাঁর সনেট বেরোয়। সেইগুলিই গ্রন্থবদ্ধ হয়ে সনেট পঞ্চাশৎ রূপে প্রকাশিত হয়। সে-সময় তাঁর কবিতা সম্বন্ধে সাধারণ পাঠকসমাজে তেমন কোন সাড়া পড়ে নি। 'পদচারণ' নামে তাঁর আর-একটি কবিতার বই ১৯১৯ সালে বেরোয়। তখন তিনি সবুজপত্রের বিখ্যাত সম্পাদক, নব্যরীতির প্রবন্ধের সুপ্রতিষ্ঠিত পথিকৃৎ, নতুন ভাষা ও চিন্তার গুরু। হয়তো এই কারণেই কবি হিসাবে তাঁর আলোচনা করার বা মূল্যনির্ধারণের চেষ্টা সেকালের পাঠকেরা করে নি।

কিন্তু গদ্যলেখাতে প্রমথ চৌধুরীর যে নিজস্বতা ছিল পদ্যেও তাঁর সেই নিজস্বতা ছিল। কবিতা লেখাতে তিনি গতানুগতিক ধারায় চলেন নি। তখন রবীন্দ্রনাথের হাতে কবিতার মুক্তি ঘটেছে এবং

যেমনি ছুটিল বাণীর বন্ধ
উচ্ছ্বসি উঠে বীণার ছন্দ

স্বরের সাহসে আপনি চকিত
বীণার তার।

এ সাহস ছড়িয়ে গেছে বহু কবির মধ্যে। প্রমথ চৌধুরী সচেতন ভাবেই রবীন্দ্র-প্রবর্তিত আদর্শের থেকে মুক্ত থাকতে চেষ্টা করেছেন। এ বিষয়ে তাঁর নিজেরই স্পষ্ট উক্তি আছে। তিনি বড়ো কবিতা লেখেন নি। সনেট বা তেরজারিমা জাতীয় ছোটো কবিতা লিখেই তিনি স্বস্তি পেতেন। তাঁর কবিতার এই ফর্ম ভাবাবেগমুখর কবিদের কাছে আবেগসংযমনের আদর্শ স্বরূপ! রবীন্দ্রনাথ নৈবেদ্যের সনেটে বস্তুত সনেটের কঠোর শাসনকে মানেন নি; তা ছাড়া শব্দ-চয়নের ও চিত্ররচনার একটা স্বতন্ত্র কাব্যিক প্রকৃতিও তিনি দেখিয়ে দিলেন। প্রমথ চৌধুরী সনেটের নিয়মকে ফিরিয়ে আনলেন; ভাবাবেগে অন্ধভাবে চালিত না হয়ে জাগ্রত বুদ্ধির শাসনকে প্রবর্তন করলেন। কবিতার ভাষাকেও আমাদের গদ্যময় অনুভূতির জগতের ভাষার নিকটবর্তী করে দিলেন। 'জোর-করা ভাব আর ধার-করা ভাষা'র প্রতিক্রিয়াতেই তিনি লিখেছিলেন কবিতা।

তাঁর কবিতা আবেশজাত কবিতা নয়; তাই তাঁর মনোভাবে আত্মমগ্নতার ছাপ নেই। সনেট সম্বন্ধে বলাই হয় যে তা গাঢ়-গভীর অনুভূতির পূর্ণাঙ্গ সৃষ্টি। প্রমথ চৌধুরীর কবিতায় বিচারহীন অনুভূতির স্থান নিয়েছে জাগ্রত বিচারশীলতা অর্থাৎ একটি ক্রিটিকের মন। তাঁর ফুল-সম্বন্ধীয় কবিতাগুলিতে তাঁর মনটির এই বিশেষত্ব—

বিলাসের অঙ্গ লাগি তুমি হও জল,
নারীর আদুরে ফুল, শৌখিন গোলাপ!
নবাবেরই ভোগ্য তব রূপগুণবল,
নবাবের যোগ্য তুমি হকিমী জোলাপ!

—গোলাপ যে নবাবের ভোগ্য এবং যোগ্য এ সিদ্ধান্ত করতে হয়েছে যুক্তি পারম্পর্য দিয়ে। প্রমথ চৌধুরীর একটি উৎকৃষ্ট কবিতা 'বসন্তসেনা'। তার শেষ চার লাইন—

কলঙ্কিত দেহে তব সাবিত্রীর মন
সারানিশি জেগে ছিল, করিয়ে প্রতীক্ষা
বিশ্বজয়ী প্রণয়ের, প্রাণ যার পণ।—
তারি বলে সহ তুমি অগ্নির পরীক্ষা!

কবিতাটি সুন্দর সন্দেহ নেই। কিন্তু এ যেন উৎকৃষ্ট সাহিত্যসমালোচকের রসবিচার— রবীন্দ্রনাথের শকুন্তলার সমালোচনারই মতো।

লক্ষ্য করবার বিষয় তাঁর কবিতা আত্মগত ভাবনা নিয়ে নয়, প্রকৃতি নিয়েও নয়। অনেকগুলি কবিতার বিষয় নেওয়া হয়েছে পড়া বই থেকে। কতকগুলি নেওয়া হয়েছে চার পাশের লোকসমাজ থেকে আর কতকগুলির বিষয় হয়েছে ফুল, যে ফুল বাগানে ফোটে। অর্থাৎ কবিতার প্রেরণা এসেছে— যদি প্রেরণাই বলতে হয়, গদ্যের জগৎ থেকে। এই জগতের দিকে তাকিয়ে তাঁর মনে প্রশ্ন ও মীমাংসা জেগেছে, তারই সংহত পরিমিত প্রতিফলন হয়েছে তাঁর সনেট-কবিতায়। এক-এক সময় মনে হয় তাঁর কবিতার মিলও যেন তাঁর গদ্যরচনার অনুপ্রাস বা শ্লেষ-যমকের মতো শব্দের খেলা। ভাবের অনুরণনে যে-সমধ্বনি অতি সহজ সাবলীল ভাবে বেজে ওঠে কবিতায়, প্রমথ চৌধুরীর কবিতার মিল সে জাতীয় নয়। এ বীণায় সত্যই সোনার তার নেই, আছে ইস্পাতের তার।

প্রমথ চৌধুরী একটি চিঠিতে বলেছেন 'আমার সনেটের অন্তরে হয়ত art-এর চাইতে artificiality বেশি'। আর-একটি চিঠিতে বলেছেন 'আমি আসলে গদ্যলেখক তা আমি জানি। কিন্তু এই Rhyme-এর চর্চা করলে শব্দের পুঁজি বেড়ে যায়। অনেক শব্দ বাদ দিতে হয় আর-একটি শব্দের সঙ্গে মেলে না বলে। আমার কবিতা লেখার ভিতর এ উদ্দেশ্যও বোধ হয় ছিল।' সৌভাগ্যক্রমে প্রমথ চৌধুরী শুধুই কবি ছিলেন না, ছিলেন ক্রিটিক। তাই নিজের কবিতা সম্বন্ধে এমন অকুণ্ঠ উচ্চারণ করতে পেরেছিলেন। মনে রাখতে হবে তাঁর 'পদচারণে'র কবিতাগুলি যখন লেখা হচ্ছিল তখন বাংলা সাহিত্যে 'ভারতী'র যুগ। ভারতীর কবিরা একটা সমআদর্শে কবিতা রচনা করে চলেছেন! তাঁদের মধ্যমণি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। ভাষায় ছন্দে রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করেও অনেকেই সফল কবিরূপে বাংলা সাহিত্য-সরস্বতীর প্রসন্ন দৃষ্টি অর্জন করেছেন। তাঁদের কবিতার মূল্য অস্বীকার করা কখনোই সম্ভব নয়। হয়তো এঁদের মধ্যে অনুকরণ ছিল, কিন্তু কবিতা হিসাবে এঁদের কবিতা মূল্যহীন এ কথা বলা দুঃসাহসিকতা নিশ্চয়ই।

আসলে কাব্যের ধর্ম নিয়ে প্রমথ চৌধুরীর কিছু বলবার ছিল না। একটি কবিতায় তিনি বড় মর্মস্পর্শী করেই কবিতারসমাধুর্যের বর্ণনা দিয়েছেন—

আমি চাহি শুধু আলো, ভালো নাহি বাসি কালো
অন্তরের ঘরে।
আর জানি এক থাটি পায়ের নীচেতে মাটি
আছে সবে ধরে।
মাটি আর আলো নিয়ে, দিতে চাই দুয়ে বিয়ে
সসীমে অসীম।
যত কিছু লেখাপড়া তার অর্থ শুধু গড়া
মাটির পিদিম।[৮]

যিনি কালো ভালোবাসেন না, তিনি সৌন্দর্য ও আলোর পূজারী। এ কথা চিরপুরাতন আবার চিরনতুনও বটে। সসীমে-অসীমে মিলিয়ে দেবার বাসনাও বহুবারই রবীন্দ্র-কবিকণ্ঠে উচ্চারিত হতে শুনেছি। প্রমথ চৌধুরীর কবি-বাসনাও ভিন্ন নয়। তথাপি তাঁর কবিতার বিশেষত্ব আছে, সে বিশেষত্ব কবিতার আদর্শে নয়, কবিতার রীতিতে। তাই সনেট লিখলেন, কিন্তু লিখলেন ফরাসি রীতির, লিখলেন ট্রিয়লেট ও তেরজারিমা। নতুন সম্ভাবনার ইঙ্গিত তিনি দিলেন বাঙালি কবিদের।

প্রমথ চৌধুরী কবিতার ভাষায় রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করেন নি। রবীন্দ্রনাথের পূর্ণ প্রভাবের যুগে তিনি নিজের ভঙ্গিতে কবিতাচর্চা করেছিলেন; মনে হয় এ ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন নিঃসঙ্গ। কিন্তু সত্যই তিনি সঙ্গীহীন ছিলেন না। তাঁর কিছু আগে রবীন্দ্রনাথের যুগে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় কবিতায় এনেছিলেন এক ভিন্নতর ভঙ্গি। কবিতার ভাষাকে তর্কসঙ্কুল গদ্যাত্মক বাস্তবগন্ধী করে দ্বিজেন্দ্রলাল বাংলা কবিতার একটা ভিন্ন জাতি তৈরি করে দিয়ে গিয়েছেন। প্রমথ চৌধুরী দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতা যদি অলক্ষ্যে তাঁর কাব্যে ছায়া ফেলে থাকে তবে বিস্ময়ের কি আছে? এ কথা আজ আর অস্বীকার্য নয় যে, বাংলা কাব্যরীতিতে প্রমথ চৌধুরী এবং দ্বিজেন্দ্রলাল কেউ শেষ পর্যন্ত অবজ্ঞাত থাকেন নি। যাঁরা বাংলা কবিতায় তীব্র তীক্ষ্ণ সত্যকে বাস্তবভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করবার সাধনা করেছেন, এঁরা দুজন চিরকালই তাঁদের পূর্বসূরী বলে গণ্য হবেন।

৮ 'পত্র' পদচারণ।

পাঁচ

গল্প লিখতে আরম্ভ করেছিলেন প্রমথ চৌধুরী প্রবন্ধ ও কাব্যচর্চায় হাত পাকাবার পরে। তাঁর প্রথম গল্প প্রবাসস্মৃতি অবশ্য বেরিয়েছিল ১৩০৫-এর ভারতীতে। সে-গল্পটি সাধুভাষায় লেখা। তার পর দীর্ঘকাল গল্প তিনি বোধ হয় লেখেন নি। তাঁর বিখ্যাত 'চারইয়ারি কথা' সবুজপত্রে (১৩২২-২৩) বেরোল প্রমথ চৌধুরীর বিশিষ্ট ছাপ নিয়ে। তাঁর গল্প সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বললেন—

"তোমার গল্পগুলি আর একবার পড়লুম। ইতিপূর্বেও পড়েচি। ঠিক যেন তোমার সনেটেরই মত— পালিশ করা, ঝকঝকে, তীক্ষ্ণ। উজ্জ্বলতার বাতায়ন মগজের তিনতলা মহলে মধ্যাহ্নের আলো সেখানে অনাবৃত। রসাক্ত সুমিষ্টতা দোতলায়, সেখানে রসনার লোলুপতা। তোমার লেখনী সে পাড়া মাড়াতে চায় না।"

কথাগুলি রবীন্দ্রনাথ বলেন 'নীললোহিতের আদিপ্রেম' গ্রন্থ (১৯৩৪) সম্পর্কে। কিন্তু কথাগুলি প্রমথ চৌধুরীর সব গল্প সম্বন্ধেই অল্পবিস্তর প্রযোজ্য। 'রসাক্ত সুমিষ্টতা' তাঁর গল্পের ধর্ম নয়। এ কথা সত্য তাঁর প্রথম দিকের গল্প সম্বন্ধেও, যখন বাংলা গল্পসাহিত্যের ঐশ্বর্য তেমন ছড়িয়ে পড়ে নি। সাধনায় রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্প লিখলেন। বাংলা সাহিত্যের আর-একটি নতুন পথ তিনি তৈরি করলেন। এতে তাঁর সার্থকতা এতই অপরিমেয় যে, আশা করা গিয়েছিল এর পর বাংলা গল্পের ধারা চলবে এই পথেই। সে-সম্ভাবনা অবশ্যই নিরর্থক ছিল না।

পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ একটি বিষয়ে বারবার আমাদের অবহিত করিয়ে দিয়েছেন যে বাংলা-সাহিত্যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে আশ্রয় করে বাস্তবধর্মী গল্পের প্রবর্তন হয় গল্পগুচ্ছ থেকে। এর আগে লেখা হয়েছে অসাধারণ ঘটনার অসাধারণ গল্প। পল্লীগ্রামাঞ্চলে বেড়াতে-বেড়াতে যে-জীবনধারা রবীন্দ্রনাথের চোখে পড়েছিল তাতে নাটকীয় উপকরণের একান্ত অভাব ছিল, কিন্তু তাতে গভীরতার অভাব নেই, 'রসাক্ত সুমিষ্টতা'রও অভাব নেই। ছোটগল্পের এই বিষয়বস্তু রবীন্দ্রনাথের নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই সংগৃহীত। নানা হৃদয়মাধুর্যে, নানা সামাজিক সমস্যায়, বাঙালি পল্লীসংসারচিত্রের মধ্যেও নিটোল স্নিগ্ধতা আবিষ্কার করে রবীন্দ্রনাথ গল্পের একটা মান নির্দেশ করলেন। খুব বেশি অনুবর্তী অবশ্য দেখা গেল না; কিন্তু একজন অন্তত রবীন্দ্রনাথের এই মানটিকে

স্বীকার ও পালন করেছিলেন— প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। অবশ্য প্রভাত-কুমারের অভিজ্ঞতার জগৎ ছিল আলাদা, তাঁর গল্প কৌতুক-স্নিগ্ধতায় অপরূপ। তাঁর গল্পের বাস্তবতা ভদ্র শিক্ষিত ধনী পরিবারের বাস্তবতা— অবশ্যই তাতে কোনো তীক্ষ্ণ সমস্যার ছায়াপাত ঘটে নি। কিন্তু আমাদের সাধারণ বুদ্ধির জগতের কর্ম-ক্রিয়ার বাস্তবতা প্রভাতকুমারের গল্পে অব্যাহত। তাঁর গল্পের বয়নকৌশলও রবীন্দ্রনাথের মতোই ঘটনা-পরম্পরায় সাজানো।

ছোটগল্প রচনার এই রীতিতেও প্রমথ চৌধুরী ব্যতিক্রম ঘটালেন। প্রথম কথা এই যে, গল্পকে বাস্তবানুগত হতেই হবে, এমন কী আইন আছে? দ্বিতীয়ত, গল্পকে যে নাটকীয় ঘটনাপরম্পরায় সাজাতেই হবে তারই বা কি বাধ্যতা আছে? তৃতীয়ত, গল্পের মেজাজ। প্রভাতকুমারের গল্পের মেজাজকে যদি বলি সস্নেহ কৌতুকের, প্রমথ চৌধুরীর গল্পের মেজাজ তা হলে মজলিশি পরিহাসের। পাঠক জানেন প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধের মেজাজও তাই।

এক সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসকে বলা হয়েছে বাস্তব থেকে দূরাপসারিত, রোমান্টিক। তার পর রবীন্দ্রনাথ গল্পগুচ্ছে উত্তর ও মধ্য বাংলার পল্লীজীবন-সমাজের রসমাধুর্য দিয়ে প্রশান্ত উপভোগ্যতার সৃষ্টি করলেন। রবীন্দ্রনাথ প্রথমাবধি দরিদ্র, মধ্যবিত্ত 'চিরপীড়িত, ধৈর্যশীল, স্বজনবৎসল বাস্তুভিটাবলম্বী' বাঙালি জীবনকে সাহিত্যে প্রতিফলিত দেখার বাসনা প্রকাশ করেছেন। শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের গল্পে এবং দীনেন্দ্রকুমার রায়ের 'পল্লীচিত্র' ইত্যাদি বইতে এ জীবনটি সত্যসত্যই আভাসিত হতে আরম্ভ করেছিল। তার পর অকস্মাৎ প্রমথ চৌধুরী এক নতুন সমাজ এবং জীবনের ছবি নিয়ে এলেন সাহিত্যে। তিনি যে সমাজ আঁকলেন আর্থিক অনটন তার ধারে-কাছে নেই, তিনি যে চরিত্র আঁকলেন তারা উচ্চশিক্ষিত বিলেত-ফেরত না হয় বনেদী অভিজাত ধনী জমিদার। বন্দুক চুরুট এবং পানীয় তাদের সহচর। তাঁর গল্পের নায়িকারাও অসামান্য সুন্দরী, বিদ্যুল্লেখাবৎ। নানা বনেদী অভ্যাস এবং সংস্কারে তাদের আচরণ আমাদের সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজের পক্ষে কিঞ্চিৎ অনভ্যস্ত এবং দূরাপগত। অর্থনীতি রাজনীতি সমাজনীতি বা পরিবার-নীতি নিয়ে এদের সমস্যা নয়। সে দিক থেকে আমাদের এই স্থূল জীবনের বাস্তব তীক্ষ্ণতার সঙ্গে মুখোমুখি করিয়ে দেওয়া প্রমথ চৌধুরীর গল্পরচনার উদ্দেশ্য ছিল না। বলতে গেলে এ একরকমের শৌখিন সমাজের কাহিনী। সেজন্য প্রমথ চৌধুরী কিছুমাত্র দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন না। সাহিত্যের উদ্দেশ্য যে প্রয়োজন-

নিবারণ নয়, লৌকিক লক্ষ্যসাধন যে সাহিত্যের কাজ নয়, তাঁর মতো এমন জোর করে আর কে বলেছেন? সুতরাং জীবনের বাস্তবকে আঁকলেই যে সাহিত্য সার্থক হয় এ কথা তিনি বিশ্বাস করতেন না। কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হলেও তাঁর গল্পনীতি বোঝানোর জন্য 'গল্পলেখা' গল্পটি থেকে কিছু উদ্‌ধৃতি দিচ্ছি—

"যা নিত্য ঘটে, তার কথা কেউ শুনতে চায় না। ঘরে যা নিত্য খাই, তাই খাবার লোভে কে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যায়? যা নিত্য ঘটে না, কিন্তু ঘটতে পারে, তাই হচ্ছে গল্পের উপাদান।

এই তোমার বিশ্বাস?

এ বিশ্বাসের মূলে সত্য আছে। ঝড়-বৃষ্টির হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্য রাতদুপুরে একটা পোড়ো মন্দিরে আশ্রয় নিলুম— আর অমনি হাতে পেলুম একটি রমণী, আর সে যে-সে রমণী নয়— একেবারে তিলোত্তমা। এ রকম ঘটনা বাঙালির জীবনে নিত্য ঘটে না, তাই আমরা এ গল্প এক বার পড়ি, দু বার পড়ি, তিন বার পড়ি— আর পড়েই যাব, যতদিন না কেউ এর চাইতেও বেশি অসম্ভব একটা গল্প লিখবে।

তা হলে তোমার মতে গল্পমাত্রই রূপকথা?

অবশ্য।

ও দুয়ের ভিতর কোনো প্রভেদ নেই?

একটা মস্ত প্রভেদ আছে। রূপকথার অসম্ভবকে আমরা ষোলোআনা অসম্ভব বলেই জানি, আর নভেল-নাটকের অসম্ভবকে আমরা সম্ভব বলে মানি।"

প্রমথ চৌধুরী বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনীর প্লটে নিজের বিশ্বাসের সমর্থন পেয়েছেন। সুতরাং বঙ্কিম-উপন্যাসের তথাকথিত বাস্তবতার অভাব সাহিত্য-রসবিচারের ক্ষেত্রে যেমন ধর্তব্যই নয়, প্রমথ চৌধুরীর গল্পের বিশেষ ধরনের ঘটনাবন্ধনে তথাকথিত বাস্তবতার অভাবও তেমনি মুখ্য বিবেচ্য নয়। তাঁর গল্পে অবশ্য বাঙালি জমিদার এবং ইঙ্গবঙ্গ সমাজের বাস্তবতা বর্তমান, তথাপি তাঁর মূল বক্তব্যের সঙ্গে বাঙালি সমাজের অবিচ্ছেদ্য যোগ নেই। সেইজন্য তিনি বিশ্বাস করেন গল্পের রস উপভোগে বাঙালির জাতীয় সংস্কার বাধা হওয়া উচিত নয়। ইংরেজ সমাজে যে-গল্প চলতে পারে বাঙালি সমাজেও তা চলতে পারে। তাঁর প্রথম যুগে লেখা 'চার-ইয়ারি কথা' 'নীললোহিত' এবং শেষ গল্প 'সত্য ও মিথ্যা'য় তিনি যে-সব পরিস্থিতি ও ঘটনা ব্যবহার করেছেন, সেগুলি বিচিত্র তো বটেই, বিশ্বাসকেও অতিক্রম করে যায়। তাঁর গল্পের

উপভোগ্যতা নির্ভর করে এই পরিস্থিতি-বৈচিত্র্যের উপর অনেকখানি, আর অনেকখানি নির্ভর করে গল্পের অন্তর্গত শ্রোতাদের দ্বারা পরিস্থিতি বিশ্লেষণে। কেননা, এই বিশ্লেষণে পাঠকদের কোনো নিশ্চিন্ত মীমাংসা মেলে না এবং এতেই গল্পের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

এই-সব পরিস্থিতি নাটকীয় হয়ে উঠতেই পারত, কিন্তু হয় নি, তার কারণ প্রমথ চৌধুরীর গল্পরচনার বিশিষ্ট রীতি। এ রীতিও নতুন। তাঁর প্রথম গল্প 'চারইয়ারি কথা'তে এ রীতিটির সাক্ষাৎ পাই এবং তার পর অল্পবিস্তর তাঁর অধিকাংশ গল্পেই তিনি এই রীতির অনুবর্তন করে গেছেন। তাঁর কাহিনীটি তিনি প্রত্যক্ষভাবে পাঠকের কাছে চরিত্র ও ঘটনা-সহযোগে উপস্থাপিত না করে, কোনো ব্যক্তির মুখ দিয়ে বিবরণের সাহায্যে বলিয়ে নেন। তাঁর গল্পের এই ভঙ্গিটি আর্ট হিসাবে অভিনব। প্রমথ চৌধুরীর গল্প মাত্রই যেন বন্ধুদের আলাপ মাত্র। কখনও সমবয়সী বন্ধুদের মজলিশি আলাপ, কখনও জমিদারবাবুর পারিষদ-ভাষণ। সেইজন্যই গল্পের মধ্যে নাটকীয় উদ্‌বেগের সঞ্চার হয় নি। কাহিনী ঘটে যাবার পর আলাপের সূত্রে বন্ধুদের মধ্যে বিবৃত হচ্ছে মাত্র। গল্পটি যথার্থত আরম্ভ হওয়ার আগে বন্ধুবর্গের আলাপে এর একটা উপযুক্ত পটভূমি গড়ে ওঠে, পাঠকেরা প্রস্তুত থাকে। তার পরেই গল্পটি বিবৃত হয় একজনের মুখে। রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণ'-এর গল্পরীতি খানিকটা এই রকম। কিন্তু ক্ষুধিত পাষাণের ভাষার যে মর্মরসৌধ গড়ে উঠেছে, বলা নিষ্প্রয়োজন, সেটা আমাদের প্রাত্যহিক বসবাসের উপযুক্ত নয়; কিন্তু তার স্বপ্ন ও বাস্তবের অনুপম মেশামেশি পাঠকের সব জিজ্ঞাসাকেই নিরস্ত করে। এ ভাষার অমৃতস্বাদ কে ঠেলে ফেলবে? প্রমথ চৌধুরীর ভাষা শুধু যে কথ্য তা নয়, প্রখর চলতি ভঙ্গিতে সম্পন্ন। অবশ্য এ চলতি মার্জিত শিক্ষিত সমাজের চলতি ভাষা— গ্রাম্যতার সম্পূর্ণ বিপরীত। ক্ষুধিত পাষাণের ভাষা আমাদের ভুলিয়ে দেয় পরিবেশকে, নিয়ে যায় স্বপ্নলোকে; প্রমথ চৌধুরীর ভাষা আমাদের পরিবেশ-সচেতন করে, প্রশ্নকে শাণিত করে। গল্পের অন্তর্ভুক্ত ঘটনা সম্বন্ধে কৌতূহলকে জাগ্রত করে— নির্বিচার আবেশে ঘুম পাড়িয়ে দেয় না। তাই গল্পটি শেষ হলে বন্ধুবর্গের মধ্যে গল্পটির বক্তব্য নিয়ে নানা জিজ্ঞাসা উত্থাপিত হয়। উপসংহারটি দিয়ে লেখক বস্তুত পাঠককেই সাহায্য করেন। সাহায্য করেন সন্তুষ্ট ও তৃপ্ত করতে নয়, বরং নানা ব্যাখ্যার সম্ভাবনা দেখিয়ে গল্পের রস-উপলব্ধিতে সৃষ্টি করেন এক ব্যাকুলতা। তিনি গল্পও লেখেন ক্রিটিকের মন নিয়ে।

বলবার এই কায়দাই প্রমথ চৌধুরীর গল্পের প্রাণ। গল্পের সার্থকতা কোথায়? বাস্তবতায়? সংহতিতে? না সংকেতে? গল্প বস্তুত শোনা এবং শোনানোর বস্তু। এটাই গল্পের আদি লক্ষণ। এ বিষয়ে বাগ্‌বাহুল্য অনাবশ্যক। প্রমথ চৌধুরী সাহিত্যের এই শ্রেণীটির প্রকৃতি অভ্রান্তরূপে বুঝেছিলেন। ফলে তাঁর গল্প হয়েছে বচনশিল্প। উজ্জ্বল দীপ্ত শাণিত বর্ণনা, ভাষায় যেমন তীক্ষ্ণতা, ভঙ্গিতে তেমনি ঋজুতা। বর্ণনার মধ্যে মিশে থাকে সূক্ষ্মতা। কাহিনী অতীতচারণ-মূলক বলে কথকের মনের বিস্ময় বা আবেগ তত থাকে না। সে আবেগ যেন অনেকটাই অনুচিন্তায় থিতিয়ে এসেছে। তথাপি ভাষার গুণে এবং বিবরণের খুঁটিনাটিতে তিনি পাঠকের চোখের সামনে নতুন করে ফুটিয়ে তুলতে পারেন কাহিনীটিকে। এ দিক থেকে দেখলে প্রমথ চৌধুরীর গল্পগুলি একেবারে খাঁটি গল্প। একজন বক্তা শুনিয়ে যাচ্ছেন, তাঁর নিজস্ব ভঙ্গি দিয়ে বিবরণটিকে জীবন্ত করে তুলছেন কোনো নাটকীয়তা বা আবেগে-উচ্ছ্বাসের আশ্রয় না নিয়ে; শুধু বর্ণনাতেই পাঠকের আগ্রহকে জাগিয়ে রাখা— এটাই খাঁটি গল্পের আদর্শ হওয়া উচিত। অর্থাৎ এই গল্পের একটি প্রধান আকর্ষণ হলেন বক্তা স্বয়ং। তাঁর ব্যক্তিত্বই জড়িয়ে আছে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত।

প্রমথ চৌধুরীর এই মেজাজটিই তাঁর গল্পকে করে স্বাদু। ব্যঙ্গে পরিহাসে নির্বিকার উপস্থাপনায় আবার বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্যে ভাষার বিদ্যুৎশিখায় গল্পটি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তাঁর ভাষার মধ্যে একটি মাত্রই আবেগ আছে, তা হচ্ছে তাঁর রূপের আবেগ। তিনি বরাবর রূপের ভক্ত। তাঁর নায়িকারা সকলেই রূপবতী, কিন্তু সে রূপ বর্ণনা করতে গিয়েও আবেগে অন্ধ হবার ব্যক্তি তিনি নন। তাঁর গল্পের নায়করা বুদ্ধিমান চতুর প্রেমবিহ্বল নির্বোধ কঠিন নির্দয় নানা রকমেই হয় কিন্তু নায়কদের সেই বৈশিষ্ট্য লেখকের চিত্তচেতনাকে অধিকার করে না। সে ক্ষেত্রে তাঁর নির্লিপ্ততা এবং জাগ্রত সমালোচনাবৃত্তি অব্যাহত। এইজন্যেই বোধ হয় প্রমথ চৌধুরীর গল্পে আগাগোড়াই একটি ব্যঙ্গের আভাস স্ফুরিত। প্রমথ চৌধুরীর এই মেজাজ আমরা আর-একজন অসাধারণ গল্পকারের মধ্যে পাই— তিনি রাজশেখর বসু।

বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৫।

কবি অতুলপ্রসাদ সেন

বঙ্গবাণীর চরণে অতুলপ্রসাদের অর্ঘ্য একটিই। গীতিকুঞ্জে সংকলিত হয়েছে তাঁর গানগুলি। এই গানগুলিতে অতুলপ্রসাদের অন্তরের চেহারা ফুটেছে বলেই এই গান শুধু সুরের বাহন হিসাবেই সার্থক নয়, কবিতা বলেও তার পরিপূর্ণতা। কোনো পাঠক যদি দৈবক্রমে না-ও জানতেন যে অতুল-প্রসাদ ছিলেন সুরকার, তবু এই কবিতা পড়েও তিনি তার রস পেতেন; বাংলা কবিতার জগতে তার নিজস্ব আসনটি অবশ্যই লক্ষ্য করতে ভুলতেন না। অতুলপ্রসাদের এই গানগুলি কবিতার মতোই বক্তব্যগভীর, ব্যঞ্জনামণ্ডিত, হৃদয়তাপে তপ্ত। এই তাপ যেমন আসে সুরের আগুন থেকে, তেমনি আসে কথার আবেগ থেকে। বাঙালি কবিদের মধ্যে সেদিক দিয়েও অতুলপ্রসাদের স্থান নিঃসন্দিগ্ধ।

কবিতা লিখব বলে তিনি লিখতে বসেন নি। বাংলা কবিতাধারার অনুসরণ করে চলবার বাধ্যতা তাঁর ছিল না। কবিতা লিখতে কিছু সচেতনতা কবিকে রক্ষা করেই চলতে হয়। বক্তব্য স্থির করে দিতে হয়, সে-বক্তব্য পাঠকগ্রাহ্য কিনা সেটা না ভাবলেও চলে না; কবিতার রূপরীতির যে প্রথা দাঁড়িয়ে গিয়েছে, সে-প্রথাকে মেনে চলার দায়িত্ববোধ থাকে। গান রচনা করতে গিয়ে কবিতার নির্মাণ-পদ্ধতি অনুসরণ করার খুব প্রয়োজন নেই। মধুসূদন-হেমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথ যেভাবে ছন্দোবদ্ধ বক্তব্যকে উপস্থাপিত করেছেন এবং যাঁর অনুসরণে বাংলা কাব্যধারা গড়ে উঠেছে, অতুলপ্রসাদের রচনাকে সে-ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত করে দেখলে চলবে না। অতুলপ্রসাদ গান রচনায় অন্য আর-এক রীতির অনুবর্তন করে এসেছেন। বাঙালির গান রচনার দীর্ঘ ইতিহাস আছে। বৈষ্ণব পদাবলীতে, বাউলের গানে, রামপ্রসাদী সঙ্গীতে সেই কাব্য-ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে। এদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব সুর আছে সত্য, কিন্তু সুর ছাড়াও কথা এবং অর্থগৌরবের আর-একটি সমৃদ্ধ সম্পদ আছে। তারও একটা নিজস্ব আদর্শ আছে। যে-ভাবনা আত্মহারা উচ্ছ্বাসের উপযোগী তাকেই কথার রূপে সাজিয়ে দিতে হয়। তাতে আনতে হয় চিত্রকল্প আকুল পরিবেশ, কথার ইঙ্গিত। বাঙালির পূর্বতন সাহিত্য গানের সুরেই গড়ে উঠেছে, তবে কাব্যসম্পদের দিকটিকে কোনো দিক দিয়েই হেয় করা যায় না। বরং

এ কথা বলা যায় যে বাংলার নিজস্ব সুর নির্দিষ্ট, তাতে বিস্তারের সুযোগ তেমন নেই। কিন্তু কথার বৈচিত্র্য সেই সুরকেও আবেগময় করে তোলে। কথার ভাবব্যঞ্জনা সুরের ব্যঞ্জনার সঙ্গে মিশে বাঙালির চিত্তকে একটা বিশিষ্ট রসের আস্বাদনে পৌঁছে দেয়।

সুরের থেকে বিচ্ছিন্ন করে যদি কাব্য-সম্পদকে দেখি, তাহলে এর ঐশ্বর্য আমাদের আকৃষ্ট করবেই। ধর্ম ও প্রেম— এই দুই বস্তুই ছিল আমাদের পুরানো গানের প্রধান উপজীব্য। ধর্মের নানা রীতি আছে। বৈষ্ণব, শাক্ত, বাউল— নানা রকমের গান আছে আমাদের পুরানো বাংলার ভাণ্ডারে। তেমনি আছে লৌকিক প্রেমের গান। প্রেমিক প্রেমিকার মান, অভিমান, মিলনের আনন্দ ও বিরহের বেদনা নিয়ে গড়ে উঠেছে বাংলা গানের এক দীর্ঘ ঐতিহ্য। এই বিষয়টি চিরন্তন। তাই এর আবেদনও অম্লান। আধুনিক কালেও প্রাচীন প্রেমের গানের আকর্ষকতা অক্ষুণ্ণ। এমন কি রবীন্দ্রনাথের গান অনেক সময় অনুরণন তোলে পুরানো গানের। রবীন্দ্রনাথের মতো দুর্লভ কাব্যশিল্পীর হাতে প্রেমের প্রকাশভঙ্গিমা স্বভাবতই হয়েছে মনোহর এবং সূক্ষ্মতর কিন্তু মানবমনের সেই চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা বাংলার সাহিত্যে অব্যাহত ভাবেই চিরজীবী।

একালের দিনে সাহিত্যে যেমন বহু বৈচিত্র্য এসেছে, গানের বিষয়বস্তুতে তেমনি এসেছে অনেক রকমের বৈচিত্র্য। রবীন্দ্রনাথের গানকে প্রধানত ভাগ করা হয়েছে পূজা, প্রেম, প্রকৃতি, স্বদেশ এবং বিচিত্রে। এই শেষের তিনটি ভাগই আধুনিক। প্রকৃতি-চেতনা এ-কালের মুগ্ধতারই কাব্যিক প্রকাশ, তেমনি স্বদেশ-চেতনাও একটি নতুন আবেগের অভিব্যক্তি। 'বিচিত্র'-অংশে রবীন্দ্রনাথ ধরে দিয়েছেন স্পর্শ-কাতর মনের জীবনচেতনাকে, অসংখ্য মুহূর্ত, অসংখ্য উপলক্ষ, পলায়নপর অগণিত অনুভূতিকে। এই বৈচিত্র্য আমাদের পুরানো বাংলা গানে ছিল না।

বলাবাহুল্য শিল্পের অভিব্যক্তিতে বিষয়বস্তু নিশ্চয়ই বড়ো কিছু নয়। বিশেষত গানের মত সূক্ষ্ম শিল্পে বিষয়কেও স্বচ্ছ করে তোলে রচয়িতার মন্ময়তা। প্রেম হোক, পূজা হোক, স্বদেশ হোক, প্রকৃতি হোক— সব কিছুর মধ্যে একটি নিবিড় আত্মমগ্নতা বিষয়ের স্থূলতাকে বিস্মৃত করে দেয়। আমরা রচয়িতার মগ্ন অনুভূতির পরিচয় পাই। এই অনুভূতিটিই বস্তুত সুরের নির্দিষ্ট প্যাটার্নের মধ্যে অনির্দেশ্যের ব্যঞ্জনা নিয়ে আসে। গানের ওপারে যিনি দাঁড়িয়ে থাকেন,

তাঁকে সুর দিয়েই ছোঁয়া যায়। কারণ সুর তখন রচয়িতার অনুভূতিরই প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। এ কথা বলার তাৎপর্য আছে। সাম্প্রতিক কালে 'আধুনিক গান' বলতে যা শুনতে পাই, আমার তো মনে হয়, তাতে বিষয়ের বৈচিত্র্যের সীমা নেই বটে, কিন্তু তাতে রচয়িতার সেই মন্ময় অনুভূতির আভাস-মাত্র নেই। তাতে 'জীবনের ছায়া' আছে, বক্তব্য বড়ো উচ্চণ্ড হয়ে শোনা যায় তাতে। কিন্তু ব্যক্তিগত নিভৃত চেতনার বিগলিত রসসিদ্ধি নেই। গানে যদি সেই আত্মবিগলন না থাকে, তবে সে কিছুতেই সার্থক হয় না। রামপ্রসাদের গানে যেমন বাউলের গানে তেমনি, নিধুবাবুর প্রেমের গানে এবং পদাবলীর কীর্তনে তেমনি বিষয় এবং বক্তব্যকে অভিসিঞ্চিত করে দেয় রচয়িতার আত্ম-মুখরতা। গায়ক সুর দিয়ে তাকেই ফুটিয়ে তোলেন, বক্তব্যকেও নয়, বিষয়কেও নয়।

অতুলপ্রসাদের গানে এই লিরিক সুরটাই তাঁর সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য। এই আত্মমুখী লিরিসিজ্‌মের দিক থেকে অতুলপ্রসাদের সবচেয়ে বড়ো মিল সম্ভবত রামপ্রসাদের সঙ্গে। রামপ্রসাদের গানের মাধুর্য আমরা উপভোগ করি শুধু ঈশ্বরানুভূতির জন্যই নয়। রামপ্রসাদের গানে রামপ্রসাদকে যেমন করে পাই, আর-কোনো গীতিকারের গানে রচয়িতাকে তেমন করে পাই না। এই ছোট ছোট গানগুলির ভিতর দিয়ে আমরা একটি ব্যক্তিত্বকে দেখতে পাই— সংসার-উদাসীন, আত্মভোলা, অভিমানী, দারিদ্র্যবিদ্ধ মানুষটির কণ্ঠে বেদনাকে গানে রূপান্তরিত করে তোলার করুণ প্রয়াস। রামপ্রসাদের আরও অন্যান্য গানও আছে। কিন্তু 'ভক্তের আকৃতি' নামে শ্রেণীবদ্ধ গানগুলিতে রামপ্রসাদের ব্যক্তি-রূপ বড়ো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এমন স্পষ্ট হয়ে ওঠার কারণ প্রখর আত্মময়তা। সেকালের আর-কোনো গানেই নিজেকে উল্লেখ করে 'আমি'কে বারবার গানের মধ্যে তুলে ধরার বৈশিষ্ট্য নেই। রামপ্রসাদ যখন বলেন—

মা গো তারা ও শঙ্করি,
কোন অধিকারে আমার পরে করলে দুঃখের ডিক্রী জারি ?

তখন গানের মধ্যে একটি নিবিড় ব্যক্তিগত সুরের স্পর্শ পাই। 'আমার পরে' কথাটিই ফুটিয়ে তুলেছে এই নিবিড়তাকে।

অতুলপ্রসাদের গানের মধ্যে এমনি করেই একটি নিঃসঙ্গ ব্যক্তিকে পাই। সত্যই নিঃসঙ্গ, জীবনের দিক দিয়ে অবশ্য নয়। কিন্তু গানে এমন নিঃসঙ্গ অথচ আকুল মর্মস্পর্শিতা আর দেখা যায় না। তাঁর গানগুলির মধ্যে একটি

ঐক্যসূত্রেও আমরা লক্ষ্য করতে পারি। প্রতি গান স্বয়ংসম্পূর্ণ অবশ্যই। কিন্তু বিশেষ করে 'প্রকৃতি' 'মানব' এবং 'দেবতা' পর্যায়ের গানগুলিতে একই ব্যক্তিচিত্তের ছবি ফুটে উঠেছে। সেজন্যই এগুলি একটি ঐক্যসূত্রে বিধৃত। দেবতা-পর্যায়ের একটি গান—

আমার এ আঁধারে
এমন করে চালায় কে গো?
আমি দেখতে নারি, ধরতে নারি,
বুঝতে নারি কিছুই যে গো।

আবার মানব পর্যায়ের গান—

কে আবার বাজায় বাঁশি এ ভাঙা কুঞ্জবনে
হৃদি মোর উঠল কাঁপি চরণের সেই রণনে।

এই দুয়েতেই লেখকের ব্যক্তিগত স্বর অত্যন্ত গভীর। দুয়েতেই দুঃখদীর্ণ বিষণ্ণ কণ্ঠস্বর। অতুলপ্রসাদের সম্বন্ধে সকলেই একবাক্যে বলেছেন তাঁর গান বিষাদ-ব্যঞ্জিত। এই বিষণ্ণতা অতুলপ্রসাদের গানে প্রতিফলিত ব্যক্তিত্বের একটি বৈশিষ্ট্য।

বস্তুত অতুলপ্রসাদের গানে বিষয়ের বৈচিত্র্য নেই। গীতিগুচ্ছে তাঁর গানকে ভাগ করা হয়েছে, 'দেবতা' 'প্রকৃতি' 'স্বদেশ' 'মানব' এবং 'বিবিধ'— এই কয়টি ভাগে। এর প্রতিটি বিষয়ের গানই আমাদের কাছে সুপরিচিত। কিন্তু যে-কোন শ্রেণীর মধ্যেই অসংখ্য মেজাজ-মুহূর্ত ও অনুভূতির বৈচিত্র্যের সম্ভাবনা আছে। শ্রেণীভাগ জিনিসটা আসলে অত্যন্ত স্থূল। উপলব্ধির এক-একটি মুহূর্তই অসামান্য— সামান্য চিহ্নে চিহ্নিত করে একটি শ্রেণীর মধ্যে ফেলা বিষয়-অনুসারে সম্ভব হলেও অনুভূতি-অনুসারে সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথের গানেরও শ্রেণীবিভাগ আছে, কিন্তু কবিতা-সৃষ্টি হিসাবে প্রতি রচনাই অনুপম অনুভূতি-সম্পন্ন। এজন্য তাঁর গান সংখ্যায় অগণিত বলেই মনের অগণিত লীলারূপকে ধরে দিতে পেরেছে। অতুলপ্রসাদের ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় গান চুয়ান্নটি, প্রকৃতি-সম্বন্ধীয় গান সতেরটি, স্বদেশ-সম্বন্ধীয় গান তেরোটি, মানব (বা প্রেম)-সম্বন্ধীয় গান বাহান্নটি এবং বিবিধ একান্নটি। এদের মধ্যে স্বদেশ-বিষয়ক গানগুলি ছাড়া আর-সবই বলতে গেলে দ্বৈতবোধ থেকেই রচিত। কবি নিজের হৃদয়ের অপার অনুভূতিকে নিবেদন করে দিয়েছেন বঁধু, ঈশ্বর অথবা কোন সমব্যথীকে। বিষয় ও বক্তব্য হিসাবে গানের মধ্যে চমৎকারিত্ব তেমন

হয়তো পাব না, কেন না লিরিকের ধর্ম বক্তব্যের মধ্যে নেই, আছে লেখক-চিত্তের প্রগাঢ় সংবেদনশীলতায়। বেদনাময় অনুভূতির গাঢ়তার দিক দিয়েই অতুলপ্রসাদের কবিতা বিচার্য।

আজকাল ঈশ্বর বা দেশ-সম্বন্ধীয় কবিতাকে অনেকে কাব্যসৃষ্টি হিসাবে উচ্চ স্থান দিতে দ্বিধাগ্রস্ত হন। দেশ-সম্বন্ধীয় কবিতায় বক্তব্য বিষয়টাই বড়ো। রসসৃষ্টির চেয়ে শ্রোতার অন্তরের ব্যবহারিক ভাবের উদ্দীপনই প্রধান লক্ষ্য বলে এ-কবিতার উৎকর্ষ বিষয়ে অনেকেই সন্দিহান যদিও প্রয়োজনীয়তার দিক দিয়ে বলবার কিছু থাকে না। অনুরূপ ভাবে ঈশ্বর-বিষয়ক কবিতাতেও কবি প্রথাকেই অনুবর্তন করে থাকেন এবং সেজন্য তাতেও ব্যক্তি-হৃদয়ের একান্ত জীবনরসরসিকতা ফুটে ওঠে না। আধুনিক কালে উৎকৃষ্ট গীতিকবিতা কবির একান্ত অনুভূতিরই রসরূপ, সে-অনুভূতি আমাদের এই জীবনের দুঃখবেদনা, আশা-আনন্দের পারিপার্শ্বিকতা থেকেই জন্মায়। বলা বাহুল্য, এ সব অভিমতকে চূড়ান্ত বলে ভাববার কারণ নেই। অতুলপ্রসাদের ভক্তিমূলক এবং দেশাত্মবোধক গানই এই অভিমতকে নিরস্ত করে। কোনো একটা তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করবার জন্য অতুলপ্রসাদকে অবলম্বন করারও দরকার নেই। ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় গান কতখানি আবেগ-গাঢ় হতে পারে, কত আন্তরিক এবং একান্ত হয়ে উঠতে পারে অন্তত রামপ্রসাদের গানে তার প্রচুর প্রমাণ নিহিত। রামপ্রসাদের সঙ্গে অতুলপ্রসাদের ভাষা বা ভঙ্গিগত মিল নেই। তবু অতুলপ্রসাদের ভক্তিমূলক গান পড়লে রামপ্রসাদকে মনে পড়ে। দুজনের মধ্যে মিলের সূত্র হচ্ছে দুটি, বিষাদঘন মন্ময়তা এবং একান্ত নির্ভরশীলতা। অতুলপ্রসাদের ভক্তিমূলক গান রামপ্রসাদের মতোই বিষাদে ভরা। জীবনের অতুল বৈভব, অজস্র সম্পদের মধ্যেও কবিহৃদয় সেই পরম পাওয়ার স্বপ্নেই ব্যাকুল। ব্যক্তিগত জীবনে রামপ্রসাদ ছিলেন দরিদ্র। তাঁর বিষাদকে কেউ ব্যাখ্যা করেছেন ব্যক্তিগত দারিদ্র্যদুঃখসঞ্জাত বলে। কিন্তু এরকম ব্যাখ্যায় তাঁকে ছোটো করা হয়, না বড়ো করা হয়— সেটা নিঃসংশয়ে বলা যায় না। তাঁর ঈশ্বরনির্ভরতা এবং ভগবৎবিরহ সাধকোচিত মগ্নতারই ফল, বাস্তবজীবনে ব্যর্থতার থেকে পালিয়ে দুঃখভোলার ব্রত নয়। অতুলপ্রসাদের আর্থিক প্রাচুর্যের সীমা ছিল না, খ্যাতি-প্রতিপত্তি ছিল সর্বজনমান্য। শোনা যায়, পারিবারিক জীবন সম্পূর্ণ শান্তিময় ছিল না। তাঁর ভক্তিমূলক গানের মর্মস্পর্শী আবেদন কাব্যসাফল্যের স্বরূপচিন্তায় অনুপ্রেরিত করে। অতুলপ্রসাদের

এই গান ভগবৎ-সাধনার অঙ্গ হিসাবে বিচার্য নয়, কাব্যরসসৃষ্টি হিসাবেই বিচার্য। যথার্থ বড়ো কবির মতোই তিনি ভাবানুভূতিকে ব্যবহারিক উপলক্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রসে পরিণত করতে পারতেন। সেখানেই তিনি কবি। একটি গানে তিনি ব্যাকুলভাবে বলেছেন—

সংসারে যদি নাহি পাই সাড়া
তুমি তো আমার রহিবে!
বহিবারে যদি নাহি পারি এ ভার,
তুমি তো বন্ধু, বহিবে।

এ যেন মনে হয় জীবনের থেকে আঘাত পেয়ে প্রতিহত কবি ঈশ্বরকেই আঁকড়ে ধরেছেন। এ-আঘাত কী সে-কল্পনার কোনো দরকার নেই। বৈষ্ণবের মতো ঈশ্বরকে তিনি বন্ধুরূপে আশ্রয় করেছেন— এই সখ্যরসই এই গানের রস। আবার বৈষ্ণব সাধক যেমন রূপকলীলারচনা দ্বারা দুঃখসাধনার ছবি ফুটিয়েছেন—

কণ্টক গাড়ি কমলসম পদতল মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি ঢারি করু পীছল চলতহি অঙ্গুলি চাপি॥

অতুলপ্রসাদ রূপকের আশ্রয় না নিয়ে তেমনই এই দুঃখলব্ধ পূর্ণতার আকাঙ্ক্ষা জানিয়েছেন—

দুঃখেরে আমি ডরিব না আর,
কণ্টক হোক কণ্ঠের হার;
জানি তুমি মোরে করিবে অমল
যতই অনলে দহিবে।

বৈষ্ণবভক্তিসাধনার মাত্র দুটি রসই অতুলপ্রসাদের গানে নবরূপ লাভ করেছে, দাস্য এবং সখ্য। কবিহৃদয়ের বেদনা, আর্তি নির্ভরশীলতা সবই এই দুই রসেই ফুটে উঠেছে! কবির ঈশ্বর কবির কাছে পরিচিত সহৃদয় বন্ধুর মতো, উদার প্রভুর মতো। তিনি কখনও দুঃখ দেন, কখনও বিচ্ছেদের অভিনয় করেন, কিন্তু অন্তিম আশ্রয়ে কবির বিশ্বাস অবিচল। জীবনে, প্রকৃতিতে সৌন্দর্যের সমারোহ, বর্ণের উজ্জ্বল বৈভব, ঋতুর আলপনা, বাতাসের কানাকানি, জ্যোৎস্নার ধূসরিমা, পাখির কলগুঞ্জন কবিকে বারবার ঈশ্বরের পরম আনন্দরূপেরই ঈশারা দিয়ে এসেছে। কিন্তু যে-পাওয়া অনায়াসে পাওয়া, যার জন্যে তপস্যা করতে হয় নি, সে-পাওয়া সম্পূর্ণ নিজের হয়ে ওঠে না। হৃদয়-

রসরক্তকে বিদীর্ণ করে যে-প্রাপ্তি তাই যথার্থ আপনার। এ জন্যই অতুল-, প্রসাদের ভগবান বন্ধু হয়েও নানা দুঃখের মধ্যে দিয়ে তবেই নিজের সান্নিধ্যে টেনে নেন। বেদনার আঘাতেও কবি বন্ধুর পরম বন্ধুতায় বিশ্বাস হারান নি, এটাই তাঁর চরিত্র-মহিমা।

এই বিষাদসুরই অতুলপ্রসাদের প্রায় সব শ্রেণীর গানের বৈশিষ্ট্য। তাঁর প্রেমের গানেও মিলন আর বিরহ, আনন্দ আর বিষাদের মেশামেশি। বস্তুত প্রেমের গান আর ঈশ্বর-ভাবমূলক গানে সে-রকম ভেদরেখা টানাও যায় না। অনেক প্রেমের গানকেই দেবতাবিষয়ক মনে হতে বাধা নেই। সেই বিরহ এবং প্রতীক্ষা, সেই অস্পষ্ট চরণধ্বনি, দূরশ্রুত বাঁশি, সেই উন্মুখ আকুলতা— অতুলপ্রসাদের প্রেমবিষয়ক গানগুলিতেও বেদনারই করুণ মাধুর্য—

একা মোর গানের তরী ভাসিয়েছিলাম নয়ন-জলে ;
সহসা কে এলে গো এ তরী বাইবে বলে ?
যা ছিল কল্পমায়া সে কি আজ ধরল কায়া ?
কে আমার বিফল মালা পরিয়ে দিল তোমার গলে ?

অতুলপ্রসাদের প্রেমের গানে নেই আবেগের দীপ্ত জ্বালা, কিংবা প্রেমিকার প্রতি অনুরাগের নানা বিচিত্র স্বত-উদ্ভাসিত মুহূর্ত। তাঁর রচনা শুচিতায় শুভ্র। মনে হয় যেন ও-প্রেম একেবারেই দেহচেতনামুক্ত। এক সময়ে শোনা যেত, রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতাও সংস্কারমুক্ত দেহাতীত, তাতে কামনার কালিমা নেই। ব্রাউনিঙের সেই আবেগ out of all your life give me but a moment— সেই ক্ষুধিত দেহময় প্রেমের আর্তি রবীন্দ্রনাথে নেই। রবীন্দ্রনাথ দেহকে আদর্শায়িত করেছেন। তাকে দেহসীমা থেকে মুক্তি দিয়ে প্রভাতের অরুণ-আভাসে, আকাশের নিরবয়ব সীমায় কিংবা চামেলির লাবণ্যবিলাসে মিলিয়ে দিয়েছেন। হয় তো একথা সত্য। তবু 'যামিনী না যেতে জাগালে না কেন, বেলা হল মরি লাজে' 'অলকে কুসুম না দিয়ো' 'আমার প্রাণের মাঝে সুধা আছে' 'না চাহিলে যারে পাওয়া যায়' 'আজি যে রজনী যায় ফিরাইব তায় কেমনে' ইত্যাদি অজস্র গানে কবি দেহজীবনের আকুল আকাঙ্ক্ষাকে ভাষা দিয়েছেন। অতুলপ্রসাদের গানে প্রেমের নিত্যনবীনতা, তার নব নব উপলব্ধি, প্রিয়-হৃদয়ের অনন্ত বিস্ময়কে আবিষ্কার নেই। সেদিক থেকে তাঁর প্রেম একটি অতন্দ্র অনুভবরসেই নিমগ্ন। এও যেন দয়িতের জন্য তপস্যা, সাধকের তপস্যা যেমন দেবতার জন্য—

কে আবার বাজায় বাঁশি এ ভাঙা কুঞ্জবনে !
হৃদি মোর উঠল কাঁপি চরণের সেই রণনে।

এই অদৃশ্য উপস্থিতি অথবা অন্তহীন প্রতীক্ষা তাঁর প্রেমের গানের সুর। তাঁর প্রেমাস্পদকে শরীরী বলেই যেন মনে হয় না। গাছের পাতার মর্মরধ্বনিতে প্রভাতের ম্লান আলোকস্পর্শে, তার আভাসটুকু ফুটে ওঠে। পুষ্পের অঙ্গে লগ্ন শিশিরবিন্দুতে তার চোখের আলো। আমাদের এই বাংলা দেশের নানা খণ্ড জীবনচিত্র অরূপ উপলব্ধির রূপক হয়ে রবীন্দ্রনাথকে যেমন ভাবাবিষ্ট করে অতুলপ্রসাদের গানের ভাষাতেও তারই চিহ্ন দেখতে পাই। নদীকূল, ভাঙা দেউল, মালা-গাঁথা, বদ্ধ দুয়ার, বর্ষার রাত, ঝড়ের বাতাস,—এরা অতুল-প্রসাদের কল্পনার রূপক হয়ে দেখা দিয়েছে তাঁর গানে। এই সব প্রতীক অতুলপ্রসাদের প্রেম-কল্পনাকে কোমল ব্যঞ্জনায় ভরে দিয়েছে। তাঁর প্রেম রসরমণীয়। অনুভূতিতেই তার সার্থকতা। মিলনের গানও আছে —

এসো প্রথম প্রেমে লজ্জিতা
এসো নবীন সরমে সজ্জিতা
এসো নবীন হরষে সজ্জিতা
এসো নবীনচন্দ্রভালিকা।

কিন্তু এ আবাহনে বিদ্যাপতির পদ 'আজু কোকিল লাখ ডাকউ লাখ উদয় করু চন্দা'র কূলপ্লাবী আবেগবন্যায় দিক্‌দিগন্ত একাকার হয়ে যায় নি। একটি স্নিগ্ধ শুচিতা একটি সসম্ভ্রম দূরত্ব রক্ষা করে প্রেমকে রসে আস্বাদ্য করেই রেখেছে। অতুলপ্রসাদের প্রেমের গান সম্বন্ধে এ কথা বলা যায়, তাতে প্রেম আছে, প্রেমিকা নেই।

অতুলপ্রসাদের নিঃসঙ্গ আত্মকেন্দ্রিকতা বিষাদে অবসিত না থেকে এক ভিন্নতর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। তিনি হৃদয়গুহা থেকে বেরিয়ে আসতেই চেয়েছেন বৃহৎ জীবনে, উদার মানবলোকে। এই বেদনাতুর কবি বেদনাকে ভুলতে চেয়েছেন। মানুষ মাত্রেরই নিজস্ব অন্তর্জীবন থাকে। সে জীবনের সুখদুঃখ তার একান্ত আপন এবং গোপন। সে তার সম্পদও বটে। কিন্তু এই গোপন ব্যথা যদি তাকে জীবন-উদাসীন করে তবে তাকে বরণ করতে হয় শূন্যতাকে। অতুলপ্রসাদকে কিন্তু শূন্যতা স্পর্শও করতে পারে নি। যতই তিনি বেদনার্ত হয়েছেন ততই যেন মানুষের জীবনে সংসারের কোলাহলেই তিনি আসতে চেয়েছেন —

মিছে তোর সুখের ডালি, মিছে তোর দুখের কালি ;
দুদিনের কান্নাহাসি, ছল ছল ছল, রে ভোলা।
জীবনের হাটে আসি বাজা তুই বাজা বাঁশি,
থাক-না সেথা বেচাকেনার দারুণ কোলাহল, রে ভোলা।

কিংবা—

ভোল রে ভোলা ভোল,
ভুলে যা কাঁটার ব্যথা,
ফুলগুলি তুই ভোল।

এইসব গানে প্রকাশ পেয়েছে একটি বলিষ্ঠ জীবনপ্রেম। তাতে নীতির সুর আছে সত্য, কিন্তু আবেগটাই প্রধান। এই জীবনপ্রেমের বশেই তিনি সবাইকে ডেকেছেন বিশ্বপ্রেমে উদ্বোধিত হতে, ব্যক্তিসুখ ভুলে গিয়ে নিজেকে বৃহৎ কর্তব্যে নিয়োজিত করতে। তাঁর এই শ্রেণীর গান—

করি তুই আপন আপন
হারালি যা ছিল আপন
এবার তোর ভরা আপন
বিলিয়ে দে তুই যারে তারে।

আত্মময়তার অসহনীয়তাতেই লেখা। এতেই অতুলপ্রসাদের গানে প্রকাশ পেয়েছে উচ্চ নৈতিক আদর্শ।

অতুলপ্রসাদের দেশাত্মবোধক গানকেও এই সূত্রেই বিচার করা উচিত। দেশাত্মবোধক গানে অতুলপ্রসাদের আসন বাংলা সাহিত্যের মুখ্য রচয়িতাদের সঙ্গেই। কোনো কোনো সময়ে বিস্ময় বোধ করি যিনি সূক্ষ্ম ভাবসংবেদনের আত্মমগ্ন কবি, তিনিই আবার কি করে দেশ-সচেতন জাতি-সচেতন চারণ-কবি হয়ে উঠলেন। অতুলপ্রসাদের কাব্যরচনার সঙ্গে সমগ্রভাবে পরিচয় থাকলে এটা বিস্ময়কর মনে হবে না। অতুলপ্রসাদের ব্যক্তিত্বের মধ্যেই উদার গ্রহিষ্ণুতা ছিল। সমাজ, জীবন, মানুষ সম্বন্ধে ছিল অপরিসীম ঔৎসুক্য এবং কল্যাণাদর্শ। গানের মন্ময়ভূমিতে তিনি নিজেকে বন্দী করে রাখেন নি ; বরং মানুষের সঙ্গে মিশবার জন্য জাতির জন্য দেশের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দেবার আকাঙ্ক্ষা ছিল প্রবল। হয়তো এভাবেই ভাববন্দী কবিচিত্ত খুঁজেছে মুক্তি।

তাঁর দেশাত্মবোধক গানের বৈশিষ্ট্য আছে। তাঁর গানে মিলন ঘটেছে উনিশ শতকীয় আদর্শ এবং রবীন্দ্রযুগের আদর্শের। সেকালে বাংলা সাহিত্যে

দেশাত্মবোধের যে জোয়ার এসেছিল, তার মূল উৎসটা ছিল অতীত-গৌরব চেতনায়। হেমচন্দ্র প্রভৃতি কবিরা তাঁদের 'ভারতসঙ্গীত' 'ভারতবিলাপ' প্রভৃতি কবিতায় দেশের অতীতগৌরব স্মৃতিকে জাগিয়ে তুলে অনুপ্রেরণা আনতে চেয়েছেন ; প্রাচীন ভারতবর্ষের কীর্তি-কাহিনীকে স্মরণ করে বর্তমান পতিত দীন অবস্থার প্রতিকার করবার জন্য উদ্যোগী হতে বলেছেন। এসব গানের বৈশিষ্ট্য অতীতচারিতা। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর-রচিত 'গাও ভারতের জয়' প্রভৃতি গান সেকালের দেশচেতনার বিশিষ্ট আবেগময় অভিব্যক্তি। আবার বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' দেশের ঐশ্বর্যময় রূপের প্রকাশ, রৌদ্ররসের গান। সরলাদেবীর 'নমো হিন্দুস্থান' গানটিতেও সেই তীব্র ওজস্বিতাই প্রকাশিত। এই গানটির মর্মবাণী অবশ্য ঐক্যচেতনায়। কিন্তু অতীত গৌরববাহিনী দেশরূপ অতুলপ্রসাদের দেশাত্মবোধক গানেরও মর্মে বিরাজিত—

ভোলে নি ভারত, ভোলে নি সে কথা,
অহিংসার বাণী উঠেছিল হেথা ;
নানক নিমাই করেছিল ভাই
সকল ভারত-নন্দনে।

সেকালের মতোই কবি বর্তমান কালের দৈন্য, অনৈক্য, পতিত অবস্থার জন্য বেদনার্ত হয়ে স্বপ্নোজ্জ্বল অতীতের পুনঃ প্রত্যাবর্তন প্রার্থনা করেছেন—

উঠ গো ভারতলক্ষ্মী উঠ আদি জগতজনপূজ্যা
দুঃখ দৈন্য সব নাশি করো দূরিত ভারত-লজ্জা।

বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের সময় থেকে আমাদের দেশচেতনার মোড় ফিরল। অতীতের স্বপ্নে মগ্ন হয়ে থাকা নয়, দেশকে বর্তমানের মধ্যে খুঁজে নিতে হবে। দুঃখ-দীনতার মধ্যেই দেশের রূপ সত্য হয়ে উঠছে। এর জন্য লজ্জা নয়, বর্তমানের মধ্যেই বাস্তব দেশের জন্য গভীর মমতা ফুটে উঠল স্বদেশী যুগের গানে। রবীন্দ্রনাথের গানে, রজনীকান্তের গানে যেমন, অতুলপ্রসাদের গানেও তেমনি একটি গাঢ় সপ্রেম কণ্ঠস্বর—

কী জাদু বাংলা গানে
গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে।
এমন কোথা আর আছে গো !
গেয়ে গান নাচে বাউল
গান গেয়ে ধান কাটে চাষা।

বাংলা ভাষা দিয়ে দেশপ্রেমের যে নতুন জাগরণ ঘটল, সেটা একেবারে বাঙালির হৃদয়ে গিয়ে পৌঁছল। অতীতের রোমান্টিক স্বপ্ন রচনা করে বাস্তবকে উপেক্ষা করাই হয়। জননীর স্নেহ সন্তানের প্রতি যেমন প্রত্যক্ষ সহজ এবং অনায়াস এই দেশপ্রেমও তেমনি। অতুলপ্রসাদের দেশপ্রেমের আর-একটি বিশেষত্ব তার নৈতিক মূল্যবোধ। রবীন্দ্রনাথ দেশপ্রেমের মধ্যে যেমন অন্ধতা দূর করে তাকে পুণ্য মানবিক মহত্ত্বে পূর্ণ করতে চেয়েছেন, অতুলপ্রসাদের গানেও তার আভাস পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের দেশপ্রেম মানবিকতায় মিশে গিয়েছে, বিশ্বচেতনায় রূপান্তরিত হয়েছে। অতুলপ্রসাদের দেশপ্রেম যেমন্ জাতিভেদহীন ঐক্যবোধে উজ্জীবিত তেমনি ত্যাগে তিতিক্ষায় সেবায় প্রেমে মহৎ। এই মহত্ত্ববোধ সঞ্চারিত করে তিনি আমাদের দেশচেতনাকে বিপথগামিতা থেকে রক্ষা করতেই চেয়েছেন। অতুলপ্রসাদের প্রেমের গানে প্রকৃতির গানে যে-শুচিতা, দেশের গানেও ছিল তাই।

চরিতসাহিত্যকার যোগেশচন্দ্র বাগল

যোগেশচন্দ্র বাগল (১৯০৩-১৯৭১) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রাপ্ত অধ্যাপনারত ঐতিহাসিক ছিলেন না। অধ্যয়ন-অধ্যাপনার প্রয়োজনে তিনি বাংলার ইতিহাস চর্চা করেন নি। তথাপি আধুনিক বাংলার সামাজিক ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর গবেষণাকে অতিক্রম করে একালে কেউ এ বিষয়ে কাজ করতে পারেন না। তাঁর স্বোপার্জিত ইতিহাস-জ্ঞান ও গবেষণা বিশ্ববিদ্যালয়-পরিচালিত গবেষণা-পদ্ধতির অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছে। তাঁর পদ্ধতি এবং আদর্শ একালের নবীন গবেষকদের দিক্ নির্দেশ করছে। তাঁর আবিষ্কৃত তথ্য নিয়ে নতুনতর কাজ হচ্ছে। যোগেশ বাগলের গবেষণা এ পর্যন্ত কোথাও ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে বলে শুনি নি। তাঁর নিষ্ঠা, সত্যসন্ধানের ঐকান্তিক আগ্রহ যেমন এর কারণ, তেমনি তাঁর অনুসন্ধানের ভাবাবেগহীন নিরপেক্ষতা এর আর একটি কারণ।

যোগেশ বাগলের চর্চার বিষয় ছিল আধুনিক যুগের বাংলা। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা বা বাংলার বাহিরের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান থাকলেও তারা তাঁর প্রধান অনুসন্ধান-কেন্দ্র ছিল না। বাঙালির নতুন জীবনচেতনা, নবীন অভ্যুদয় আমাদের সকলের কাছেই গভীর ঔৎসুক্যের বিষয় হওয়া স্বাভাবিক কিন্তু ঐতিহাসিকের কাছে আমরা প্রত্যাশা করি শুধু বিবরণ নয়, প্রত্যাশা করব গভীরতর প্রেরণার ব্যাখ্যা। ঐতিহাসিকের কাছে এই প্রত্যাশাটি একালীন। সেকালের দিনে ঐতিহাসিকেরা ব্যাখ্যা করতেন না, য়ুরোপের উনিশ শতকের ঐতিহাসিকেরা তথ্য সংগ্রহ করতেন, দলিল খুঁজতেন—

The Nineteenth Century fetishism of facts was completed and justified by a fetishism of documents. The documents were the Ark of the covenant in the temple of facts. The reverent historian approached them with bowed head and spoke of them in awed tones. If you find it in the documents, it is so. But what, when we get down to it, do these documents —the decrees, the treatiese, the rent-rolls, the blue-books,

the official correspondence, the private letters, the diaries—tell us? No document can tell us more than what the author of the document thought—what he thought had happened, what he thought ought to happpen or would happen, or perhaps only what he wanted others to think he thought, or even only what he himself thought he thought. None of this means anything until the historian has got to work on it and deciphered it.[১]

পরবর্তী কালে ইতিহাস রচনার নীতি পরিবর্তিত হয়েছে। তথ্য চাই, তথ্যের সঙ্গে চাই ঐতিহাসিকের ব্যক্তিত্ব। তথ্য নির্বাচন, তথ্যবিন্যাস—এ সবে ঘটে ব্যক্তিত্বের প্রকাশ। কিন্তু ইতিহাস রচনায় সুসমঞ্জস ব্যক্তিত্ব রক্ষা করে চলা কঠিন কাজ। তথ্য নির্বাচন ও বিন্যাস-কালে অনেক সময়ে সামঞ্জস্যের অভাব ঘটে, ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে ব্যক্তিগত সংস্কারের ছায়াপাত হয়। তখন ইতিহাসের মর্যাদা রক্ষিত হয় না। উনিশ শতকের বাংলার সামাজিক ইতিহাসের বহু উপকরণ নানাদিকে ছড়িয়ে আছে—স্মৃতিকথায়, সংবাদপত্রে, প্রতিবেদনে, চিঠিপত্রে, জীবনীগ্রন্থে আরও নানাভাবে। এগুলির থেকে বিশেষ বিষয় অবলম্বনে তথ্যসংগ্রহ করে একটি ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা করতে হয়। তথ্যগুলি যথাযথ ভাবে ব্যবহার করতে গেলে লেখকের একটা দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে উঠবেই। যদি নেহাৎ কুলিমজুরের কাজ না হয়, তবে এই দৃষ্টি-ভঙ্গিকে কোনো মতেই এড়ানো যায় না। আধুনিক বাংলার এই ইতিহাস রচনা একটা অত্যন্ত জটিল কাজ। উনিশ শতকের ইতিহাসের তথ্যের ভাণ্ডারী যোগেশ বাগল তাঁর জীবনব্যাপী সাধনায় শুধু কি তথ্যই সংগ্রহ করেছেন অথবা সুসম্বদ্ধ ইতিহাসবোধের সঞ্চার করতে পেরেছেন?

এই ইতিহাসকে অনেকে যথেষ্ট সহজ করে নিয়েছেন কয়েকটি বাঁধা ছকে ফেলে। মধ্যযুগীয় প্রবৃত্তি এবং আধুনিক প্রবৃত্তি, নীতিকে স্বীকার অথবা অস্বীকার, পাশ্চাত্যকে গ্রহণ অথবা সমালোচনা, ধর্মকে আশ্রয় করা আবার তাকে ব্যঙ্গ করা—এই রকম বহু বিরোধী প্রবণতার সমন্বয়ে আধুনিক বাঙালির মন গড়ে উঠেছে। রামমোহন-রাধাকান্ত থেকে বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বহু মনীষীর আবির্ভাব ঘটেছে। তাঁদের কর্মকীর্তির তালিকা করা অপেক্ষাকৃত

সহজ কিন্তু সব কিছু মিলিয়ে সর্বসঙ্গত ব্যাখ্যা দেওয়াই কঠিন। ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে কেউ আনেন স্ববিরোধিতার তত্ত্ব, কেউ আনেন এক ও বহুর তত্ত্ব, কেউ সোজাসুজি লাইন টেনে নেন প্রগতিশীলতা ও রক্ষণশীলতার স্বরচিত সংজ্ঞা দিয়ে।[২]

আধুনিক যুগে বাংলা সাহিত্যের প্রত্নতাত্ত্বিক ইতিহাস রচনার সূত্রে বাংলার সমাজের বিশিষ্টতাগুলির সন্ধান আরম্ভ করেন সুশীলকুমার দে তাঁর ইংরেজিতে লেখা— বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে— *History of Bengali Literature in the Nineteenth Century* (*1919*)। পরে ১৯৬২ এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ উপলক্ষে তিনি লেখেন—

My object in this work has been to give, from a literary point of view, but with a social and political history and from a direct reading of the literature itself, an account of the important period in which, indeed, the obscure origins of modern Bengali literature are to be sought.

সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করতে গিয়েই আসলে আমাদের দেশে উনিশ শতকের বাংলার সম্বন্ধে গবেষণার সূত্রপাত হয়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পুরানো বাংলার অনুসন্ধানের সঙ্গে আধুনিক বাংলার এই জটিল ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহে মন দেয়। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী-হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর যুগ শেষ হয়েছে। ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সজনীকান্ত দাস এই নতুন গবেষণা-বিষয়টিকে এক গভীর গুরুত্ব দিলেন। 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' 'দেশীয় সাময়িক পত্র' 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' এবং 'সাহিত্যসাধকচরিতমালা' নতুন গবেষণাধারার প্রধান সূত্ররূপে বিরাজিত থাকল। এই বইগুলিতে উপকরণ সংগ্রহই মুখ্য। ব্রজেন্দ্রনাথ-সজনীকান্তের কাজের বৈশিষ্ট্য এই যে বাঙালির কর্মকীর্তি সম্বন্ধে তা সশ্রদ্ধ মনোযোগ আকর্ষণ করে, নৈতিক মূল্য-বিচারে প্রণোদিত করে না। পরবর্তী গবেষকদের সঙ্গে তাঁদের পার্থক্য মূলত এখানেই। কে রক্ষণশীল, কে প্রগতিশীল, ব্রাহ্মধর্মের ও হিন্দুধর্মের নেতাদের

---

২ সম্প্রতি বাংলার জাগরণকে সামাজিক শ্রেণীসংঘাতের তত্ত্ব দিয়ে বিচার করে মূল্যনিরূপণের চেষ্টা হয়েছে। দ্রষ্টব্য *Perspective of Social Science,* Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta. 'বাংলার জাগরণ' (১৩৬৩) কাজী আবদুল ওদুদ সত্য ও ধর্মের মানদণ্ড ব্যবহার করেছেন।

মধ্যে কারা অধিকতর অভ্রান্ত— এ ধরনের বিষয়ে তাঁরা কোনো স্পষ্ট অভিমত দেন নি কিংবা কোনো পক্ষ অবলম্বন করেন নি। বাংলার সংস্কৃতিকে সাহিত্যে, ধর্মে, সমাজ সেবায় যাঁরা সমৃদ্ধ করে গিয়েছেন, তাঁদের সামান্যতম সাহিত্যিক প্রয়াসও ব্রজেন্দ্রনাথ-সজনীকান্তের অনুসন্ধিৎসা জাগিয়ে দিয়েছে। শ্রীরামপুর মিশন এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের উদ্যম তাঁদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে, উইলিয়ম কেরীকে তাঁরা আপন জন বলেই মনে করেছেন। তাঁদের দানের মূল্য নির্ণয়ের ভার তাঁরা ছেড়ে দিয়েছেন ভাবী কালের উপর।

যোগেশ বাগল ব্রজেন্দ্রনাথ-সজনীকান্তের অনুবর্তী হয়েই গবেষণার ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছিলেন। তাঁর মানসিক অভিপ্রায় ও গঠনও ছিল তাঁদেরই মতো। তিনিও বাঙালির সমাজ ও সংস্কৃতিকে পরম শ্রদ্ধার চোখে দেখেছেন। পুরানো বাংলার সমাজ গঠনে লৌকিক সংস্কৃতির দান যেমন অবশ্যস্বীকার্য, আধুনিক নাগরিক সংস্কৃতির গঠনেও তেমনি রাষ্ট্রশাসন, বাণিজ্যিক ব্যবস্থা, নতুন শিক্ষানীতির প্রভাব মুখ্যত বিচার্য। পুরানো বাঙালী সংস্কৃতি সমাজ-কেন্দ্রিক। সমাজের সামগ্রিক দানেই সে গড়ে উঠেছে। চৈতন্য মহাপ্রভুর মতো অনন্য-সাধারণ ব্যক্তি অবশ্য মধ্যমণি রূপে বিরাজিত; কিন্তু তিনিও বাঙালির সহজিয়া সংস্কৃতির ঘনীভূত বিগ্রহ। আমরা পুরানো সমাজের নীতিনিয়ম শাসন-অনুশাসনকে কোনো ব্যক্তিবিশেষের রচনা ও অপ্রতিহত দৃষ্টিস্বাতন্ত্র্যের ফল বলে বর্ণনা করতে পারি না। কিন্তু আধুনিক কালে বাঙালি যে-সংস্কৃতি রচনা করেছে তা ব্যক্তিকেন্দ্রিক। পুরানো সমাজের নিয়ম-বন্ধন শিথিল হয়ে ব্যক্তির আদর্শ প্রখর হয়ে উঠছে। রামমোহন বিদ্যাসাগর বঙ্কিম দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্র বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি অলোকসামান্য প্রতিভাধর ব্যক্তি ছাড়াও আরো অন্যান্য বহু বিশিষ্ট পুরুষের আবির্ভাবে গত দেড়শত বৎসরে যে বাঙালী সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে তা অভূতপূর্ব। এঁদের প্রত্যেকের কর্মের চিন্তার প্রচণ্ড আবেগ, সীমাহীন প্রত্যয়, জ্বলন্ত আদর্শবাদ এবং লক্ষে অকুণ্ঠ আত্মনিবেদন আধুনিক সমাজের নবরূপসাধনে সহায়তা করেছে। প্রত্যেকের চিন্তাভাবনাগুলি আলাদা আলাদা ভাবেই বিবেচ্য। হয়তো ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিকাশই এর কারণ। সমাজের দেহ আর আগের মতো অখণ্ড নেই। এই আধুনিক সংস্কৃতিকে বুঝতে গেলে ব্যক্তিচরিত্র অবলম্বন করেই বুঝতে হবে।

যোগেশ বাগলের গবেষণার আদর্শ থেকেই এই জিনিসটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি আধুনিক বাংলার ইতিহাসকে কয়েকটি ব্যক্তিচৈতন্যের স্বরূপে বর্ণনা

করে দেখিয়েছেন। তাই হয়েছে তাঁর চরিতরচনা। তিনি যে ভাবে এ কাজ করেছিলেন, সে যে কঠিন তাতে সন্দেহ নেই। যোগেশচন্দ্র তত্ত্বদৃষ্টিসম্পন্ন দার্শনিক ছিলেন না, তিনি ছিলেন তথ্যভারসম্পন্ন ঐতিহাসিক। ব্যক্তিচরিত্র-চিত্রণে ভক্তি অথবা বিচার এসে যাওয়াই একান্ত স্বাভাবিক। কিন্তু ভক্তি যেমন অন্ধতাকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসে, বিচারও তেমনি ব্যক্তিগত প্রবণতা দ্বারা চালিত হতে পারে। প্রসঙ্গত মনে পড়ে, ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকারের বিচারপূর্ণ বক্তব্যেও মোহিতলাল মজুমদার ব্যক্তিগত প্রবণতার সন্ধান পেয়েছিলেন। আবার একথাও সত্য সহৃদয় বিচারেই শুষ্ক ঘটনাপুঞ্জ তাৎপর্যসহ এবং সরস হয়ে ওঠে, প্রত্নতত্ত্ব হয় ইতিহাস। যোগেশচন্দ্র বাগল ব্যক্তিগত রাগদ্বেষকে বর্জন করে চললেও চরিতরচনায় কাজ করেছে তাঁর বিস্ময় এবং শ্রদ্ধা। তাঁর রচিত চরিতগ্রন্থ আছে দুটি, 'উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা' এবং 'বরণীয়'। এ ছাড়া সাহিত্যসাধকচরিতমালায় তাঁর লেখা এগারোটি জীবনী আছে। তাতে আছে রাধাকান্ত দেব, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, রামকমল সেন, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ, অযোধ্যানাথ পাকড়াশী, হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন, উইলিয়ম য়েটস, জন ম্যাক, মধুসূদন গুপ্ত, কেশবচন্দ্র সেন, উমেশচন্দ্র দত্ত, মহেশচন্দ্র ঘোষ, সরলাদেবী চৌধুরাণী, শরৎচন্দ্র রায়, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। 'উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা' বইতে (দ্বিতীয় সংস্করণ) দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামলোচন ঘোষ প্রভৃতি ষোলোজন মনীষীর জীবনকথা সংকলিত হয়েছে। যোগেশ বাগলের আর-একটি বই আছে 'বরণীয়'। এটি একটু অন্য ধরনের। এর ভূমিকায় তিনি বলছেন—

"বর্তমান পুস্তিকাখানি আমরা সাধারণভাবে যে অর্থে জীবনচরিত আত্মজীবনী বা স্মৃতিকথা বুঝিয়া থাকি ইহা সে পর্যায়ের নহে। গত পঞ্চাশ বৎসরে আমি পল্লী বাংলার এবং কতকাংশে শহর বাংলার যে সকল নামী ও অনামী অথচ সকলেই শ্রদ্ধেয় বঙ্গসন্তানের সংস্পর্শে আসিয়াছি তাঁহাদের মাত্র কয়েকজনের সঙ্গে পরিচয়ের কথাই নিজের জীবনকথা প্রসঙ্গে লিখিয়া রাখিলাম। পাঠকপাঠিকা লক্ষ্য করিবেন আমি শুধু মৃত ব্যক্তিদের কথাই এখানে প্রকটিত করিয়াছি। জীবিত এমন বহু ব্যক্তি এখনও রহিয়াছেন, যাঁহাদের জীবন ও কর্মের ছাপ আমার উপর পড়িয়াছে যথেষ্ট।"

এই বইটি সাল তারিখ ও ধারাবাহিক তথ্যসমন্বিত পূর্ণাঙ্গ জীবনচরিতের

লক্ষণাক্রান্ত নয়, যোগেশচন্দ্রের মনে সে উন্নতচরিত্র ব্যক্তি স্থায়ী চিহ্ন রেখে গেছেন, তাঁদের স্মৃতি-আলেখ্য। এতে হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, মেঘনাদ সাহা প্রভৃতি সর্বজনপরিচিত চরিত্র যেমন আছেন, চণ্ডীচরণ বিশ্বাস, নিশিকান্তের মা প্রভৃতি অত্যন্ত ব্যক্তিগত পরিচিত শ্রদ্ধেয় চরিত্রও আছেন। যোগেশ বাগলের এই রচনাগুলি পূর্ণাঙ্গ জীবনচরিতের পরিপূরক উপকরণ হিসাবে গণনীয়— কিন্তু পূর্ণাঙ্গ জীবনচরিত নয়।

বলাবাহুল্য যোগেশচন্দ্রের খ্যাতি ও বৈশিষ্ট্য এই কয়টি বইতে মাত্র সীমাবদ্ধ নয়। বাংলার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সভাসমিতি শিক্ষা ধর্ম নারীপ্রগতি জাতীয়তা-আন্দোলন ইত্যাদি নব্যসংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয়ে ঐতিহাসিক তথ্য-সমাকুল বিবরণ তিনি রচনা করে গিয়েছেন। যোগেশচন্দ্র ব্যক্তিচরিত্রকে এই সামাজিক আলোড়ন আন্দোলনের ফলে উদ্ভূত বলে মনে করেছেন। ব্যক্তির চিন্তা যেমন সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করছে তেমনি ব্যক্তিও তো কোনো অননুকূল পরিবেশের সৃষ্টি নয়। এই পরিবেশটির খুঁটিনাটি তথ্য উদ্ধারে যোগেশচন্দ্রের ক্লান্তি ছিল না। 'উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা' এবং সাহিত্যসাধকচরিতে যোগেশচন্দ্র শত বৎসর পূর্বের বাংলার মনীষীদের জীবনবৃত্তান্ত নানা লুপ্তপ্রায় উপকরণের সাহায্যে রচনা করেছেন। বাংলার জাগরণকে বুঝতে গেলে এঁদের জীবনীর সাহায্যেই বোঝা সম্ভব। একশ বৎসরের অতিক্রমণে তাঁদের দান বাঙালির জীবনে নিঃসংশয় হয়ে উঠেছে। তাঁদের জীবনীরচনা করতে গিয়ে সেকালের সামাজিক ইতিহাসের তথ্য সংগ্রহ করতে হয়েছে। সমসাময়িক সংবাদপত্র, সরকারী নথিপত্র, বিভিন্ন স্থলে উল্লেখ-সংকলন, চিঠিপত্র প্রভৃতি থেকে ঘটনা ও তথ্য সংগ্রহ করে সাজিয়ে নিয়ে তবেই জীবনী রচনা সম্ভব হয়েছে। এ-ধরনের প্রচেষ্টা বিংশ শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশক থেকেই আরম্ভ হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। প্রাচীন ভারতীয়, প্রাচীন বাংলা, মধ্যযুগের বাংলা নিয়ে যে পদ্ধতিতে সন্ধানের সূচনা ইতিপূর্বেই হয়েছিল, উনবিংশ শতাব্দী যতই দূরগত হতে লাগল সেই একই রীতিতে তারও অনুসন্ধানের প্রয়োজন হতে লাগল। আজকাল উনবিংশ শতাব্দী নিয়ে গবেষণা ব্যাপকতা লাভ করেছে। 'প্রথমে ছিল বাংলা সাহিত্যের প্রয়োজনের সূত্রে, এখন বিশুদ্ধ ইতিহাসের চর্চা হিসাবে উনবিংশ শতাব্দী গুরুত্ব অর্জন করেছে, যোগেশচন্দ্র সেখানে নির্ভরস্থল।

ইতিপূর্বে চরিতরচনা যে ছিল না তা নয়। রামেন্দ্রসুন্দরের চরিতকথা,

রবীন্দ্রনাথের চরিত্রপূজা, বিপিনচন্দ্র পালের চরিতাচিত্র ভিন্নজাতের বই। এগুলি ঠিক জীবনী নয়, মূল্যবিচার। অধ্যাপক দেবীপদ ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলা চরিতসাহিত্য' (১৯৬৪) বইটিতে চরিতসাহিত্যের ঐশ্বর্যযুগ (১৮৮১-১৯১৮) বলে যে যুগটিকে অভিহিত করেছেন সে যুগটি সত্যই বহু মূল্যবান্ স্মরণীয় চরিতগ্রন্থের প্রকাশকাল। এ সময়ে উনবিংশ শতাব্দীর বহু মনীষীর জীবনী রচিত হয়েছে। তাঁদের মধ্যে আছেন রামমোহন, বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র, মধুসূদন, বিজয়কৃষ্ণ এবং আরো অনেকে। এসব জীবনীর সঙ্গে যোগেশ বাগল-রচিত জীবনীর পার্থক্য প্রকৃতিগত। এসব জীবনীর উদ্দেশ্য ব্যক্তিচরিত্রমহিমাকে ফুটিয়ে তোলা। উদ্দেশ্য খানিকটা নৈতিক। পারিপার্শ্বিক সমাজকে জানবার প্রচুর উপকরণ এসব গ্রন্থে সংগৃহীত। কিন্তু দক্ষ নাবিক যেমন উত্তাল ঢেউয়ের সঙ্গে সংগ্রাম করে জাহাজটিকে লক্ষ্যে নিয়ে যায়, এতেও তেমনি প্রতিকূল অথবা অনুকূল সমাজঘটনা ব্যক্তিরূপটির অন্তর্নিহিত মহিমাকে শেষ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত করে। কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের একটি ছোটো জীবনী লিখেছিলেন ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়। কৃষ্ণচন্দ্রের নানা নৈতিক দুর্গতির মধ্য দিয়ে আত্মস্থ হওয়ার ধ্রুব লক্ষ্যটি অবিচল রেখেই লেখক অগ্রসর হয়েছিলেন। মধুসূদনের জীবন ঘটনাবহুল। ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা বস্তুত মধুসূদনের জীবনীকারের মধুসূদনচরিত্র সম্পর্কে ধারণাকেই প্রমাণ করবার জন্য আছে যেন। জীবনীকারেরা ঘটনার বিকৃতি করেন নি সত্য কিন্তু লেখার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় যে-ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য তার মূল্য অন্যরকম। চরিতগ্রন্থগুলি মূলত সাহিত্যরসসমৃদ্ধ; কারণ এর মধ্যে দিয়ে যেমন লেখকের তেমনি গ্রন্থোক্ত ব্যক্তির সজীব হৃদয়ের স্পর্শ পাওয়া যায়।

যোগেশ বাগল যে জীবনী রচনা করেছেন তার প্রকৃতি ভিন্ন। তিনি ঐতিহাসিকের বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টি দিয়েই দেখেন। তাঁর লেখায় ভাবাবেগের স্পর্শমাত্র নেই। কোনো নীতি প্রতিপন্ন করাও তাঁর উদ্দেশ্য নয়, ব্যক্তির অন্তর্জীবনের রূপ উদ্ঘাটনও তাঁর অভীষ্ট নয়— উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষা-সংস্কৃতির বিবর্তন অনুসরণ করাই তাঁর কাম্য। ব্যক্তির পূর্ণতা তার কর্মে তার কীর্তিতে। সেই সূত্রে যোগেশচন্দ্র ব্যক্তির বহিরঙ্গ জীবনের ঘটনাপুঞ্জের উপরেই বিশেষ জোর দিয়েছেন। সেই সব ঘটনার যথাযথতা ও ঐতিহাসিক সত্যের নির্ণয়েই তিনি ব্যাপৃত থেকেছেন। 'উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা' বইয়ের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন—

"নবরূপায়ণের কার্য মূলতঃ শুরু হয় শিক্ষাকে ভিত্তি করিয়া। পশ্চিমের সংস্পর্শে আসিয়া আমরা যে বিভিন্ন বিষয়ে নূতন নূতন জ্ঞান লাভ করি তাহা সমাজ মধ্যে ছড়াইয়া দিতে হইলে শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন। তাই দেখি ইংরেজী শিক্ষা, বাংলা শিক্ষা, শিল্পবিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষা, স্ত্রী-শিক্ষা— প্রত্যেকটির বিস্তারেই মনীষীগণ নিরতিশয় তৎপর হইয়া উঠিয়াছেন। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সে-যুগের শিল্পবিপ্লবকে স্বাগত করিয়া অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নেও কেহ কেহ বিশেষভাবে তৎপর হন। জাহাজশিল্প, রেশম, শর্করা, কয়লাশিল্পাদি, জীবনবীমা, সাধারণ বীমা, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি হইতে চাশিল্প পর্যন্ত বহু বিস্তৃত ক্ষেত্রে ঐ সময় ভারত-সন্তানেরা কেহ কেহ স্বাধীনভাবে ব্যবসায় বাণিজ্য চালাইতে অগ্রণী হন। এক একটি জীবনকে কেন্দ্র করিয়াই আমি এই সকল বিষয় আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইয়াছি।"

যোগেশ বাগল -রচিত জীবনীগুলির উদ্দেশ্য এতে স্পষ্টভাষাতেই ব্যক্ত হয়েছে। পূর্বেকার জীবনীর লক্ষ্য ছিল ব্যক্তিরূপকে ফুটিয়ে তোলা, যোগেশচন্দ্রের জীবনীগুলির লক্ষ্য ছিল বাঙালির কর্মকীর্তির বিবরণ রচনা করা। এইজন্যেই ব্যক্তির অন্তর্জীবনের দিকে তিনি ফেরেন নি। তাঁর জীবনীগুলি ঘটনার মালামাত্র।

যোগেশ বাগলের প্রথম মুদ্রিত রচনা ছিল একটি জীবনী— রুস্তমজী কাওয়াসজী (১৭৯০-১৮৬৬)। এই সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' রচনাকালে তাঁর সাকরেদি করতে করতে উনবিংশ শতাব্দীর মনীষীদের সম্পর্কে অনেক কথা জানা যায়। তখনই যোগেশচন্দ্রের এই শ্রেণীর রচনায় উৎসাহ আসে। উনিশ শতকের প্রথম ভাগের পার্শী ধনী ও দানবীর সম্পর্কে তিনি যে মৌলিক সূত্র এবং উৎস অবলম্বনে কাজ করলেন, তাঁর পরবর্তী কালের কার্যপদ্ধতিতেও তাই অব্যাহত আছে। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বহু মনীষীর আবির্ভাব ঘটেছিল, যোগেশ বাগল তাঁদের প্রত্যেককে নিয়ে মুখ্যত গবেষণা করেন নি। অবশ্য তাঁর ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসার পরিধিতে এসেছেন অনেকেই; যেমন আনন্দমোহন বসু, ভগবানচন্দ্র বসু, মহেন্দ্রলাল সরকার। কিন্তু 'উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা' বইতে যাঁদের জীবন-কথা প্রাধান্য পেয়েছে, তাঁরা সকলেই ওই শতাব্দীর প্রথমার্ধে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁদের কর্মকালও প্রধানত এই সময়ের। সাহিত্যসাধকচরিত-মালায় অন্তর্ভুক্ত জীবনীগুলিও— মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সহ, এই যুগ থেকেই

আহৃত। এঁদের মধ্যে অনেককেই আমরা নামে মাত্র জানি। হয়তো তাঁদের কীর্তির সুপরিচিত দিকগুলিই জানি। কিন্তু এসব কর্মকীর্তির বিশদ বিবরণ আমাদের জানা ছিল না, কিংবা তথ্যগত সাক্ষ্যপ্রমাণও আমাদের কালে এসে পৌছায় নি— অধিকাংশই হস্তান্তরিত (Secondary) স্তরের সংবাদ। যোগেশচন্দ্র যে জীবনী রচনা করেছেন, তাদের কোনোটাতেই এই পদ্ধতিতে পাওয়া সংবাদের ব্যবহার নেই। তিনি চলে গিয়েছেন একেবারে মূলে— একেবারে সমকালীন নথিপত্রে, সংবাদপত্রের উল্লেখে, প্রতিবেদনে।

গত শতাব্দীর পূর্বভাগের এই সব কৃতী পুরুষের পরিচয় ও বিবরণ প্রকাশ যোগেশচন্দ্রের স্মরণীয় কাজ। দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামলোচন ঘোষ, প্রসন্নকুমার ঠাকুর— এঁদের যে বিবরণ তিনি রচনা করেছেন বাংলাদেশের ইতিহাস রচনায় তার মূল্য স্থায়ী হয়ে থাকবে। এতদিন আমরা প্যারীচাঁদ মিত্রের লেখা ডেভিড হেয়ারের জীবনী থেকেই হেয়ার ও হিন্দু কলেজ সম্পর্কিত তথ্য আহরণ করেছি। যোগেশচন্দ্র হেয়ার সম্পর্কে সম্পূর্ণ নতুন তথ্য দিলেন— আমাদের ভ্রম নিরসন করলেন। এমনি করে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের মনীষীদের জীবনকথার মধ্য দিয়ে সেকালের শিক্ষাসংস্কৃতির প্রারম্ভিক ইতিহাসরচনার পথ সুগম করে দিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে যোগেশচন্দ্রের বিশেষ উল্লেখযোগ্য কীর্তি হচ্ছে নব্যবঙ্গের কীর্তিকাহিনীর সম্পর্কে গবেষণা। ডিরোজিও, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রাধানাথ শিকদার এবং সেই সঙ্গে সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা, একাডেমিক এসোসিয়েশন[৩] সম্বন্ধে তিনি যে তথ্য উদ্ধার করেছেন পরবর্তী গবেষকরা সেখান থেকেই পথ খুঁজে পেয়েছেন। আজকাল নব্যবঙ্গ, ডিরোজিও প্রভৃতি নিয়ে অনুসন্ধান ও গবেষণার যে বিস্তৃত ক্ষেত্র গড়ে উঠেছে এবং একটি ব্যাপক কৌতূহল দেখা যাচ্ছে তার মূলে যোগেশ বাগল। নব্যবঙ্গের নেতৃস্থানীয় তারাচাঁদ চক্রবর্তীর ব্যক্তিত্ব আজ আমাদের কাছে উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত। রসিককৃষ্ণ মল্লিক এবং রাধানাথ শিকদার, ডিরোজিওর

---

৩ আজকাল বহুআলোচিত 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা'র বক্তৃতা-সংকলন *Selection of Discourses Delivered at the meetings of the Society for the Acquisition of General Knowledge* Vol I. 1840-এর অনুষ্ঠানপত্রটি যোগেশ বাগলই তাঁর জাতি-বৈর (১৩৫৩) গ্রন্থে প্রথম উদ্ধৃত করেন। ডিরোজিওর অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য প্রকাশ করেন শারদীয় আনন্দবাজার পত্রিকা (১৩৬৩)-এ।

ছাত্র। তাঁদের অনমনীয় সত্যনিষ্ঠা এবং স্বাভাবিক কর্মপ্রতিভা আধুনিক বাংলার সূচনাপর্বে কতখানি সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিল যোগেশ-চন্দ্রের গবেষণাতেই তা প্রমাণিত হয়েছে। নব্যবঙ্গেরা শুধু উচ্ছৃঙ্খলতাই করেছিল, রাজনারায়ণ বসুর 'সেকাল ও একাল' থেকে এই ধারণাই চলে এসেছে। যোগেশচন্দ্রের তথ্যাবিষ্কার তাঁদের নতুনভাবে আমাদের কাছে উদ্‌ঘাটিত করেছে। আমি যতদূর জানি পাদরী জেমস লঙ্ এবং হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ, মধুসূদনের শিক্ষক রিচার্ডসন সম্বন্ধেও যোগেশচন্দ্রের জীবনীই প্রথম পূর্ণাঙ্গ বিবরণ এবং এখন পর্যন্ত অনতিক্রান্ত। নব্যইংরেজিশিক্ষিত যুবকদের উচ্ছৃঙ্খলতার সহায়করূপে আমরা আজ তাদের স্মরণ করি না; নতুন গঠনমূলক চিন্তা ও মনোভাবের শিক্ষক হিসাবেই আজ তাঁরা আমাদের কাছে শ্রদ্ধেয়।

যোগেশচন্দ্র যে-কয়টি জীবনী রচনা করেছেন, তাদের মধ্যে 'রাধাকান্ত দেব' এবং 'দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর'— এই দুটি বিশেষ কারণে উল্লেখযোগ্য। আধুনিক বাঙালির চিন্তাধারায় দুজন দুই বিপরীত প্রবণতার পুরোধা। কিন্তু যোগেশ-চন্দ্রের গবেষণায় কোনো পক্ষপাতিত্ব ছিল না। রাধাকান্ত দেব হিন্দুর প্রচলিত নীতি ও সংস্কারকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। এজন্য তিনি রক্ষণশীল বলেই পরিচিত। কিন্তু তাঁর কার্যকলাপ নিবিষ্টভাবে পরীক্ষা করে দেখলে তাঁর ব্যক্তিত্বের যে মহত্ত্ব স্বতঃপ্রকাশিত হয়, যোগেশচন্দ্র সেই দিকটিই বিশেষভাবে দেখিয়েছেন। রাধাকান্তের জীবনী রচনায় এমন কতকগুলি উপকরণ তিনি ব্যবহার করেছিলেন যেগুলি কোথায় আছে আমরা জানি না, যোগেশচন্দ্রও বলেন নি। এগুলির সাহায্যে রাধাকান্তের বিশাল ব্যক্তিত্ব, তাঁর নবীনত্ব, সমাজকল্যাণকামিতা, স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে উৎসাহ— আরও নানাদিক উজ্জ্বল হয়ে উঠে পূর্বতন ধারণার পরিবর্তন ঘটিয়েছে। যোগেশচন্দ্রের এই মূল্যবিবেচনা যে ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ছে সাম্প্রতিক কালে তার প্রমাণ আছে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যক্তিত্ব-মহিমা সম্বন্ধে অবশ্য কোনো বিতর্ক নেই। অজিতকুমার চক্রবর্তীর লেখা জীবনী এই ধর্মনেতার আধ্যাত্মিক চরিত্রটির ছবি এঁকেছে, যোগেশচন্দ্র দেবেন্দ্রনাথকে দেখেছেন সমাজ জীবনের সঙ্গে সম্পর্কান্বিত করে। দেবেন্দ্রনাথের কর্মবহুল জীবন— বিশেষ করে তাঁর জীবনের পূর্বার্ধ নানা বিচিত্র ঐতিহাসিক তাৎপর্যে পূর্ণ। দেবেন্দ্রনাথ তো শুধু ব্রাহ্মনেতা নন, তিনি সমগ্র বাঙালি জাতির নবজাগরণযুদ্ধের অন্যতম সেনাপতি। যোগেশ-

চন্দ্রের লিখিত জীবনী সেই দিক দিয়েই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই গুরুত্ব দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনীর পূর্বতন সম্পাদনাতে ছিল না। সেই জন্যই ১৯৬২ সালে মহর্ষির আত্মজীবনীর নতুন সম্পাদিত সংস্করণে প্রায় তিয়াত্তর পৃষ্ঠাব্যাপী 'মহর্ষির জীবনের আরও তথ্য' যোগেশচন্দ্রকেই সংকলন করে দিতে হয়েছিল। যোগেশচন্দ্রের সংযোজনের ফলেই মহর্ষির আত্মজীবনী নিভৃত জীবনকথা না থেকে উনিশ শতকের একজন প্রধান সমাজ-পুরুষের উজ্জ্বল জীবনেতিহাস হয়ে উঠেছিল।

পণ্ডিত বিমানবিহারী মজুমদার

১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে বার্ষিক সমাবর্তন অনুষ্ঠান হয়, তাতে রবীন্দ্রনাথ ভাষণ দিয়েছিলেন বাংলায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এ ঘটনা অভূতপূর্ব। ভাষাজননীর যে মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য রবীন্দ্রনাথ আবাল্য আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে এসেছেন, সে মর্যাদা প্রথম দিলেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বাংলা ভাষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম পরীক্ষার বিষয় রূপে গ্রহণ করে, তারপরে দিলেন শ্যামাপ্রসাদ কবিকে বাংলা ভাষায় সমাবর্তন ভাষণ দিতে আমন্ত্রণ করে। অভিভাষণে রবীন্দ্রনাথ এই দুই ঘটনারই উল্লেখ করেছিলেন।

কিন্তু এই সমাবর্তন-অনুষ্ঠানটি আরও একটি কারণে স্মরণীয়। এই সমাবর্তনেই বাংলা ভাষায় লেখা গবেষণার জন্য একজন পরীক্ষার্থীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ উপাধিতে ভূষিত করা হল। সেই গবেষণার পরীক্ষক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। গবেষক ছিলেন বিমানবিহারী মজুমদার। জ্ঞানের বিভিন্নমুখী সাধনার সিদ্ধ সাধক বিমানবিহারী আমাদের দেশের একটি স্মরণীয় ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থেকে ইতিহাসে অবিনশ্বর হয়ে রইলেন।

পিতা ছিলেন শাক্ত, মাতা ছিলেন বিখ্যাত বৈষ্ণব ভক্তের কন্যা। বিমানবিহারীর সারা জীবনের বিদ্যাচর্চায় বৈষ্ণব ধর্মালোচনা একটি মুখ্য স্থান অধিকার করে থাকলেও বিনয়ের সঙ্গে দৃঢ়তা, রসচর্চার সঙ্গে প্রবল যুক্তিবাদ, ভক্তির সঙ্গে বৈজ্ঞানিক চেতনার মিশ্রণ তাঁর পাণ্ডিত্যকে দিয়েছিল বিশিষ্টতা। বিদ্বান আছেন আমাদের দেশে, সৌভাগ্যক্রমে তাঁদের সংখ্যাও কম নয়, কিন্তু বহুমুখী বিদ্যাকে অবলীলায় বহন করেন অলংকারের মতো, এমন পণ্ডিতের সংখ্যা বেশি নয়। বিমানবিহারীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় নিতে গেলে বিভ্রান্ত হতে হয়— কোনটা তাঁর মূল সাধনা বোঝা শক্ত। বৈষ্ণব ধর্ম সংক্রান্ত বই যখন পড়ি, মনে হয় তাঁর মনীষা বুঝি এই বিষয়েই পূর্ণতাপ্রাপ্ত, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গবেষণাগ্রন্থ পড়লে মনে হয় এই বিষয়েই তাঁর পাণ্ডিত্যের অতুলনীয়তা, আবার আধুনিক বাংলার সামাজিক ইতিহাস, কিংবা তুলনামূলক ধর্মবিজ্ঞানে তাঁর তীক্ষ্ণ জ্ঞান বিস্ময়ের সৃষ্টি না করে পারে না। রবীন্দ্রসাহিত্যের নায়িকাদের আলোচনায় দেখি বিমানবিহারী খুলে দিলেন এক অভিনব

সমালোচনার রাজপথ। বাংলার স্বাধীনতার ইতিহাসের চরমপন্থীদের ভূমিকা সম্বন্ধে তাঁর উৎসসন্ধানী আকরগ্রন্থ অপরিহরণীয় অবলম্বন হিসাবেই গণ্য।

পিতা শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ছিলেন নদীয়া জেলার কুমারখালি গ্রামের এক প্রাচীন সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান। কিন্তু নানা মামলা মোকদ্দমায় তিনি সম্পত্তি হারান। বিমানবিহারীর জননী ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও কীর্তনসম্রাট অদ্বৈতদাস পণ্ডিত বাবাজীর একমাত্র সন্তান কৃষ্ণপ্রিয়া। বিমানবিহারী মাতামহের গৃহে ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে একুশে ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করলেন। মায়ের কোলে বসেই তিনি পদাবলী কীর্তন এবং বৈষ্ণব শাস্ত্রের আলোর্চনা শুনতেন, সেই প্রভাবই তাঁর মনে অক্ষয় হয়েছিল। পিতাও ছিলেন সাহিত্যিক। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসুর বিশ্বকোষ সম্পাদনায় সহকারিতা করেছিলেন; দুখানা উপন্যাসও তিনি লিখেছিলেন, 'অন্ধদেবতা' এবং 'বিজয়িনী'। ডি এম লাইব্রেরি থেকে বই দুটি বেরিয়েছিল।

গ্রামের পাঠশালায় তাঁর পড়াশোনার আরম্ভ; নবদ্বীপ হিন্দু স্কুল থেকে ১৯১৭ সালে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করলেন। বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে ইতিহাসে বি-এ পরীক্ষায় তিনি প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করলেন। সে বছর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম হয়েছিলেন অধ্যাপক সুশোভন সরকার। কৃষ্ণনাথ কলেজ স্থাপনাবধি বিমানবিহারীই প্রথম ফার্স্ট ক্লাশ পেলেন। কলেজে পড়বার সময়ে অধ্যাপক নলিনীকান্ত নাগ বিমানবিহারীকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিলেন। তিনিই তাঁকে কলকাতায় স্যার আশুতোষের জামাতা প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইতিহাসে প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান পেয়ে এম-এ পাশ করলেন। এবারও প্রথম হয়েছিলেন সুশোভন সরকার।

বিমানবিহারী অর্থনীতিতেও এম-এ পরীক্ষা দিয়েছিলেন। দ্বিতীয়বার এম-এ পরীক্ষা দেওয়ারও ইতিহাস আছে। বিমানবিহারী তখন হেতমপুর কলেজের চাকরি ছেড়ে বিহারে অধ্যাপক। বিখ্যাত অর্থনীতির অধ্যাপক ভি জি কালে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছয়টি বক্তৃতা দিলেন। সেই বক্তৃতা শুনে বিমানবিহারী এতই মুগ্ধ হলেন যে তিনি ঘরে বসেই অর্থনীতির বই পড়তে আরম্ভ করলেন। প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু ভাবলেন পরীক্ষাটা দিয়েই ফেলা যাক। ফলে ১৯২৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি গ্রুপে পরীক্ষা দেবার জন্য কলকাতায় এলেন।

তিনি যখন ইতিহাসে এম-এ পড়ছিলেন তখনই তাঁর বিবাহ হয়। এবার এম-এ পরীক্ষা দেবার আগে তিনি পরিবার পাঠিয়ে দিলেন শ্বশুর বাড়িতে। কিন্তু পরীক্ষার চোদ্দ দিন আগে তাঁর মনে হল হঠাৎ সেখানে উপস্থিত হয়ে তাঁদের অবাক করে দেবেন। গেলেনও, কিন্তু প্রচণ্ড বৃষ্টিতে ভিজে দারুণ দুর্যোগের মধ্যে। তার যা ফল তাই হল। জ্বর নিয়ে সাতদিন পরীক্ষা দিলেন, শেষের দিন আর পারলেন না। কিন্তু ওই সাত পেপার পরীক্ষা দিয়েই দ্বিতীয় শ্রেণীতে তিনি চতুর্থ স্থান অধিকার করলেন।

অতঃপর পাটনার বি. এন. কলেজে ইতিহাস এবং অর্থনীতি দুই বিষয়েরই তিনি অধ্যাপক নিযুক্ত হলেন। এখানে অধ্যাপনা করতে করতেই তিনি ১৯৩২-এ পি-আর-এস হলেন। তাঁর বই ছিল History of Political Thought from Rammohan to Dayananda, Vol. I. Bengal. এই সঙ্গে তাঁর পরিপূরক গ্রন্থ ছিল History of Religious Reformation in India in the Nineteenth Century.

কিন্তু এর আগে থেকেই বিমানবিহারী তাঁর আর-একটি বিখ্যাত বই 'চৈতন্যচরিতের উপাদান'-এর উপকরণ সংগ্রহে ব্যাপৃত ছিলেন। বাংলাতে এই গবেষণাগ্রন্থ লিখে তিনি ১৯৩৭-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ-ডি উপাধি পেলেন। আজ এ বইখানি চৈতন্যসম্বন্ধীয় গবেষণার একটি আকরগ্রন্থের মর্যাদা পেয়েছে, যেমন পেয়েছে বাংলার আধুনিক কালের ইতিহাস লিখতে তাঁর ইংরেজী বইখানি। ইতিমধ্যে ১৯৩৫-এ তিনি 'সংস্কৃত সাহিত্যে চৈতন্য সম্বন্ধীয় উপকরণ'— এই নিবন্ধ লিখে পেলেন গ্রিফিথ মেমোরিয়াল প্রাইজ। সেবারই এই প্রাইজ পেয়েছিলেন নবগোপাল দাস আই-সি-এস।

বিমানবিহারীর পক্ষে বৈষ্ণব ধর্ম ও শাস্ত্র আলোচনাই ছিল পরাবিদ্যা চর্চা। ইতিহাস এবং অর্থনীতি ছিল অপরাবিদ্যা, যদিও এতেই তিনি ব্যবহারিক ক্ষেত্রে পাণ্ডিত্য ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। সতেরো বৎসর বয়সেই জননীর আগ্রহে তিনি মাতামহ অদ্বৈতদাস বাবাজীর কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন। পুত্রের যুক্তিবাদিতার প্রতি কঠোর নিষ্ঠা থেকে কৃষ্ণপ্রিয়া তাঁকে ভক্তির পথে টানতে চাইলেন। চৈতন্যচরিতামৃতকার লিখেছেন—

অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান নিম্বফলে।
রসজ্ঞ কোকিল চুষে প্রেমাম্রমুকুলে॥

কিন্তু বিমানবিহারী জ্ঞানকে বর্জন করেন নি, প্রেমের তত্ত্ব তিনি বিশ্লেষণ করেছেন

যুক্তি দিয়ে। এই জন্যই আধুনিক বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে তাঁর স্থান নিঃসংশয়িত। জর্নাল অব আমেরিকান ওরিয়েণ্টাল সোসাইটিতে (১৯৫৮) শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডিমক চৈতন্যচরিতের উপাদানে a complete and excellent evaluation of the various sources of Chaitanya's life-এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। বিমানবিহারীর বৈষ্ণব গ্রন্থ আলোচনা যে সম্প্রদায়ের বাইরে পণ্ডিতসমাজে নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ বলে স্বীকৃত, এ তারই প্রমাণ। ডিমক-এর প্রশস্তির বহু আগেই পণ্ডিত সুশীলকুমার দে 'চৈতন্য-চরিতের উপাদান' সম্পর্কে তাঁর *Early History of Vaisnava Faith and Movement* (1942) বইতে মন্তব্য করেছিলেন The best critical account of the materials for a study of Chaitanya's life will be found in Bimanbihari Majumdar, *Sri Chaitanya-cariter upadan* in Bengali, Calcutta University 1939.

ডিমক যেমন নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে মন্তব্য করবার অধিকারী তেমনি সুশীল দে-ও। সুশীল দে-র বৈষ্ণব ধর্মান্দোলন সম্পর্কে বইটির তুলনা নেই। কিন্তু তাঁর মতামত গোঁড়া বৈষ্ণবদের পছন্দ নয় বলেই জানি। ডক্টর অমূল্যচন্দ্র সেনের 'ইতিহাসের শ্রীচৈতন্য' (১৯৬৫) তো গোঁড়া ভক্ত এবং ধর্মান্ধ অধ্যাপকদের উদ্যোগে নিষিদ্ধ হয়ে গেল। কিন্তু সুশীলকুমার ও অমূল্যচন্দ্র— দুজনেই বিমানবিহারীর কাছে অকুণ্ঠ ঋণ স্বীকার করেছেন। আরও মূল্যবান বই বিমানবিহারী এ বিষয়ে রচনা করেন, বিদ্যাপতি (খগেন্দ্রনাথ মিত্র-সহযোগে) চণ্ডীদাসের পদাবলী (সাহিত্য পরিষৎ), ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য, গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ, ক্ষণদা-গীতাচিন্তামণি, শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতম্ পাঁচশত বৎসরের পদাবলী, জ্ঞানদাস ও তাঁহার পদাবলী, Krishna in History and Legend, গৌরীমঙ্গল।

বৈষ্ণব ধর্মে তাঁর অনুরাগ জননীর প্রভাবে স্বাধীনভাবেই একাগ্র ও গভীর হয়ে উঠেছে। তিনি যখন স্কুলে পড়েন তখন সুরেন্দ্রনাথ শিকদার নামে একজন পুণ্যচরিত্র সাধকের সংস্পর্শে আসেন। তাঁরই প্রভাবে চোদ্দ পনেরো বছর বয়সে বিমানবিহারী হরিনামে শরণ নেন। তাঁর জীবনযাত্রাও বদলে যায়। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় বৈষ্ণব ধর্ম বিষয়ের রচনাও প্রকাশ করতে থাকেন। এ সময়ে তিনি আর-একজন সাধকের সংস্পর্শে আসেন; তিনি প্রসিদ্ধ ভাগবত-বক্তা কুলদাপ্রসাদ মল্লিক।

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে বিমানবিহারী নবদ্বীপ সমাজ নামে এক সভা স্থাপন করলেন, তখন তাঁর বয়স ষোলো কিংবা সতেরো। উদ্দেশ্য ছিল চৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা। এর সভাপতি ছিলেন সংস্কৃত কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক শিবনারায়ণ শিরোমণি। বিমানবিহারী হলেন গুর সম্পাদক এবং নবদ্বীপের পণ্ডিতরা কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্য। আট টাকা দক্ষিণায় এতে পরীক্ষা দেওয়া যেত। এর সার্টিফিকেটে বিমানবিহারীর স্বাক্ষরও থাকত। তা ছাড়া শুধু সভা স্থাপন করেই নয়, বিভিন্ন জায়গায় তিনি বক্তৃতাও দিতে লাগলেন— ম্যাট্রিক পাশ করবার আগেই। অনেকেই মনে করলেন, 'এঁচড়ে পক্ক' ; আবার কেউ কেউ বললেন, 'প্রতিভাবান', কিন্তু বাল্যকাল থেকেই বৈষ্ণব ধর্মে তাঁর নিষ্ঠা। সে নিষ্ঠা কখনোই ম্লান হয় নি, বরং বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস পড়ে এই ধর্মকে অন্ধ ভক্তির উচ্ছ্বাস থেকে উদ্ধার করেছেন, ভক্তিকে ঐতিহাসিক শৃঙ্খলায় নিয়ে এসেছেন। এক সময়ে তিনি শ্রীখণ্ডের বড়ডাঙ্গার নির্জন মন্দিরে নিভৃত সাধনাতেও লিপ্ত হয়েছিলেন ; শিখা ও তুলসীর মালাও ধারণ করেছিলেন। এ সময়ে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু তাঁকে আহ্বান করে নিয়ে আসেন বিশ্বকোষের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশে সহযোগিতা করার জন্য। কাশিম-বাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী তাঁকে উড়িষ্যাতে পাঠিয়েছিলেন একটি গুরুতর কাজের ভার দিয়ে। ওড়িয়া বইতে চৈতন্য সম্বন্ধে উপকরণ সংগ্রহ করবার জন্য তিনি বিমানবিহারীকেই পাঠিয়েছিলেন। সেসব পুঁথির বিবরণ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

এম-এ পাশ করবার পরে তিনি হেতমপুর কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক রূপে যোগ দেন। সেখানে তিনি পরিচিত হলেন আর-একজন বৈষ্ণব পণ্ডিতের সঙ্গে। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিমানবিহারীকে গ্রহণ করে নিলেন সস্নেহ সহৃদয়তায়।

বিমানবিহারী যখন পাটনা বি. এন. কলেজে চাকরি নিয়ে চলে আসেন তখন মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখেছিলেন—

তুমি এসেছিলে, রসরহস্যে হাস্যে ও পরিহাসে।
লীলাকৌতুকী যে মুখর শুক নির্জন বনবাসে ॥
তুমি এসেছিলে উড়াতে মোদের জঞ্জাল জড়তার
মূর্ত ঝটিকাবর্তের মত উৎসাহ-অবতার ॥

কবিতাটি ছাপা হয়েছিল 'সচিত্র শিশির' পত্রিকায় (১৩৩২)।

বিমানবিহারী পাটনাতেই তাঁর সারা জীবন কাটান। ১৯৪৫ সালে তিনি আরায় হরপ্রসাদ জৈন কলেজে অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর পরিচালনাধীনে ওই কলেজ কিছুকালের মধ্যেই একটি বড়ো কলেজে পরিণত হয়। পরে তিনি আবার ফিরে এসেছিলেন বিহার বিশ্ববিদ্যালয়ে কলেজ পরিদর্শকের পদে। ১৯৫৯ সালে তিনি অবসর নিলেন। ১৯৬৯-এর ১৮ই নভেম্বর তিনি পরলোক গমন করলেন।

জ্ঞান যাঁদের সাধনার বিষয়, তাঁদের অবসর কখনোই আসে না। চাকরি থেকে অবসর নিলেও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতার জন্য তাঁর প্রায়ই আমন্ত্রণ আসত। সেসব তিনি প্রত্যাখ্যান করতে পারতেন না। বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থরচনার উৎসাহে ভাঁটা পড়ল না। বৈষ্ণব ধর্ম বিষয়ক ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ের গ্রন্থে কখনোই মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব হয় নি। 'বিবেকানন্দ ও নিবেদিতার রাষ্ট্রীয় সমাজ দর্শন' যেমন, 'প্রেমধর্ম' সম্বন্ধে ষ্টিফানোস নির্মলেন্দু ঘোষ বক্তৃতাতে তেমনি। ভারতীয় রাজনীতি সম্বন্ধেও তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল অগাধ, উপকরণ ছিল সুপ্রচুর।

বিমানবিহারীর বহু বাংলা প্রবন্ধ সাময়িক-পত্রে ছড়িয়ে আছে। উল্লেখ-যোগ্য, দেশ-পত্রিকার প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যাতেই (৮ অগ্রহায়ণ, ১৩৪০) তাঁর প্রবন্ধ ছিল 'ওথেলোর রূপান্তর'। প্রাচীন ভারতবর্ষ নিয়ে বহু প্রবন্ধ তিনি লিখেছিলেন। এসব গুরু প্রবন্ধ ছাড়াও রসরচনাতেও তিনি ছিলেন অভ্যস্ত। তিনি পদরচনাও করেছেন। একবার পদ রচনা করেই পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটে তিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৩৫ সালে বি. এন. কলেজের অধ্যক্ষ ললিতকুমার ঘোষ, বিমানবিহারীকে জোর করে প্রার্থী দাঁড় করিয়ে দিলেন। এসব নির্বাচনে সভ্যদের বাড়ি-বাড়ি না ঘুরলে ভোট পাওয়া যায় না। পড়াশোনা নিয়ে সর্বক্ষণ ব্যস্ত বিমানবিহারীর সময় কোথায়? তিনি একটি অভিনব উপায় বের করলেন। নরোত্তম ঠাকুরের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তিনি একটি পদ রচনা করে সব কলেজে বাঙালী অধ্যাপকদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন—

প্রিয়বরেষু

সনেটে যাইব বলি বড় সাধ মনে
অদ্যাবধি নাহি জানি যুদ্ধ কার সনে॥
ভোটের আয়ুধে বন্ধু সাজাও আমারে।
নিজের না থাকে যদি দাও ভিক্ষা করে॥

তুমি তো দয়ার সিন্ধু অধমজনার বন্ধু
মোরে প্রভু কর অবধান।
কৃপা না করিলে তবে বিমানের মান যাবে
ওহে নাথ কর পরিত্রাণ ॥

সেবার এই কবিতার জন্যই পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক যমুনাপ্রসাদকে তিনি ভোটে হারিয়ে দেন।

বৈষ্ণব পদ আলোচনা করতে-করতে তিনি নিজেও কুরুক্ষেত্র-মিলন পর্যায়ে কয়েকটি পদ রচনা করে তাঁর ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্যের পরিশিষ্টে জুড়ে দিয়েছিলেন। বৈষ্ণব সমাজে বিমানবিহারী একজন শীর্ষস্থানীয় শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি।

বিমানবিহারীর কথা মনে পড়লে একজন বিদেশী পণ্ডিতের কথা মনে আসে। সংস্কৃতসাহিত্যে বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত কীথ ছিলেন কনষ্টিটিউশন্যাল ল'-র একজন বিশেষজ্ঞ। প্রাচ্যবিদ্যার চর্চা যে সব বিদেশী পণ্ডিত করেছেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই গোড়াতে ছিলেন অন্য কোনো বিষয়ে পারঙ্গম। উইলসন গ্রীয়ারসন কীথ প্রভৃতি প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদরা সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চা করেছেন বিশুদ্ধ জ্ঞানেরই পিপাসায়। আমাদের জীবিকা-জর্জর বাঙালীদের মধ্যে নিরাসক্ত বিদ্যোৎসাহী পণ্ডিত-সমাজে বিমানবিহারী তাঁর বিপুল সংখ্যক গ্রন্থ ও অন্যান্য রচনার দ্বারা শ্রদ্ধার আসনেই প্রতিষ্ঠিত থাকবেন। বিদ্যা বিনয় দান করে, এ-উক্তি পুথির কথা নয়, জীবনেরই কথা। বিমানবিহারীর সান্নিধ্যে যাঁরা এসেছেন তাঁরা তা জানেন। নিজের সাধনায় তিনি যেমন ছিলেন অটল, নবীন প্রতিভাকে বরণ করে নিতেও তাঁর ঔদার্য ছিল তেমনি অবারিত। তিনি লোকান্তরিত হয়েছেন নিঃশেষিত-তৈল প্রদীপের মতো নয়, বিদ্যা ও জ্ঞানের সমৃদ্ধ উপকরণের মধ্যে তাঁর বহু পরিকল্পনাই অসমাপ্ত রেখে।*